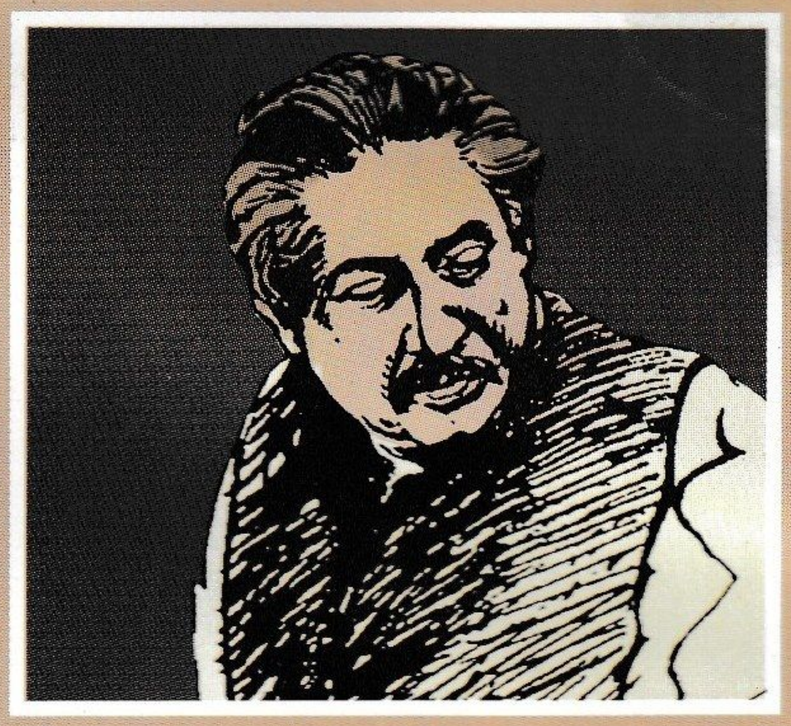
রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

খায়রুল আলম মনির





হাজার বছরের বাঙালির জাতিসত্ত্বা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ একই সূত্রে গাঁথা। এ মতাদর্শের চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির পুনর্জনমের মাধ্যমে, যা অস্তমিত হয়েছিলো ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে। সেটা ছিলো দেশদ্রোহিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার চরম খেসারত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আমাদের তা দিয়ে গেছেন দেশপ্রেম ও রক্তস্নাত সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর তাই বিশ্ব আসনে বাঙালি ও বাংলাভাষা আজ উঁচু আসনে সমাসীন। সবুজের মাঝে লাল সূর্যের এ মানচিত্র কেবল আমাদেরই শোভা পায়। বঙ্গবন্ধু গোটা বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সূর্য সন্তান। তিনি আমাদের প্রত্যয়, গর্ব, অহংকার, ভালোবাসা, ত্যাগ। এই সবুজ, শ্যামল, সুজলা, সুফলা মাটির প্রতিটি কণায় তাঁর অস্তিত্ব মিশে আছে। প্রান্তর মাঠে, ধানের শীষে, নৌকার পালে, নদীর কলতানে, পাটের সবুজ পাতায় আর সরিষা, মটরসুটির লতায় ঢেউ দোলানো বাতাসে, নিরবে নিঃশ্বাসে যার গন্ধ পাই– তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্ণাঢ্য তাঁর জীবনালেখ্য এক অক্ষয় অমর কীর্তি গাঁথা। যতো দিন পৃথিবীতে থাকবে বাংলা, বাঙালি, আর এ জাতির সত্ত্বা- তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। এ ঋণ পিতৃঋণ, রক্তের ঋণ, প্রতিদানের ঋণ। তারপরও এ ঋণ কখনোই শোধ হবার নয়।

এ গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধুর জীবনের লাখো কীর্তি আর অবদানের মধ্যে কয়েকটি কণার আলোচনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মাত্র। তাও হয়তো অসম্পন্ন থেকে গেলো।

চেতনার শিল্পিত প্রকাশ

রোদেলা

রাষ্ট্রনায়ক
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

খায়রুল আলম মনির

রোদেলা প্রকাশনী

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
খায়রুল আলম মনির

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১১

রোদেলা ১৭১

রোদেলা

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
পরিচয় চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন
৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

Rastonayek Bangabandhur Bangladesh.
by Khairul Alam Monir, First Published Ekushe Boimela 2011
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

Price : Tk. 300.00 only **US $ 10.00**
ISBN : 984-70117-0170 7 Code : 171

উ ৎ স র্গ

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা

জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,
–বঙ্গবন্ধু

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাঙালি আজো স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ ভোগ করতে পারতো না। বিশ্ব আসনে বাঙালি সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো না। অথচ আমাদের বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের। ১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো তার পুনরুদ্ধার ঘটাতে লেগে যায় ২১৫টি বছর।

বাঙালির পুনর্জনম আর দ্বিতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস এক সুদীর্ঘ আন্দোলন ও পিচ্ছিল রক্তপথ পাড়ি দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি প্রমুখ রাজনীতিকেরা বাঙালির স্বাধীনতার যে বীজ বপন করেছিলেন তাকে বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ মহীরূহে পরিণত করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৩২ থেকে ১৯৭১ দীর্ঘ ৪০টি বছর তিনি বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন লালন করেছেন আর সেই সাথে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জেলের নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠে। পুরো যৌবনটা ব্যয় করেছেন বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে।

বঙ্গবন্ধুর এমনও সময় কেটেছে যে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আর আত্মীয়-স্বজন কাউকে এক মুহূর্ত সময় দিতে পারেন নি। এ সময় তিনি বাংলার জনপদে পায়ে হেঁটে হেঁটে তাদেরকে সংগঠিত করেছেন। নিজের নাওয়া-খাওয়াও ভুলে গেছেন। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বেও এমন একজন নেতা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আর তাই তাঁর তুলনা কেবল তিনি নিজেই। জীবনের একটি মুহূর্তও তিনি নিজের কথা ভাবেন নি। যদি তিনি নিজের কথা ভাবতেন তাহলে ২৫ মার্চ সবাইকে অশ্রুসজলে বিদায় দিয়ে নিজেকে হাসিমুখে শত্রুর হাতে সঁপে দিতেন না। এমন ইতিহাস বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। একজন গেরিলা কখনো সজ্ঞানে নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু জাতির মঙ্গলের আর স্বাধীনতার কথা ভেবে তিনি তা করেছেন।

১৯৭১-এ যুদ্ধের সময় তিনি যখন পাকিস্তানে বন্দি তখন তাঁর কক্ষের পাশে কবর খোড়া হয়েছে। তবুও তিনি বিচলিত হন নি। কেবল তাঁর জাতির মুক্তির কথা ভেবেছেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে তাদেরকে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ফাঁসি দাও আপত্তি নাই, তবে অনুরোধ আমার লাশটা বাঙালিদের হাতে দিয়ে দিও।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া এমন কথা বিশ্বের আর কোনো নেতা বলতে পারে? পারে না।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন আজ হোক কাল হোক তাঁর বাংলা একদিন স্বাধীন হবেই। তাঁর সে স্বপ্ন বৃথা যায় নি। মাত্র নয় মাসেই বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে যতোগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। একদিকে এ যুদ্ধ যেমন বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করে তেমনি বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলোরও টনক নড়ে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখন একাধিপত্য। তাকে হুমকি দিয়ে কথা বলার দুঃসাহস বোধকরি কোনো দেশের ছিলো না। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করা স্বত্ত্বেও মাত্র নয় মাসে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। বিশ্বে একমাত্র বাংলাদেশই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা এতো অল্প সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এমন কি সে সময় চীনও আমাদের যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। অবশ্য প্রতিবেশী ভারতকে আমরা প্রকৃত বন্ধু এবং সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছিলাম।

কোনো দেশ ও জাতিকে সুসংগঠিত করতে হলে একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতার দরকার হয়, যিনি হবেন সাহসী, বলিয়ান, প্রজ্ঞা সম্পন্ন এবং ভবিষ্যতদর্শী। সর্বোপরি তিনি হবেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। এসব গুণের অধিকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি জাতির জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপথগামী কয়েকজন সামরিক অফিসার কর্তৃক নিজ বাস ভবনে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। এটি বাঙালি জাতির জন্য কেবল কলঙ্ক নয়, বিশ্ববাসীর কাছেও লজ্জার বিষয়। অবশ্য ৩৫ বছর পরে হলেও হত্যাকারীদের কয়েকজনের বিচার এবং তাদের ফাঁসি হয়েছে। বাকিরা এখনো পলাতক। এতে করে কলঙ্ক কিছুটা হলেও মোচন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উপর দীর্ঘ কলেবরে এ রকম একটি গ্রন্থ লেখার দুঃসাহস এবং যোগ্যতা আমার কখনোই ছিলো না। এখনো নেই। যুদ্ধোত্তর প্রজন্মের সন্তান আমি। মুক্তিযুদ্ধও আমি দেখি নি। আর তাই বিবেকের তাড়না এবং দায়বদ্ধতাকে সবসময় বড় করে লালন করেছি আমার অন্তরাত্মায়। সে জন্যই এমন একটা গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এটি প্রকাশিত হওয়ার শতভাগ কৃতিত্ব অগ্রজ প্রতিম, বঙ্গবন্ধু ভক্ত এবং তরুণ প্রকাশক রিয়াজ ভাইয়ের। তার প্রতি আমার সবিনয় কৃতজ্ঞতা। তার অসীম ধৈর্য্য সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি কেবল তাগাদা নয়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। বইটি আমার কাঁচা এবং দুর্বল হাতে লেখা, তাতে সন্দেহ নেই। তারপরও আমি আশাবাদী। সকল ভুল-ত্রুটি ছাপিয়ে এটি পাঠককুলে সমাদৃত হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

খায়রুল আলম মনির
ঢাকা
১ আগস্ট, ২০১০ ঈসায়ী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত কর্মবৃত্তান্ত /১১
দ্বিতীয় অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পর্ব /৪৭
তৃতীয় অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর বিচার পর্ব /৫৯
চতুর্থ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন /৭৬
পঞ্চম অধ্যায় : পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক /১১২
ষষ্ঠ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্বে প্রতিক্রিয়া /২৫৬
সপ্তম অধ্যায় : পশ্চিমপাকিস্তানিদের দৃষ্টিভে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ /২৭৪
অষ্টম অধ্যায় : পরিশিষ্ট /২৮৫

'ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।'

–বঙ্গবন্ধু

(১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ)

প্রথম অধ্যায় : জন্ম ও সংক্ষিপ্ত কর্মবৃত্তান্ত

জ আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সে দেশটির নাম 'বাংলাদেশ'। প্রতিটি ..ধীন দেশের মতো আমাদেরও রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। রয়েছে জাতীয় পতাকা, এক অতুলনীয় অনন্য জাতীয় সঙ্গীত। রয়েছে জাতীয় ফুল, জাতীয় ফল, জাতীয় ভাষা, জাতীয় মাছ—আরো কতো কি! এ যে কতো আনন্দের, কতো গর্বের—সে কেবল আমরাই জানি।

আজ যে স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের এতো গর্ব, এতো আনন্দ—সে স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম তৎকালীন পশ্চিমপাকিস্তানিদের কাছ থেকে। আর এ জন্যে আমাদেরকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিলো এক মরণপণ যুদ্ধে। সে যুদ্ধ ছিলো মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছিলো তিরিশ লাখ বাঙালিকে। স্বাধীনতা আদায়ের প্রশ্নে জাতি হয়েছিলো দুর্জয় সাহসী—হয়েছিলো ঐক্যবদ্ধ। সে এক বিরাট ইতিহাস।

বাঙালি জাতির এ একতা আর দেশপ্রেমের পেছনে যাঁর অবদান ছিলো সবচেয়ে বেশি, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টা আর নির্ভীকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠেছিলো একটি নির্যাতিত পরাধীন জাতি। খালি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাজিত করেছিলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সামরিক বাহিনীকে।

এ সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক নির্দেশনায়। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছেন এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম এ দেশের ঘরে ঘরে। যতোদিন এদেশে একটি মানুষও বেঁচে থাকবে—অন্তত ততোদিন তার বুকে বেঁচে থাকবেন দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তৎকালীন ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা তারিখ অনুযায়ী সে দিনটি ছিলো ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র, মঙ্গলবার। রাত ৮টার সময় জন্ম হয়েছিলো তাঁর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মাদারিপুর দেওয়ানি আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন তিনি। সৎ, দয়ালু, আর প্রতিবেশীদের মঙ্গলকামী বলে বেশ পরিচিতি ছিলো তাঁর। ওদিকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের মাতা সাহেরা খাতুনও ছিলেন যেমন ধার্মিক ঠিক তেমনি স্নেহপরায়ণা। তাঁর সুনাম ছিলো সুবিদিত। গাঁয়ের গরিব-দুঃখি মহিলাদের সাধ্যমতো দান করতেন তিনি। এতিম অসহায়দের আশ্রয় দিতেন নিজের বাড়িতে। পিতা-মাতার এ ভালো গুণগুলোরই অধিকারী হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। আর তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে স্বাধীনতার দাবিতে একতাবদ্ধ করা। তার কারিশমা ছিলো অনন্য, বিস্ময়কর, অতুলনীয় এবং বিরল।

বংশ পরিচয়

জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিলো ইরাকে। বিখ্যাত আউলিয়া হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর রহ. সাথে ইসলাম প্রচারের জন্যে যেসব ভক্ত ও খাদেমরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের ভেতর একজনের নাম ছিলো দরবেশ শেখ আউয়াল। কিছু দিন চট্টগ্রামে থাকার পর তিনি চলে আসেন সোনারগাঁ। এখানেই বিয়ে করেন তিনি। এক বছর পর তাঁর একটি ছেলে হয়। এ ছেলের নাম ছিলো শেখ জহিরউদ্দীন। শেখ জহিরউদ্দীন বড়ো হয়ে চলে আসেন গোয়ালন্দ। এখানে কুরসি গ্রামের পাশের গ্রামে বিয়ে করেন তিনি। তাঁর ছেলের নাম রাখা হয় শেখ জান মাহমুদ। 'তেকড়ি শেখ' নামেও সমাধিক পরিচিত ছিলেন তিনি।



চিত্র : ১। বাম থেকে শেখ কামাল, শেখ রেহানা, বঙ্গবন্ধু, শেখ রাসেল (কোলে) শেখ জামাল এবং শেখ হাসি

শেখ জান মাহমুদের ছেলে শেখ বোরহানউদ্দীন জীবিকা হিসেবে বেছে নেন ব্যব ব্যবসার প্রয়োজনে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো তাঁকে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একবার তিনি আসেন টুঙ্গিপাড়ায়। এখানেই থেকে যান শেখ বোরহানউদ্দীন। টুঙ্গিপাড়ার কাজি বাড়ির এক মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি। শেখ বোরহানউদ্দীন ছিলেন তিন ছেলের জনক। তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নাম শেখ আবদুল হামিদ। ইনিই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরম প্রিয় দাদা অর্থাৎ শেখ লুৎফর রহমানের পিতা। পিতা-মাতার ছয় সন্তানের ভেতর মুজিবের স্থান ছিলো তৃতীয়। আর পুত্রদের ভেতর অগ্রজ ছিলেন তিনি। দায়িত্ববান হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্য।

শিক্ষা জীবন

জানা যায়, ছেলেবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। আর ছিলো তাঁর চমৎকার সাংগঠনিক শক্তি। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল গঠনে উৎসাহের অন্ত ছিলো না তাঁর। ছোটরা তাঁকে ডাকতো 'খোকা ভাই' বলে। কারণ ওটাই ছিলো তাঁর ডাক নাম। ছেলেবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছেই হাতেখড়ি হয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। তাঁর প্রথম শিক্ষকের নাম ছিলো পণ্ডিত শাখাওয়াত উল্লাহ্। যেমন মিষ্টভাষী ঠিক তেমনি গুণী শিক্ষক ছিলেন তিনি। ছাত্রদের সাথে একেবারে বন্ধুর মতো মিশে কঠিন পড়াগুলোকে সহজ করে দিতে খুবই পটু ছিলেন তিনি।

গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শেষ হলে ১৯২৭ সালে মুজিবকে ভর্তি করা হয় গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে অবশ্য খুব বেশিদিন পড়ার সুযোগ পান নি তিনি। কারণ ১১ বছরে পা দেওয়ার পরপরই ১৯৩১ সালে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে যান মাদারিপুরে। সেখানেই সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন তিনি। মাদারিপুর শহরে ছিলো 'ইসলামিয়া হাইস্কুল' নামে একটি উচ্চবিদ্যালয়। এ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। এখানে তিনি পাঠরত অবস্থায় আক্রান্ত হন বেরিবেরি রোগে। এ রোগের কারণে চোখও নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। পরে অবশ্য কোলকাতা নিয়ে চোখের চিকিৎসা করানো হয়। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু মাদারিপুরেও বেশিদিন থাকা হয়ে ওঠে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। কারণ এরই মাঝে তাঁর পিতাকে বদলি করা হয়েছিলো গোপালগঞ্জ। মাদারিপুরের পাঠ চুকিয়ে তাই ছোট্ট মুজিবকে নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন গোপালগঞ্জে। সে সময় গোপালগঞ্জ শহরে খুব ভালো স্কুল ছিলো না বললেই চলে। একটি স্কুল ছিলো মাঝারি মানের। সেই 'গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল'। সেই হাইস্কুলেই ভর্তি করে দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। এখানে তিনি ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণিতে। চলতে থাকে তাঁর পড়াশোনা।

বেশ নামকরা এই মিশন হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম ছিলো গিরিশ চন্দ্র। মানুষ হিসেবে খুবই আমুদে ছিলেন তিনি। মাঝে-মধ্যেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো স্কুলে। তিনি নাটক লিখতেন সে সব অনুষ্ঠানের জন্যে আর ছাত্ররা অভিনয় করতো। গান লিখতেন—ছাত্ররা দল বেঁধে গান গাইতো। অন্য স্কুলের ছেলেদের সাথে আয়োজন করা হতো ফুটবল, নয়তো হা-ডু-ডু খেলার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করতেন সেসব খেলায়। অন্যের চেয়ে ভালোই খেলতেন তিনি। আর এজন্যে স্কুলের বন্ধুরা দলপতি হিসেবে মেনেও নিয়েছিলো তাঁকে। কোনো কাজে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারতেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

সকালের সূর্যের দিকে তাকালেই যেমন দিনটি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়, বালক মুজিবকে দেখেও তেমনি সবাই বুঝতে পেরেছিলো ভবিষ্যতে তিনি দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবেন। কারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। যাকে সত্য বলে জানতেন, যাকে ন্যায় বলে বিশ্বাস করতেন, তার পক্ষে দাঁড়াতে কখনো ভয় পেতেন না তিনি। এ গুণটি বজায় ছিলো তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তটি পর্যন্ত। সত্যের পথে তিনি ছিলেন চির নির্ভীক। সত্যের পথে একা চলতেও ভয় পেতেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন ছোট ছিলেন তখন এ দেশ ছিলো ইংরেজদের শাসনাধীন। দুর্দান্ত দাপটের সাথে এ দেশ শাসন করতো ইংরেজরা। এ দেশের মানুষকে তারা মনে করতো জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম। কথায় কথায় গুলি করে মারতো, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো, ঘর-বাড়ি কেড়ে নিয়ে ভিক্ষুক বানিয়ে ছাড়তো। এমনকি

নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ দেশের তাঁতিদের আঙুলও কেটে দিয়েছিলো তারা। এতো অত্যাচার করতো যে, লিখে শেষ করা যাবে না। তাই ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো এ দেশবাসী। সে ইচ্ছে জন্ম নিয়েছিলো মুজিবের ভেতরও। স্কুল জীবনেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশবাসীকে স্বাধীন করতে না পারলে এ জাতির উন্নতি হবে না। শিক্ষার প্রসার হবে না। মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। আর তার চেয়েও বড়ো কথা, বিশ্বের জাতির সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। এ লজ্জা কোনো আত্মসম্মান সচেতন মানুষ মেনে নিতে পারে না। কিশোর শেখ মুজিবও মেনে নিতে পারে নি।

স্কুলের বন্ধুদের কাছে এসব কথা প্রায়ই খুলে বলতেন মুজিব। বলতেন, 'আজ আমরা পরাধীন। কিন্তু সব সময় তো আমরা পরাধীন ছিলাম না। আমাদের সোনালি ফসল আর সম্পদের লোভে পড়ে বারবার ভিনদেশী পররাজ্য লোভীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। ছলে বলে কৌশলে তারা দখল করে নিয়েছে আমাদের ছায়াঘেরা পাখিডাকা নদীমাতৃক এ বাংলাদেশ। একটি জাতির জন্যে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? দুঃখকে মাথা পেতে নেয় তারাই, যাদের মাঝে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি নেই—দুঃখকে জয় করার মতো সাহস নেই। কিন্তু আমরা তো তেমন জাতি নই! আমরা বাঙালি। আমরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। ভিন দেশিদের কাছ থেকে বারবার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। তাই যেভাবেই হোক, এবারও পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবোই আমরা।' বঙ্গবন্ধুর মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো।

১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, সে সময় সারা উপমহাদেশ জুড়ে চলছিলো ইংরেজ তাড়াবার আন্দোলন। এসব আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪০ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রি ফজলুল হক আর খাদ্যমন্ত্রি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এসে হাজির হন গোপালগঞ্জে। এ কথা জানতে পেরে কিশোর মুজিব ছুটে যান তাঁদের কাছে। তাঁদের প্রশ্ন করে করে জেনে নেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা—জেনে নেন ছোটরা কী করে এ আন্দোলনে শরিক হতে পারে সে কথা।

মুজিবের প্রশ্নের গভীরতা দেখে বিস্মিত হন সোহ্‌রাওয়ার্দী। মনোযোগ দিয়ে তিনি শোনেন মুজিবের প্রতিটি প্রশ্ন। তারপর রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, মারপ্যাঁচ বুঝিয়ে দেন খুব সহজভাবে। বলেন যে, কখনো কোলকাতা গেলে মুজিব যেনো তাঁর সাথে দেখা করেন। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে চমৎকার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিশোর মুজিবের। সোহ্‌রাওয়ার্দী কোলকাতা ফিরে যাবার পর মুজিব চিঠি লেখেন তাঁকে। শত ব্যস্ততার মাঝেও সোহ্‌রাওয়ার্দী সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর ছোট্ট ভক্তকে। চিঠিতে থাকে নানা খবর—হাজারো পরামর্শ। এভাবে ধীরে ধীরে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও সাহসী নেতা হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সাহায্য করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসাকে। ফজিলাতুন্নেসার ডাক নাম ছিলো রানু। মুজিবের বাবা-মাও ছিলেন চাচাতো ভাই চাচাতো বোন। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (ম্যাট্রিক বা এনট্রান্স সমমান অর্থাৎ আজকের এস.এস.সি) পরীক্ষায় পাস করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তারপর চলে যান কোলকাতা। সেখানে গিয়ে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই অপরের দুঃখে দুঃখিত হবার, অপরের অভাব মোচন করার মানসিকতা ছিলো মুজিবের মাঝে। একেবারে ছোট সময় টুঙ্গিপাড়ায় তিনি তাই করেছেন। গোপালগঞ্জে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গরিব-দুঃখিদের পাশে। কোলকাতায় অগণিত মানুষ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সংখ্যাও বেশি। তাই এখানে সমস্যা জর্জরিত মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগও ছিলো বেশি। কোলকাতায় পা দিয়ে তিনি লুফে নেন সেই সুযোগ। নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠনের সাথে। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মুসলিম সেবক সমিতি'। এ সমিতির সদস্যরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহ করে তা বিলিয়ে দিতো অভাবী মানুষদের মাঝে। কখনো তারা সংগ্রহ করতো পুরনো কাপড় আর বইপত্র। এসব বণ্টন করা হতো গরিব ছাত্রদের মাঝে। গরিবেরা এ থেকে অনেক উপকার পেতেন। সে সময় কোলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের থাকার জন্যে মাত্র দুটো ছাত্রাবাস ছিলো। একটি ছিলো ধর্মতলা স্ট্রীটে—নাম 'বেকার হোস্টেল'। অন্যটি কারমাইকেল হোস্টেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থাকতেন বেকার হোস্টেলে।

উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সমাজ কাঠামোতে তখন পরিবর্তন ঘটছে। আর তাই মুসলমান সমাজেও পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা আর জাতি সচেতনতা বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এ পরিবর্তনের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিলো মুসলমান ছাত্রদের মাঝেও। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা। তাই মুসলিম ছাত্রাবাস দুটোতে বিরামহীনভাবে চলতো রাজনৈতিক আলোচনা। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লেগেই থাকতো সেখানে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তো এমন পরিবেশই কামনা করেছিলেন মনে মনে। সুতরাং কোলকাতা এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে একটুও দেরি হয় নি তাঁর। আর সবার ওপর দীক্ষাগুরু সোহ্‌রাওয়ার্দী তো ছিলেনই। তিনি বিভিন্ন সময় অনেক পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে কংগ্রেস দলের ছিলো খুব নাম-ডাক। অনেক মুসলমান ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। এমন কি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ও একসময় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, কংগ্রেস কখনো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটি কথাও বলে নি। কংগ্রেস কখনো মুসলমানদের কথা বলবে না—এ বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছিলো একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন—'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। সে সময়কার বড়ো বড়ো সব নেতারাই ছিলেন মুসলিম

লীগের সদস্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও যোগ দেন মুসলিম লীগে। চালিয়ে যেতে থাকেন সব ধরনের সভা-মিছিল। প্রথম সারির নেতাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন শহর থেকে গ্রামে—গ্রাম থেকে শহরে। ফলে নেতাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন তিনি। রাজনীতিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সবসময় রাজনীতি নিয়েই পড়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলা যেতে পারে। একবার ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাবার কথা ছিলো খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে। তিনি তখন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রি। রাত আটটার সময় ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা শেষ হলে মিছিল নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এ মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন কে? ছাত্র মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রির বাসভবনে ঢুকে পড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর পুলিশের খাতায় নাম চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলোই। তাই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে পাওয়া যাচ্ছিলো না কাউকেই। এমন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মিছিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মিছিলটি কে নেতৃত্ব দেবে, এ নিয়ে এতো দ্বিধায় ভোগার কোনো মানে হয় না। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারের কথা জানাতে যাচ্ছি আমাদেরই প্রধানমন্ত্রিকে। এটা তো কোনো আইন বিরোধী কাজ নয়। সুতরাং ভয় পাবারও কিছু নেই। কারো যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমিই দিবো এ মিছিলের নেতৃত্ব।'



চিত্র : ২। বঙ্গবন্ধু,, শেখ রেহানা ও বাড়ির শিশুরা।

তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নেতৃত্ব দিলেন। নির্ভীক মুজিবের নেতৃত্বে ৫০ জন ছাত্রের সেই মিছিল গিয়ে পৌঁছলো প্রধানমন্ত্রির সরকারি বাসভবনে। তাদেরকে ডেকে নিয়ে বসানো হলো সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলেন অটল প্রহরীর মতো। তাঁর এক কথা—দাবি আদায় না হলে প্রধানমন্ত্রির ঘরে বসবেন না তিনি। খাজা নাজিমুদ্দীন ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন রাতের বেলা মিছিল নিয়ে

তাঁর বাড়িতে আসার কী উদ্দেশ্য?
সবাই নিশ্চুপ। এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহসই হলো না কারো। সবাই মুখ নিচু করে বসে রইলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন বললেন তাঁদের দাবি-দাওয়ার কথা। সব শুনে তুখোড় রাজনীতিক নাজিমুদ্দীন বললেন, 'আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে। এখন নিজ নিজ হোস্টেলে ফিরে যাও।'
মুজিব বললেন, 'আপনারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। নেতাদের কাছে মুসলমান ছাত্ররা শুধু বারবার প্রতিশ্রুতিই পেয়ে আসছে—সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমরা কী করে বুঝবো আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?'
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এ নির্ভীক স্পষ্ট অভিযোগ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। অবাক চোখে তিনি তাকিয়ে থাকলেন শেখ মুজিবের দিকে। তখন অন্যান্য ছাত্ররা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনলেন সেদিন। পথে নেমে সিদ্ধান্ত হলো এবার সবাই মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কাছে। তাঁকেই জানানো হবে ছাত্রদের নানান সমস্যার কথা।
বগুড়ার মোহাম্মদ আলীও ছিলেন একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। তিনিও মিষ্টি কথায় মিছিলকারীদের বিদায় করে দিলেন তাঁর বাসভবন থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন যে, এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। আন্দোলন চালাতে হবে আরো শক্ত হাতে—তীব্রতর করে। এ জন্যে সাহসী, সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর তখন খুব নাম-ডাক ছিলো ছাত্রনেতা হিসেবে। তিনি তখন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়ছিলেন। থাকতেন কারমাইকেল হোস্টেলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোজা চলে যান তাঁর কাছে। তাঁকে খুলে বলেন সব কথা। আর ফজলুল কাদের চৌধুরীকে অনুরোধ করেন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যে। প্রথম দিকে অসম্মত হলেও শেখ মুজিবুরের অনুরোধ মেনে নেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে সত্যি সত্যিই ছাত্রদের আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। আর বাধ্য হয় সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন তার নিজ আদর্শের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কোনো লোভ বা ভয়-ভীতিই আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে নি তাঁকে। ইসলামিয়া কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন ফরিদপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক। আর সভাপতি ছিলেন কোলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান। একবার তিনি প্রস্তাব করলেন সমিতির পক্ষ থেকে বাংলার নতুন গভর্নরকে সংবর্ধনা জানাতে হবে। কিন্তু শেখ মুজিব বললেন, 'অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমরা চাইছি ইংরেজ শাসনের অবসান। আমরা চাইছি এদেশ থেকে তাদেরকে চিরতরে তাড়িয়ে দিতে। সেখানে কী করে তাদেরকে সংবর্ধনা দেবো? এটা ভারতবাসীদের জন্যে একটা অপমানজনক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে— আর আমাদের জন্যে হবে হঠকারী সিদ্ধান্ত। না, আমি একমত নই আপনার সাথে।'

লতিফুর রহমানও ছিলেন দেশদরদী রাজনীতিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দৃঢ়তা আর সুচিন্তিত মতামত শুনে সেদিন আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর বললেন, 'সত্যি, এমন গভীর করে ভেবে দেখি নি আমি। তোমার কথাই সত্যি।'
১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে ফরিদপুর যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এটা ছিলো সাধারণ মানুষের সাথে পরিচিত হবার এক চমৎকার সুযোগ। মুজিবুর রহমানও খুব দক্ষতার সাথে কাজে লাগান সেই সুযোগ। ফরিদপুর জেলার প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে, পথে-প্রান্তরে ছুটে ছুটে প্রচারণা চালিয়ে যান মুসলিমলীগের পক্ষে। এতে মুসলিমলীগ শুধু দলগতভাবে পরিচিতিই লাভ করে না— শেখ মুজিব নিজেও হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষদের একেবারে কাছের মানুষ। গ্রাম-গঞ্জের খেটে-খাওয়া মানুষদের সঙ্গে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক আর খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো জাঁদরেল নেতারাও। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথম থেকেই নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। মুজিবের ফরিদপুরে প্রচারণার পর দু জনার সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরো অন্তরঙ্গ—আরো নিবিড়। একজন অন্যজনার হয়ে ওঠেন রাজনীতির আরো কাছের মানুষ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং তারপর

১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। তারপর কাটলো আরা দেড়বছর। ১৯৪৭ সালটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনে। এ বছর ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন তিনি। তাঁর পাঠ্যবিষয় ছিলো ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এ বছরই ভারত ছেড়ে চলে যায় ইংরেজরা। বিশাল এ উপমহাদেশ ভাগ হয়ে জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র—পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। সে সময়কার পূর্ববাংলা, যা বর্তমানে বাংলাদেশ—তা পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। ১৯৫৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি 'পূর্ববাংলা'র নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পূর্বপাকিস্তান'।
১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কোলকাতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমা নেতারা যখন নিজেদের খেয়ালখুশি মতো দেশ চালাতে থাকেন বাঙালি নেতাদের সাথে তখন প্রতিবাদে মুখর হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এ সময় ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে এক ছাত্রসমাবেশে তিনি বলেন, 'আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। কিন্তু আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতার সাথে এ স্বাধীনতার কোনো মিল নেই। আর এ জন্যে হয়তো পূর্ববাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হবে আমাদের।'
কোলকাতায় এটিই ছিলো ছাত্রসমাবেশে মুজিবের শেষ ভাষণ। তারপরই তিনি আইনশাস্ত্র পড়ার জন্যে ঢাকা এসে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা এসে শেখ মুজিব ওঠেন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। এখানে তিনি দেখতে পান এরই মাঝে এখানকার রাজনৈতিক আকাশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল—

'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ'। কোলকাতা থেকে চলে আসা অনেক নেতা-কর্মীই সদস্য হয়েছেন এ দলের।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই অন্যায় আচরণ করা শুরু হয়েছিলো বাঙালিদের সাথে। প্রতিদিনই একটা না একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিলো তখন। তবে সবচেয়ে বড়ো হয়ে বাঙালিদের সামনে দেখা দেয় ভাষার প্রশ্নটি। যেহেতু পাকিস্তানের লোকসংখ্যার দিক থেকে বাঙালিদের সংখ্যাই ছিলো বেশি, তাই বাঙালিদের একটা আশা ছিলো বাংলাকেই করা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রাদেশিক মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারি বাসভবনে (বর্তমানে বাংলা একাডেমী ভবন)। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এ প্রদেশে উর্দুকে সরকারি ভাষা করা হবে না। তা ছাড়া বাংলা ভাষা যাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেতে পারে, সে ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো হবে।

ওদিকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো যে, তারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। কিন্তু এসব কথা তেমন জোরালোভাবে তখনো শোনা যায় নি। জোরালোভাবে শোনা গেলো পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল খোদ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মুখ থেকে। ১৯৪৮ সালে ২১ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা সভায় জিন্নাহ্ বললেন, "উর্দু! শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় বাঙালি জাতিকে। চারদিকে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'অসম্ভব! এ অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। যে কোনো মূল্যে বাংলাকেই করতে হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এবার শুরু হলো রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দুর্বার আন্দোলন।

রাষ্ট্রভাষা এবং কায়েদে আজম

১৯৪৮ সালে ভাষার দাবীতে বাঙালি সোচ্চার। চারদিকের প্রতিবাদ-বিক্ষোভেও কিন্তু ঘাবড়ালেন না জিন্নাহ্ সাহেব। পরদিন জিন্নাহ্‌র সম্মানে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ্ বললেন, *"আমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এ প্রদেশের সরকারি কাজের জন্যে এ প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে।....কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে 'উর্দু' অন্য কোনো ভাষা নয়।....উর্দু একমাত্র ভাষা যা উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। যা পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার থেকে ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে—যে ভাষা অন্যান্য ইসলামি দেশে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।'*

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বক্তব্য চলতে থাকা অবস্থাতেই বিপুল ক্ষোভে ফেটে পড়ে উপস্থিত ছাত্ররা। চিৎকার করে বলে, 'না না না। আমরা মানি না, মানবো না এ কথা। বাংলাকেই করতে হবে রাষ্ট্রভাষা।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ এবং শামসুল হকের মতো সাহসী নেতৃবৃন্দ একজোট হয়ে মাঠে নামেন ভাষার প্রশ্নে। ফলে পূর্ববাংলা সরকারের নির্দেশে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আরো ৬৫ জনকে বন্দি করে নিক্ষেপ করা হয় কারাগারে। ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রি নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের সামনে কারারুদ্ধ ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে এক বিশাল মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাধ্য হয়েই সরকার সবাইকে মুক্তি দেয়—মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর নতুন করে দেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এর ভেতর পরপর দু বার তাঁর ওপর আঘাত আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। প্রথমবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। দ্বিতীয়বার ১৯৪৯ সালের ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ১৪ জন ছাত্রের সাথে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিলো 'আর রাজনীতি করবেন না বলে শেখ মুজিব যদি প্রতিশ্রুতি দেন, তবে বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়া হবে তাঁর ওপর থেকে।' অভিযুক্ত ১৫ জন ছাত্রের ভেতর ১৪ জনই লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হন নি এ প্রস্তাব মেনে নিতে। তিনি বলেছিলেন, *'শেখ মুজিব আবার এ বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে। তবে ছাত্র হিসেবে নয়—একজন দেশকর্মী হিসেবে।'*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এ আত্মবিশ্বাস বাস্তবেও রূপ লাভ করেছিলো। আড়াই বছর পর সত্যিই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ফিরে এসেছিলেন। তবে ছাত্র হিসেবে নয়—জনগণের নেতা হিসেবে। এভাবে প্রথম থেকেই স্বার্থত্যাগী সংগ্রামী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ফলে বারবার তাঁকে পড়তে হচ্ছিলো শাসকদের কোপদৃষ্টিতে। তাঁর ৪৬ বছর বয়সের ভেতর ১২ বছরই জেলে কাটাতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজিব বলেছিলেন, *'জেলখানা আমার দ্বিতীয় বাড়ি।' বঙ্গবন্ধু আরো বলেছেন, 'জেলখানার ছোট্ট সেলে বসে নিজেকে কখনো নিঃসঙ্গ মনে হয় নি। মনে হয়েছে, এ দেশের লক্ষ কোটি জনগণ রয়েছে আমার পাশে। তাদের ভালোবাসার জোরেই একদিন মুক্তি পাবো আমি।'*

জেলখানার দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতিপটে ভেসে উঠতো ফেলে আসা জীবনের ছবি। মনে পড়তো তাঁর বাবা-মা, ভাই-বোন আর ছেলেবেলার খেলার সাথীদের কথা। গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলের শিক্ষক মহিম বাবুর কথা মনে পড়তো একটি বিশেষ কারণে। এ মহিম বাবু মাঝে-মধ্যেই একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন ক্লাসের ছাত্রদের—ইংরেজ কবি রিচার্ড লাভলেইসের কবিতা। সেই কবিতায় কবি বলেছেন, 'পাথর ঘেরা দেয়াল হলেই কারাগার হয় না। লৌহশলাকা হলেই খাঁচা বানানো যায় না। যে মন সব সময়ই থাকে শান্ত ও নিষ্পাপ, কারাগার তার কাছে ঋষির আশ্রমের মতো মনোরম।'

ছেলেবেলায় এ কবিতার অর্থ তেমনভাবে বুঝতে পারেন নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বুঝেছিলেন যে, কবি লাভলেইসের কথাই সত্য। যাদের হৃদয় নিষ্পাপ, কারাগার তাদের কাছে উপাসনালয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠা

১৯৪৮ সাল শেখ মুজিবের জন্য আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরের প্রথম দিকে নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় নেতৃত্বদানের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাঝে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সমর্থন করেন। কিন্তু ভোটে সোহ্‌রাওয়ার্দী পরাজিত হন।

এ ঘটনার পর মুসলিমলীগ ত্যাগ করে সোহ্‌রাওয়ার্দী গঠন করেন 'আওয়ামী মুসলিমলীগ' নামে একটি নতুন সংগঠন। ১৯৪৯ সালের ৩ জুন স্বামীবাগের রোজ গার্ডেনে এক গোপন বৈঠকে গঠিত হয় এ নতুন সংগঠন। তবে ২৩ জুন একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিমলীগ' আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের সভাপতি নির্বাচন করা হয় মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে। সহ-সভাপতি মনোনীত হন আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয় টাঙ্গাইলের শামসুল হককে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন ছিলেন কারাগারে। তাঁকে করা হয় সহ-সাধারণ সম্পাদক। এ একই পদে খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং রফিকুল হোসেনও মনোনীত হন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ববাংলার প্রতি চরম অবহেলা দেখাতে থাকেন পশ্চিমপাকিস্তানি নেতারা। ১৯৪৯ সালে এখানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৫০ সালে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করলে আওয়ামীলীগ এক ভুখা মিছিলের আয়োজন করে। আরমানিটোলা ময়দান থেকে মিছিল এগিয়ে যায় খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের দিকে। মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মিছিল নাজিরা বাজারের সামনে পৌঁছোলে পুলিশ আচমকা মিছিলের ওপর গুলি চালায়। এখানে দুই ভুখা ব্যক্তি প্রাণ হারায়। আর শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয় ভাসানী, শামসুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। অবশ্য এ মাত্রায় কয়েক দিন বন্দি থাকতে হয় তাঁদেরকে। তারপরই মুক্তি পেয়ে যান তাঁরা।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই আওয়ামীলীগ নেতারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন আওয়ামী মুসলিমলীগের আদর্শ ও লক্ষ্য। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আওয়ামী মুসলিমলীগ স্বীকৃতি পায় একটি শক্তিশালী দল হিসেবে। এ দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় সরকার বিরোধী প্রবল আন্দোলন। ফলে পতন ঘটে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার। গঠিত হয় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও স্থান দেওয়া হয় মন্ত্রিসভায়। তবে কিছুদিন পর মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে সঠিকভাবে দল গঠনে নিয়োজিত হন তিনি।

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালে খাজা নাজিমুদ্দীনকে নির্বাচন করা হয় অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রি। দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা সফরে এসে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি আবার তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই বক্তব্য রাখেন। ফলে আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এদেশের মানুষ। আবার শুরু হয় মিছিল-মিটিং, সভা-সমিতি। বাঙালিরা দাবি তোলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে হবার কথা ছিলো পূর্ববাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশন। তাই এ দিনটি থেকে পুরো এক মাস ঢাকা শহরে জারি করা হয়েছিলো ১৪৪ ধারা। ছাত্র-জনতা তা উপেক্ষা করেই মিছিল বের করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের (বর্তমানের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) আমতলা থেকে দশজন দশজন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল বের হয় পথে। তখন পুলিশও গুলি চালায় এলোপাতাড়িভাবে। এতে নিহত হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কয়েকজন। বন্দি করা হয় কয়েকশো ছাত্র-জনতাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অবশ্য এ সময় কারাগারে ছিলেন। তবে ২১ ফেব্রুয়ারির গুলির প্রতিবাদে অন্যান্যের সাথে সেখানে অনশন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ফলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে।

১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিমলীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এ একই অধিবেশনে শামসুল হককে সরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। মওলানা ভাসানী অবশ্য সভাপতি পদেই বহাল থাকেন। দল আরো সুসংগঠিত হয়।

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ কেবল পূর্ববাংলার জন্যে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের অংশীদার দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের সময় ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রার্থী হন গোপালগঞ্জ থেকে। এ নির্বাচনে তিনি ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে কোটিপতি প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৩৭টি আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অবশিষ্ট আসনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্টের সদস্যরা। এর ভেতর ১৪৩টি আসনই পেয়েছিলো আওয়ামীলীগ। মুসলিমলীগের ভরাডুবির পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৫ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন সম্পদ মন্ত্রির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রথম থেকেই মুসলিমলীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণের স্বীকার হতে থাকে। তাদেরই উস্কানিতে ঢাকা কারাগার, আদমজী জুট মিল এবং আরো কয়েকটি স্থানে বাঙালি-বিহারি এক ভয়াবহ দাঙ্গা বাঁধে। এ দাঙ্গা দমন করা হলেও 'দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অযোগ্য'—এ অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে। পূর্ববাংলায় জারি করা হয় ৯২-ক ধারা। প্রদেশে চাপিয়ে দেওয়া হয় গভর্নরের শাসন। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম

মন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হককে করা হয় গৃহবন্দি। পূর্ববাংলার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। তবে ২৩ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তি পান। এরপর ১৯৫৫ সালের ৩ জুলাই ৯২-ক ধারা রদ করে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এবারো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন—ইস্কান্দার মির্জা হন প্রেসিডেন্ট। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ৫ মে ঢাকায় দু মাইল দীর্ঘ একটি ভুখা মিছিল বের হয়। চকবাজারের কাছে মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে মারা যায় তিন মিছিলকারী। ঢাকা শহরে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। এ ঘটনার রেশ ধরে ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে।

১৯৫৬ সালে সংবিধানে পরিবর্তন এনে পূর্ববাংলার নতুন নামরকরণ করা হয় 'পূর্বপাকিস্তান'। এদিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা রাজধানীতে বসে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকেন। পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর এজেন্টদের মাধ্যমে আওয়ামীলীগে ভাঙনের সূচনা করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পাক-মার্কিন চুক্তির প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর সাথে মতবিরোধের সৃষ্টি হলে ভাসানী আওয়ামীলীগ ত্যাগ করেন। এ সময় আওয়ামীলীগ থেকে অলি আহাদকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদে ৯ জন আওয়ামীলীগ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৫৭ সালের ১২ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। তখন রাজনীতিতে একটা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়।

আইয়ুব খানের উত্থান-পতন

ইস্কান্দার মির্জার খামখেয়ালী শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর মাত্র কয়েকদিন পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। প্রথমে ইস্কান্দার মির্জাকে করা হয় গৃহবন্দি। ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিব গ্রেফতার হন ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর। ১ বছর ২ মাস জেলে থাকার পর তিনি মুক্তি পান ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে।

২৪ অক্টোবর এক বিশেষ বিমানে করে ইস্কান্দার মির্জাকে সপরিবারে পাকিস্তান থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান বলে ঘোষণা করেন। আইয়ুব খান খুব কড়াকড়িভাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। রাজনৈতিক নেতাদের আটকে রাখেন

কারাগারে। চার বছরের ভেতর মুজিবকে জেলে যেতে হয় দু বার। ১৯৬১ সালের ১৮ জুন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে নির্জীব আওয়ামীলীগ আবার সজীব হয়ে ওঠে। বন্দি নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন।

২৫ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ জেনারেল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন। এরপর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৬৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে ঘটে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাতে প্রাণ হারায় অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান। ১৯৬৫ সালে সংঘটিত হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে পাকিস্তানের অর্থনীতি ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখা হয়। পরে এ বিষয়টিও শেখ মুজিব গভীরভাবে অনুধাবন করেন।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার জন্যে বিখ্যাত ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এ ছয় দফাকে 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' বলে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বাঁচার দাবি হিসেবে ছয় দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্যে পেশ করছি।'

শেখ মুজিব প্রস্তাবিত ৬ দফায় যা ছিলো তার সংক্ষিপ্ত সার হলো :

১ নং দফা : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২ নং দফা : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে শুধুমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার—এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩ নং দফা : এ প্রস্তাবে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ দুটো থেকে যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেই চলবে। ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে টাকা-পয়সা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই টাকা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্বপাকিস্তানের টাকা পশ্চিমপাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪ নং দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা এবং কর ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না।

আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রাজস্বের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে নিজ থেকেই জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাতেই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫ নং দফা : এ দফাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হলো : ১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে। ২. পূর্বপাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্বপাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিমপাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রা পশ্চিমপাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে। ৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে। ৪. দেশিয় দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলবে। ৫. ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ব্যবসায়িক অফিস স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬ নং দফা : পূর্বপাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওদিকে ৬ দফা পেশ করার সাথে সাথে পশ্চিমপাকিস্তানি রাজনীতিক ও শাসকচক্রের মাথায় যেনো বজ্রাঘাত পড়ে। আইয়ুব খান এটিকে 'দেশ বিভক্তিকরণের ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। খুলনা, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার এবং মুক্তি দেওয়া হয় মুজিবকে। তিন মাসে মুজিবকে মোট ৮ বার গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু জেল গেট থেকে বাইরে পা দেবার সাথে সাথে আবার সামরিক জীপে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। সেই মাসেরই ১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার অভিযোগ এনে মামলা করা হয়। সর্বমোট পঁয়ত্রিশজনকে এ মামলার আসামী করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে কুখ্যাত এ মামলাটি পরিচালনার জন্যে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে কয়েকজন আইনজীবী এবং বিচারক আনা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার সাথে সাথে পূর্বপাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ১১ দফা দাবি। এর মাঝে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন রাষ্ট্র বনাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মামলা শুরু হয়। ফলে ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ মামলার প্রতিবাদে। চারদিকে শ্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙবো—বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবকে আনবো।' শ্লোগান ওঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে জবানবন্দি দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, *'স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিমলীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিমলীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গঠন করি। আওয়ামীলীগ পূর্বেও ছিলো এবং এখনো সেরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান।*



চিত্র : ৩। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেলে জনতা বঙ্গবন্ধুকে এভাবে অভিনন্দন জানায়।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্বপাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেই। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বছর কারা নির্যাতন ভোগ করতে হইয়াছিলো।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্বপাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি লাভ কালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়—যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়ে তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এ সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিতো। অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধীদলের অঙ্গ দল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধীদল এ সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহ্‌তারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নরের বাসভনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্বপাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান—আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক

সমাধান—ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থিত করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে এবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিলো। সেইরাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তি লাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারি প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে—সম্ভবত ৮ই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য নেতা। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান

চৌধুরী, এম.এন.এ. প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামীলীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম.এন.এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামীলীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামীলীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামীলীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামীলীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামীলীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামীলীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামীলীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামীলীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষার বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র—পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্বপাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিতো। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামীলীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এ হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারি সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতোদিন তিনি গতিতে আসীন থাকিবেন ততোদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে।

ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখে রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এ সময় আমাকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এ মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যতো অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততোই উত্তম। এ বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার একজন অন্যতম কৌসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে.ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এমএস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারিদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান—এই তিনজন সি.এস.পি. অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রি হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্বপাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লে.ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে.ক. মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই।

আমি কখনও ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রি; এম.এন.এ. এবং এম.পি.এ.। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি এবং সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম.এল.এ, এম.পি.এ. এবং অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল.এম.এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামীলীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিলো। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কখনো গমন করি নাই।

আমি পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল—দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—ছয়দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্বপাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিলো এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিলো না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিলো যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে—তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রি হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রি অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনো দিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

দিনে দিনে আন্দোলনের চাপ এতোই বেড়ে যায় যে, আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি অবশ্য সার্জেন্ট জহুরুল হক শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি বন্দি অবস্থায় প্রহরীদের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করা হয়। এই বিশাল সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। মুজিব শাসকগোষ্ঠীকে সাবধান করে ভাষণ দেন। ফলে শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে বসার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। ১০ থেকে ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রদানের লোভ দেখানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত ছয় দফা মেনে নেওয়ার জন্যে জোর দাবি জানান। ফলে লাহোরে অনুষ্ঠিত সেই গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়—বঙ্গবন্ধু খালি হাতে ঢাকায় ফিরে আসেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু সরকারের কাছে সাধারণ নির্বাচনের জন্যে দাবি জানান। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি নির্বাচনী এক আবেদন পেশ করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামীলীগের পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থনের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এ নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাঁধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এ কারণেই আওয়ামীলীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম। আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন, অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেওয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফি শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাই-বোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নাই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালি-বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামীলীগকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামীলীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামি দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্য যে কল্পনার নকশা এতোদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম—সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি— তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এ ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন—বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কী রূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিলো। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিলো। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রে প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিলো। তাই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্য ১৯৬৬ সালে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এ দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি।

এ দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিলো। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ স্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা—বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলে-মেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনের কোনো দিন ভুলবো না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানি করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজো অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনো দিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেলো, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো—তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬ দফা ও ১১ দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামীলীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

নিবেদক—

আপনাদেরই শেখ মুজিবুর রহমান

১ ডিসেম্বর, ১৯৭০

জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর ছয় দফা আদায়ের দাবি আরো জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। পূর্বপাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ এ দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চিমপাকিস্তানের কিছু বিবেকবান মানুষও ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানায়। দেশের নানা জায়গায় ছাত্র-জনতা আর পুলিশের মাঝে শুরু হয় সংঘর্ষ—মিছিলে চলে নির্বিচারে গুলি। কিন্তু হরতাল, মিছিল আর অবরোধ চলতেই থাকে অবিরামভাবে। উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্বপাকিস্তান।

দেশের যখন এমন টালমাটাল অবস্থা তখন হঠাৎ ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই পাকিস্তানের উভয় অংশে সামরিক আইন জারি করেন। মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। তবে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে গোপনে যোগাযোগ চালিয়েই যেতে থাকে। সামরিক আইন জারি করার পরেও গণরোষ দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন জেনারেল ইয়াহিয়া। ফলে একান্ত বাধ্য হয়েই ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি। অবশ্য তার আর কোনো উপায়ও ছিলো না। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পূর্বপাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। তাতে মারা যায় প্রায় ১০ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদিপশু। বিধ্বস্ত হয় সমগ্র জনপদ। তাই দক্ষিণাঞ্চলীয় ১৭টি আসন স্থগিত রেখে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ভেতর ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপল্'স পার্টি পশ্চিমপাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মাঝে ৮১টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামীলীগ অর্জন করে শতকরা ৯৮.৫ ভোট ও পশ্চিমপাকিস্তানে পিপল্'স পার্টি শতকরা ৫৭.৭ ভোট। সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়ার কথা। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আওয়ামীলীগের এ বিজয় সহজভাবে মেনে না নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার নীরব সমর্থনে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর দলের কর্মীদের নিয়ে পশ্চিমপাকিস্তানে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেন। তিনি রাজনৈতিক কূট চালে জড়িয়ে পড়েন।

সেসময় ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিলো। এ ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার অজুহাত দেখিয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা আগমন করেন। তিনি এক আলোচনা বৈঠকে বসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সাথে। নির্বাচিত সদস্যদের কাছে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন সম্পর্কে চিঠিও পাঠানো হয়। কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ

পশ্চিমপাকিস্তান থেকে ভুট্টো ঘোষণা করেন, এবারের অধিবেশন ইসলামাবাদে হতে হবে। ঢাকায় অধিবেশন করার চেষ্টা করলে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি তা প্রতিহত করবেন। তাঁর দলের কোনো সদস্য ঢাকা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ তাঁর আশঙ্কা, ঢাকায় অধিবেশন হলে ঢাকা পার্লামেন্ট কসাইখানায় পরিণত হবে!

জুলফিকার আলী ভুট্টো নির্লজ্জের মতো আরো বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দু জন প্রধানমন্ত্রি নিয়োগ করতে হবে। ভুট্টোর এসব দাবি অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী হলেও ইয়াহিয়ার জোরালো সমর্থন ছিলো তাঁর প্রতি। তাই একের পর এক হুমকি দিয়ে চলেন তিনি পশ্চিমপাকিস্তানে বসে। ভুট্টোর এসব কথা শুনে বাঙালিরা বুঝতে পারে, পশ্চিমপাকিস্তানি রাজনীতিক ও শাসকগোষ্ঠী সহজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স মাঠে আওয়ামীলীগের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়ার ব্যাপারে তাঁর দাবির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সারা পাকিস্তানে আমরা মেজোরিটি পেয়েছি। তাই এদেশ শাসন করার অধিকার এবার আমাদের।'

এ ঘটনার পর ৬ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, শিগ্‌গিরই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসার জন্য ঢাকা আসবেন। ১১ জানুয়ারি তিনি ঢাকা আসেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান সাংবাদিকদের বলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রি। যতো শিঘ্র সম্ভব তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিশ্চিত হতে চাই আমি।'

১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করার জন্য। দফায় দফায় বৈঠক চলে চারদিন ধরে। সিদ্ধান্ত হয় উভয় নেতার সাথে আলোচনা করে পরে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করবেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান হাইজ্যাকিংয়ের ঘটনার অজুহাতে তা ৩ মার্চে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এদিকে পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জাতীয় পরিষদে কী ঘটবে তা জানার জন্যে অধীর আগ্রহে দিন কাটাতে থাকে। দেশজুড়ে শুরু হয় উৎকণ্ঠা।

২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামীলীগের জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের জন্যে উপযোগী খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। শাসনতন্ত্র পেশ করেন আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার ড. কামাল হোসেন। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। পুর্বপাকিস্তান জ্বলে ওঠে।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর নানা ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আবার পথে পথে শুরু হয় মিছিল-মিটিং, ব্যারিকেড। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনগণকে শান্ত থাকতে বলেন। তবে একথাও তিনি বলেন যে, ৭ মার্চ

রেসকোর্স ময়দানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণ দেবেন। ৭ মার্চ সকালে শুধু ঢাকা শহর নয়, আশপাশের শহরগুলো থেকে প্রায় ১০ লাখ মানুষ এসে জড়ো হয় রেসকোর্স ময়দানে। দলীয় নেতা-কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তারপর জনতা ও দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন,

'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।



চিত্র : ৪। ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু।

কী অন্যায় করেছিলাম আমরা? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল সংসদ বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলছি, বলতে হয় তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—এ রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ—এ দেশের করুণ ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে ইয়াহিয়া খান এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব

বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম।
তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজোরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না—রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা সংসদে বসবো। আমি বললাম, সংসদের মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।
ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো।
তিনি বললেন, পশ্চিমপাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে সংসদ। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ সংসদে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকানপাট জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখ সংসদ বন্ধ করে দেওয়া হলো।
ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংসদ ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিমপাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।
আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।
কী পেলাম আমরা? জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরিব-দুঃখি মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কীভাবে আমার

মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের রাউন্ড টেবিল? কার সঙ্গে কথা বলবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন তাতে সমস্ত দোষ তারা আমাদের ওপর, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা। ভাইয়েরা আমার! ২৫ তারিখ সংসদ ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে সংসদ খোলা চলবে না। আমার দাবি মানতে হবে। সামরিক শাসন মার্শাল-ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ফেরত যেতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা সংসদে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে সংসদে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এ বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, জজকোর্ট, আধা সরকারি দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারিরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের তরফ থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত

আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততোদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এ বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেনো বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নিতে পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমপাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেওয়া-নেওয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলো। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

৭ মার্চের ভাষণের পর পূর্বপাকিস্তানের জনজীবন প্রকৃতপক্ষেই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যা যা বলেছিলেন সেভাবে প্রতিটি কাজ চলতে থাকে। ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় শাসকগোষ্ঠীর চাকা।

এ সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই ইয়াহিয়া খান পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস.এম. আহসানকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর করে পাঠান। এ ঘটনায় পূর্বপাকিস্তানের জনগণ আরো ক্ষেপে যায়। মওলানা আবদুল হামিদ ভান ভাসানী পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করবো। পূর্ববাংলা স্বাধীন হবেই। এক পাকিস্তান আর রাখবো না।'

এ ঘোষণার পর আম-জনতা নব উদ্যমে পথে নামে। সেনাবাহিনীর চলাচলের পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেয়। কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। আদালত প্রাঙ্গণ হয়ে যায় শূন্য। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাঙালিরা আজ স্বাধীনতার জন্যে ঐক্যবদ্ধ। কোনো শক্তি আর আমাদের এ দাবি থেকে এক চুল সরাতে পারবে না।'

পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টনক নড়ে। প্রথম সমঝোতা আলোচনায় বসার জন্যে অনুরোধ জানান ভুট্টো। কিন্তু মুজিব সাফ জানিয়ে দেন, ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্যে বাঙালি আজ ঐক্যবদ্ধ। শুধু অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলেই আলোচনায় বসবেন তিনি।

একাত্তরের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন। ১৬ ও ১৭ মার্চ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসলেও কোনো সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হন। তবে আলোচনা আরো চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে ছাত্রনেতা ও দেশবাসীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার জন্যে চাপ দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। এর মাঝে ভুট্টোও ঢাকা এসে পৌঁছেন। ২৫ মার্চ তাঁর সাথে এক রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসেন ইয়াহিয়া। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ঐদিনই সন্ধ্যায় তড়িঘড়ি করে তাঁরা দু জন ঢাকা ত্যাগ করে ইসলামাবাদ ফিরে যান।

হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো পশ্চিমপাকিস্তানে ফিরে গেলেন কেন, তা বুঝে ওঠার আগেই ২৫ মার্চ দিনগত রাতে রাত ১.১০ মিনিটের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। আর তার পরপরই একসাথে আক্রমণ চালানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত ছাত্রাবাস, প্রতিটি থানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং ই.পি.আর. ঘাঁটিতে। এমন কি ফুটপাতে ঘুমন্ত মানুষও রেহাই পায় না পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর আক্রমণ থেকে। অতি দ্রুত এ আক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় পুরো দেশ জুড়ে। সেই কালো রাতেই বঙ্গবন্ধুকে এক বিশেষ বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিমপাকিস্তানে। ঐ রাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন।

দেশের এ চরম পরিস্থিতিতে আওয়ামীলীগ ও অন্য বড়ো দলগুলোর নেতারা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেন। কেউ কেউ আশ্রয় নেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ই.পি.আর. বাহিনীর সদস্যরা বেশির ভাগই পাকবাহিনীর হাতে শহীদ হন। কেউ কেউ পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি—প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব দেওয়া হয় তাজউদ্দীন আহমদকে। ইতিহাসে এ অস্থায়ী সরকারকে 'মুজিবনগর সরকার'ও বলা হয়। এ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয় ১৭ এপ্রিল। ঐতিহাসিক সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয় :

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো

এবং
যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামীলীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন
এবং
যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন
এবং
যেহেতু আহুত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়
এবং
যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে
এবং
যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান
এবং
যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগণিত গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে
এবং
যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে
এবং
যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন
সেহেতু
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রি ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মূলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতা এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম।

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।'

এই সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার সাহসী সন্তানেরা। এদিকে লাখ লাখ বাঙালি ঘর-বাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন শিবিরে। ভারত সব ধরনের সাহায্য নিয়ে এসে দাঁড়ায় পাশে—এসে দাঁড়ায় বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার আক্রমণে নয় মাসের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করে পাকবাহিনী। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। এর মাঝে পাক সরকার তাঁকে বিচারের সম্মুখীনও করেছিলো। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে চরম কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পায় নি তারা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে। ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ তিনি ঘোষণা করেন যে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সরকার মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবে। সত্যি সত্যিই ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। পাকিস্তান থেকে প্রথম তিনি যান লন্ডন। সেখানে একদিন থাকার পর ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন তিনি। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের সময় বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান ঢাকা এসে পৌঁছে ঢাকা বিমানবন্দরে। ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংসদীয় সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। সংবিধান রচনার জন্যে গঠন করা হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি। ৪ নভেম্বর জাতীয় পরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদন করা হয়। বঙ্গবন্ধু এক বিধ্বস্ত দেশের ক্ষমতায় আসীন হয়ে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হন। সব সমস্যা এতো সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে এতো দ্রুত সমাধা করা সম্ভবও নয়। তাছাড়া সে সময় তিনি যেসব সহকর্মীকে সৎ এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে পেয়েছিলেন, তাও নয়। কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা ছিলো তাঁর কাছে অনেক বেশি। তার ওপর বিরুদ্ধবাদীদের উসকানি সব সময় তো ছিলোই।

এ অবস্থায় ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। এ নির্বাচনে আবার তাঁর দল ক্ষমতায় আসে। আবার তিনি প্রধানমন্ত্রির আসন অলঙ্কৃত করেন।

১৯৭৪ সাল বঙ্গবন্ধুর জীবনে নানাভাবে স্মরণীয়। এ বছর পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে (ও.আই.সি.) যোগদান করেন। এ বছরের শেষের দিকে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত সফর করেন। একই বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় যোগদান করেন এবং মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার প্রয়োজনে কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ) গঠন বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে এক চরম বিতর্কের মাঝে ঠেলে দেয়। তিনি দেশের সব পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে কেবল চারটি পত্রিকাকে প্রকাশনার অনুমতি দেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে নেমে আসে অভাবনীয় দুর্ভিক্ষ। বঙ্গবন্ধু আপ্রাণ চেষ্টা করেন বিদেশ থেকে খাদ্য এনে দেশবাসীকে বাঁচাতে। কিন্তু তবুও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেড়েই চলে। তিনি 'রক্ষী বাহিনী' নামে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেন। এ ব্যাপারে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তার ওপর আওয়ামীলীগের কিছু উচ্চাভিলাষী নেতার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও বিতর্কিত কাজ-কর্মের দায়ে বঙ্গবন্ধুকে বিব্রত করে তোলে। বাংলাদেশের রাজনীতির এ ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যায়

বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এদিন সামরিক বাহিনীর বিপদগামী কয়েকজন তরুণ অফিসারের নেতৃত্বে শেষ রাতে আক্রমণ করা হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন। সৈনিকরা নির্মমভাবে হত্যা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল (নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ), রোজী জামাল (নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ), শেখ আবু নাসের (বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), কর্নেল জামিল (ডি.জি, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ), কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডি.এস.পি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর পুত্র : ১২ বছর), বেবী সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর কন্যা : ১৪ বছর), শহীদ সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ভ্রাতুষ্পুত্র), বাবু সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর দৌহিত্র : ৫ বছর), নান্টু (সেরনিয়াবাত-এর ভাগিনেয়), শেখ ফজলুল হক মণি (দৈনিক বাংলার বাণী সম্পাদক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ) এবং বেগম শামসুন্নেসা মণি (সন্তান সম্ভাবা) ও গৃহভৃত্যদের।



চিত্র : ৫। নিজ বাড়ির দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে নিহত অবস্থায় পড়ে আছেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর দু কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও শেখ রেহানা জার্মানি থাকায় সৌভাগ্যক্রমে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। ১৬ আগস্ট সামরিক বাহিনীর দু জন মেজর বঙ্গবন্ধুর ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া লাশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে তাঁর গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায়। সেখানেই পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর আদর্শ আর তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ এ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে থাকবে অনন্তকাল। আপন কীর্তি, আপন আদর্শ আর দেশবাসীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষের মনের মাঝে চির অমর হয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি। নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন এদেশকে তিনি কতো বেশি ভালোবাসতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে

২৫ মার্চ। মাঝ রাত। সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নাম্বারের বাড়ি ঘিরে ফেলে। অবশ্য এর কিছু পূর্বে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, তিনি যে-কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারেন। এজন্যে তিনি তাঁর কিছু দেহরক্ষী ও চাকর ছাড়া বাদবাকি সবাইকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে জনৈক প্রতিবেশী জানান, 'রাত ১.১০ মিনিটের দিকে একটি ট্যাঙ্ক একটি সেনাবাহিনীর গাড়ি এবং ট্রাকভর্তি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে রাস্তায় উপস্থিত হয় এবং তার বাড়ির উপর গুলি ছুঁড়তে থাকে। সে সময় একজন সেনা অফিসার ইংরেজিতে বলেন, 'শেখ আপনি বেরিয়ে আসুন'; তারা একটু শান্ত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেলকনিতে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, "গুলি ছুঁড়ছো কেন, গুলি ছোঁড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি প্রস্তুত—তাছাড়া প্রয়োজন মনে করলে একটি টেলিফোন করে এলেই তো মিটে যেতো।" সেনা অফিসারটা সে সময় মুজিবের উঠানে চলে আসে এবং বলে, 'আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।' তিনজন চাকরসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাঁর একজন দেহরক্ষী সেনা অফিসারটির প্রতি কটূক্তি করলে তারা তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। রাতে বাসার কাছে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঐ সময় সেনাসদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সৈন্যরা তার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং দলিলপত্রসহ ঘরের যাবতীয় কিছু তছনছ করে ফেলে। তারা বাড়ির তোরণের ফুলের বাগানটিও তছনছ করে। তোরণের কাছে উড্ডীয়মান সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের মিশ্রিত বাংলাদেশের পতাকাটা গুলি করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

(ওয়াশিংটন পোস্ট, ৩০শে মার্চ ১৯৭১)

জনৈক এক ভদ্রলোক প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য, আওয়ামী লীগের একটি শাখার ভারপ্রাপ্ত। সেই সুবাদে মুজিব এবং ভাবির (মুজিবের স্ত্রী) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মুজিবের বাসায় সেদিন রাত দশটার পর কী ঘটেছিলো সে কথা জানালেন তিনি। তিনি বলেন,

'তেইশ তারিখই মুজিব বুঝেছিলেন, বন্দরের কাল হলো শেষ। তাই ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা শহরে ঢোকার পথে তেজগাঁওয়ের কাছে আমার লোকেরা দিনরাত নজর রাখছিলো। রাত দশটায় মুজিবের বাসায় খবর এলো আটত্রিশটি ট্রাক বোঝাই পাক সৈন্যের একটি কনভয় ছাউনি থেকে বেরিয়েছে। বোধ হয় শহরের দিকে যাচ্ছে।

ঘরে আমরা তখন তিনজন লোক, মুজিব, আমি এবং আর একজন। শেখ সাহেব আমাদের বললেন, তোমরা এবার চলে যাও।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী করবেন?
—আমার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমরা যাও।
—আপনি যাবেন না?
—বলেছি তো আমার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সময় আমি ঠিক জায়গায় চলে যাবো। আর সময় নষ্ট করো না। তোমরা এবার যাও। দেরি করলে তোমাদের আর যাওয়া হবে না।
যা যা বলেছি সব সেই মতো করার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, কারো গ্রেফতার হওয়া চলবে না।
আগে থাকতেই কথা ছিলো মুজিব সময়মতো নিরাপদ জায়গায় সরে যাবেন। সেই মতো ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো। সেই ব্যবস্থায় ভরসা রেখে ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম রাত সাড়ে দশটায়। ঢাকার পথে পথে তখন নতুন করে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হচ্ছে।
পরবর্তী ঘটনা রাত দেড়টা। সেই ঘটনা কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে আমি শুনি নি। শুনেছি ঐ ভদ্রলোকের কাছে, যিনি সেদিন রাত সাড়ে দশটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মুজিবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেছেন,
মুজিব কিছুক্ষণ আগেই ওপরে চলে গেলেন। আমাদের বলে গেলেন বিশ্রাম করতে। কিন্তু সে রাত বিশ্রামের জন্য আসে নি। সে রাতে আমাদের কারো বিশ্রাম করার সময় ছিলো না। সে রাতে কারো মেজাজ ছিলো না কোনো হালকা কথায় কাল কাটানোর। খেলার ছলে কোনো কাজ করার প্রবৃত্তিও বোধ হয় কারো ছিলো না সে রাতে।
তার চেয়েও কম সময় ছিলো ইয়াহিয়া খান ও তার ভাড়াটে সেপাইদের হাতে। ডালকুত্তার মতো তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো শহরে শহরে। রাত দেড়টা নাগাদ গুলির আওয়াজ পেলাম কাছেই। সেই সঙ্গে 'জয়বাংলা' শ্লোগান। দেখলাম বাড়ির সামনে কয়েকটি গাড়ি থেকে সামরিক পোশাক পরা একজন লোক নামছে। তাদের মধ্য থেকেই জনকয়েক আবার এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়লো।
ওপর থেকে গম্ভীর গলায় ধমকে উঠলেন শেখ সাহেব, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট।'
—গুলি ছুঁড়ছেন কেন? আমি কি কাপুরুষ যে পালিয়ে যাবো? ফোন করে এলেই পারতেন। দাঁড়ান আসছি।
তিনি নিচে নেমে এলেন, খিড়কির দরজা দিয়ে বের করে দিলেন আমাদের। আমাকে, কামালকে, সকলকে।
এরপর কী ঘটলো যে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমি যোগাড় করতে পারি নি।

তবে নানা সুত্রে শুনেছি, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং প্রবল ভাবপ্রবণ মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সকলের আপত্তি ও নিষেধ সত্ত্বেও তিনি প্রধানত দুটি কারণে পাকিস্তানি নেকড়েদের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে হাতে পেলে পাক-চক্র তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে রেহাই দেবে। তাঁর সেই আশা পূরণ হয় নি। পাক-পিশাচদের রক্ত লালসা বেড়েই গেছে। দ্বিতীয় কারণটি বোধ হয় এ ছিলো যে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বন্দি করে স্বাধীনতার সংগ্রাম থামানো যাবে না। তার সে আশা নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। এ ভরসাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ মার্চ বলতে পেরেছিলেন, "আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

বঙ্গবন্ধু সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছেন

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছেন কেবল এতোটুকুই জানা গেলো। আর কিছু নয়। কোথায় আছেন, এ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সবাই উৎকণ্ঠিত।

সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তার ঢাকাস্থ নিজস্ব বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তিনি এখন পাকিস্তান সরকারের হেফাজতে আছেন। এদিকে ভারত থেকে শোনা যাচ্ছে—এমন একটা বেতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দাবি করেছেন, 'আমি চট্টগ্রামে এবং মুক্ত বাংলাদেশের মতো আমিও মুক্ত।'

গত শুক্রবার স্বাধীনতা ঘোষাণার সময় পূর্বপাকিস্তানের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'বাংলাদেশ' নামে চিহ্নিত করেছেন।

সংবাদ পাওয়া গেছে, প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগের দখলে। তাঁরা এখন সেখানে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করছে। চট্টগ্রামই পশ্চিমপাকিস্তানিদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে আসা ২ ডিভিশন সৈন্য নামার একমাত্র বন্দর। এখানে আসার জন্যে পশ্চিমাদেরকে ভারত ঘুরে এক বড় রকমের পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। অবশ্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর ভেতরই পূর্ব খণ্ডে তার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে ব্যাপক বোমা, ট্যাঙ্ক হামলার সংবাদ পাওয়া গেছে। যে ট্রান্সমিটার থেকে শেখের কথা প্রচার হচ্ছে সেই প্রচার কেন্দ্রটি নিজেকে 'বিপ্লবী বাংলা বেতার' বলে দাবি করছে। এ বেতার কেন্দ্রের ঘোষক জানিয়েছে, ট্যাঙ্ক এবং বোমা দিয়ে বাংলার জনগণের শক্তিকে ধ্বংস করা যাবে না। তিনি তাদের অনুসারীদের কোনো রূপ নির্দেশের অপেক্ষা না করে যেভাবেই পারুক পশ্চিমপাকিস্তানিদের প্রতিরোধ এবং নিশ্চিহ্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘোষক তার বক্তব্য শেষে খুব জোরে 'জয়বাংলা' শ্লোগান দেন।

এ ছাড়াও বিপ্লবী বেতার জাতিসংঘের কাছে তাদের স্বাধীনতার প্রতি সাহায্য করার আহ্বান জানায়। অনুরূপ আবেদন অন্যান্য রাষ্ট্র, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের কাছে জানিয়েছে। একমাত্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এ সাহায্যের

আবেদনে সাড়া দিতে পারে। কারণ কলকাতা থেকে কুচবিহার পর্যন্ত তাদের ও পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তৃত সীমান্তে প্রতিরোধ এলাকা। অন্য প্রতিবেশী চীন, কিন্তু তাদের পিপল আর্মি পূর্বপাকিস্তান থেকে কমপক্ষে একশো মাইল দূরে।

পুরোপুরি সেন্সরশীপের জন্যে পূর্বপাকিস্তান থেকে খুব কম সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এবং যা পাওয়া যাচ্ছে সম্ভবত প্রায় সবই অসত্য। একটি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, প্রথম দিনের মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার।

কিন্তু রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, পূর্বপাকিস্তানে কোনো বড় ধরনের সংবাদ পাওয়া যায় নি। সংবাদে প্রদেশটির অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হতে চলছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু এ সকল অনিশ্চিত এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ভারতের পার্লামেন্টে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাদের মতামত জোরালোভাবে পূর্ববাংলার পক্ষে। প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি গত ডিসেম্বরে পূর্বপাকিস্তানের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর আওয়ামীলীগের স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বাক স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাই।' শ্রীমতি গান্ধী আরো বলেন, 'ভারত সরকার ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন এবং সময় মতোই সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।' তিনি বলেন যে, তাঁরা পুরোপুরি তাত্ত্বিকভাবে কোনো কথা বলতে রাজি নয়, তবে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলবে। তথাপি বাস্তব সত্য একটি নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে ট্যাংকের মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রি সর্দার শরণ সিং বলেছিলেন, 'পাকিস্তান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবে।' এ কথার পর পরই হাউজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি গান্ধী উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রি তার পেশকৃত রিপোর্টে জানান, 'বড় জোর ২ ডিভিশন সৈন্য পূর্বপাকিস্তানের জনগণকে এ বিভীষিকার শিকারে পরিণত করেছে।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি সমস্যাগ্রস্ত জনগণেরই পক্ষে।"

প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রি শ্রীকৃষ্ণ মেনন দাবি করেন যে, ভারতের উচিত আইনত গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আহ্বান জানানো। তিনি আরো আশা করেন যে, বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারতের কাছে তাদেরকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানাবে এবং ভারতের উচিত স্বীকৃতি দেওয়া। ইতোমধ্যে ভারতের সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল মানেক্‌শ তার পুনা সফর তড়িঘড়ি শেষ করে দিল্লী ফিরে গেছেন। অবশ্য ভারতের প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত পূর্বপাকিস্তানের প্রচণ্ড বিদ্রোহের কিছু কিছু সংবাদ কতোকটা অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। তবে এসব সত্ত্বেও প্রকৃত তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ঢাকায় ইতস্তত যুদ্ধ হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর সাথে প্রধান সংঘর্ষগুলো সংগঠিত হচ্ছে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলোতে। আর এগুলোর প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম। পরিকল্পিতভাবে সেই সকল স্থানগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ইয়াহিয়া তার শক্তি বৃদ্ধির জন্যে সামরিক বহর ও বাহিনী নামাতে

পারে এবং চট্টগ্রামই একমাত্র ভারী সমরাস্ত্র ও সমর বাহিনী নামানোর স্থান। সংবাদে জানা গেছে যশোরে অসংখ্য আওয়ামীলীগ কর্মীরা ঢাল, সড়কী, বর্শা এবং ছোরায় সজ্জিত হয়ে বিমানবন্দর পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পূর্বপাকিস্তান রাইফেল (ই.পি.আর.) এবং বাঙালি পুলিশ জানিয়েছে তারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

তবে ঢাকা থেকে সবচেয়ে নাটকীয় সংবাদ পাওয়া গেছে তা হলো জেনারেল টিক্কা খানের নিহত হবার খবর। খবরে প্রকাশ, একজন জঙ্গী আওয়ামীলীগ কর্মী লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের বাসভবন আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। এ মাসের গোড়ার দিকে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো সে সময় টিক্কা খানকে পূর্ব খণ্ডে পাঠানো হয়েছিলো। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা ছিলো তাকে পূর্ব খণ্ডের গভর্নর নিয়োগ করা হবে। কিন্তু দেশ প্রেমিক বাঙালি বিচারপতি তাকে শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। . . .

(দ্য ডেইলি অবজারভার, লন্ডন, ২৮ মার্চ ১৯৭১)

সূচনায় বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এবং আদর্শ

যদিও পশ্চিমপাকিস্তানের কলোনি অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মাতৃভূমিকে এ স্বাধীনতার মুখোমুখি দাড় করাতে তাঁর কমপক্ষে ২৪ বছর কাল সময় লেগেছে, তবুও এ উদ্দেশ্যে পথ চলা শুরু করেছিলেন তিনি জীবনের প্রথম থেকেই। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যতো নিন্দাবাদ দেওয়া হোক না কেন, কোনোক্রমেই তিনি একজন রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নন।

ছোট বেলায় তিনি কখনো কখনো ব্রিটিশ রাজের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইট ছুঁড়েছেন, তবে সেটা কখনো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত রাজনৈতিক সৈনিক হিসেবে নয়। বরং তার শক্তি ব্যয় হয়েছে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার চেষ্টায় ব্রিটিশ ভারতে সে চেষ্টা ছিলো হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের স্বাধীনতার—যেমন বর্তমানে পাঞ্জাবি পাঠানদের বিরুদ্ধে তিনি পূর্ববাংলার জন্য সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু জন্ম থেকেই পূর্ববাংলার লোক। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পর ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু নন। তিনি ১৯২০ সালে ঢাকার বিভাগের ফরিদপুর জেলায়, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা একজন মধ্যবিত্ত জমাজমিওয়ালা ব্যক্তি। তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে কলকাতায় যান। পশ্চিমবঙ্গের সাথে এটাই তার ক্ষীণ সম্পর্ক। এটা ছিলো ১৯৪২ সালের ঘটনা। এ সময়ে অবশ্য বঙ্গবন্ধু বিবাহিত। পাকিস্তানের জন্মের এক বছর পার হতে না হতে মুজিব সবাইকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্যে সংগ্রামে আহ্বান জানান। সে সময়ে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের একজন ছাত্র। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু করান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে তিনি পূর্ববাংলা ছাত্রলীগ গঠন করেন। পরবর্তীতে এ সংগঠন আইয়ুব সরকারের পতনের আন্দোলনে প্রধান এবং জঙ্গী ভূমিকা পালন করে।

ভাষা আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময়ে তাঁকে ছয় দিন জেল দেওয়া হয়। এটাই ছিলো তাঁর পাকিস্তান আমলের জেল জীবন সিরিজের সূচনা। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ধর্মঘটের সমর্থনে কাজ করেন এবং তাদেরকে সংগঠিত করেন। এ সময়ে ক্রিমিনাল অ্যাক্টে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে পুনরায় জেলে পাঠানো হয়। এ পর্যায়ে তাঁর আড়াই বছর জেল খাটতে হয়।

জীবনের এ অগ্নিযুগে তিনি যুক্তবাংলার এককালীন মুখ্যমন্ত্রি সোহরাওয়ার্দীর দ্বারা উপকৃত হন। পাকিস্তানের স্রষ্টা দল মুসলিমলীগের সাথে বিরোধের ফলে সোহ্‌রাওয়ার্দী আওয়ামীলীগ গঠন করেন এবং বঙ্গবন্ধু ঐ দলের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

তাঁর মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা খুবই কম। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে বাঙালিরা মুসলিমলীগের কবর রচনা করে। এ সময়ে তাকে দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু অধিকাংশ সময় পার্টির সাংগঠনিক প্রয়োজনেই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। ১৯৫৩ সালের ঢাকার বিশাল জনসমাবেশে ও পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে পূর্বপাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবির পেছনে তাঁরই মুখ্য ভূমিকা ছিলো। অবশ্য এ দাবিতেই পাকিস্তান মূলত বিভক্তির দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই আইয়ুব খান চিহ্নিত করতে সমর্থ হন যে তার তথা কথিত পাকিস্তানের স্থিতির একমাত্র শত্রু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাই প্রথমেই তিনি জননিরাপত্তা আইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করেন এবং বিনা বিচারে দেড় বছর কারাগারে রাখেন। ১৯৬১ সালে তিনি সোহরাওয়ার্দীর সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন 'আইয়ুবের পাঁচ বছর রাজনীতি করবো না' সূচক অঙ্গীকারনামা। যার ফলে তাঁর আরো ছয় মাস কারাগারে থাকতে হয়।

মুক্তি পেয়ে তিনি নিজেকে আরো বেশি উৎসর্গ করেন এবং খুব দ্রুতই বাংলাকে মুক্তির লক্ষ্যে উদ্দীপ্ত করে তোলেন। সমস্ত দেশ যখন স্বৈরতন্ত্রের ভয়ে ভীত সে সময় তিনি একাই অকুতোভয় চিত্রে পূর্বপাকিস্তানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একের পর এক গণবিক্ষোভমূলক ভাষণ দিয়ে দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলেন।

এর ফলে তিনি একের পর এক গ্রেফতার হতে থাকেন এবং এ গ্রেফতার হওয়াকেও তিনি স্বাধিকারের কাজে লাগান। এ পর্বে যখনই তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তখনই তিনি পূর্বের চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে বক্তৃতা করেছেন। এছাড়া বিদেশি প্রচার মাধ্যমের কাছে একইভাবে তিনি পূর্ববাংলার ঔপনিবেশিক দূরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন এবং তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এ দূরবস্থা অবসানের লক্ষ্যে। এ সময়েও তিনি সবসময় হাসি খুশী ও উদীপ্ত থাকতেন। অধিকাংশ বাঙালি গভীর আস্থা নিয়ে এ সময় তাঁকে সমর্থন যুগিয়েছেন।

জেনারেল আইয়ুব তখন অন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৬৮'র জানুয়ারির দিকে অন্য একটি বক্তব্যর জন্যে সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে এবং

কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে সেল বন্দি হিসেবে রাখে। এ সময় কেউই জানতো না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কোথায় রাখা হয়েছে। সে সময় বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' আনা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিলো যে, আসামিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দ্বারা এবং ভারতের সাহায্যে আইয়ুবকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে।

এ মামলা পূর্ববাংলায় বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়িয়ে তোলে। এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর যাবতীয় কাজের জন্যে তিনি একজন বড় নেতা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু এ মামলা তাঁকে বাঙালিদের নায়করূপে আভির্ভূত করে। তাঁর মুক্তির দাবিতে ছাত্র সংগঠন জঙ্গীভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে; ছাত্র জনতার সেই উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে আইয়ুব খান সিংহাসন সহ তলিয়ে যায়। জনতার সোচ্চার কণ্ঠের মাঝে আগরতলা মামলাও চিরদিনের মতো ডিসমিস হয়ে যায়। শ্লোগানের আঘাতে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর তার উত্তরসূরী ফৌজিশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার মঞ্চে আসেন। এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ১৯৬৬'র ছয় দফা বিস্তারিতভাবে হাতে নিয়ে ইয়াহিয়ার সম্মুখ সমরে উপস্থিত হন। ৬ দফা পূর্বপাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের একটি পরিপূর্ণ দলিল। যে স্বায়ত্ত শাসনের কথা ১৯৫৩-তে ঢাকার বিশাল জনসভায় উঠেছিলো। এ সমস্ত নাটকীয় জীবন কাহিনী থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কখনো রূঢ় নন। অবশ্য তিনি যে-কোনো মুহূর্তে উদাত্ত বক্তৃতার দ্বারা তাঁর জনগণকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। এদিকে এ বঙ্গবন্ধুই যখন উইলসন তামাকের সুগন্ধভরা পাইপ হাতে বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন, তখন তিনি বর্তমানের ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতাদের থেকে মোটেই উচ্চ কণ্ঠ নন। দীর্ঘকায় এবং অনিন্দ্য সুন্দর বঙ্গবন্ধু কিছুটা সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের মতো দেখতে। ঢাকার উপকণ্ঠেই তাঁর বাস। পাঁচটি ছেলে-মেয়ের সংসারে কোথাও কোনো সম্পদের চিহ্ন নেই। যদি তিনি কখনো সুযোগ পান এবং নিষ্পত্তি করতে পারেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাট তাহলে সব দিক থেকেই মিলিয়ে তিনি হবেন একজন সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা।

রাজনীতির কবি

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন জন সমক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন সাথে সাথেই তাঁর অনেক সমালোচকরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তারা মন্তব্য ছুঁড়েছিলেন, 'এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর কিছু চরমপন্থী সমর্থকদের চাপেই করতে বাধ্য হয়েছেন।' কিন্তু সাধারণভাবেই বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গুরুত্ব এবং আজ তিনি যে নতুন বাঙালি জাতির সংগ্রামী নেতা এর মূল কারণ তাঁর সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম। যদিও মুজিবকে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থার শীর্ষে চড়তে হতে পারে; তবুও এ পর্যন্ত তার কোনো দুর্ঘটনা নেই।

২০১০ সাল অর্থাৎ আজ থেকে ৯১ বছর পূর্বে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় একটি সচ্ছল পরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কখনো নিজেকে মেধাবী হিসেবে পার্থক্য করে রাখেন নি। বরং তিনি কিছুটা বেপোয়ারা এবং জনপ্রিয় একটি ছেলে হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লোকের সাথে কথা বলা, খেলাধূলা এগুলোই পছন্দ করতেন।

এক পর্যায়ে সাধারণ কলা গ্র্যাজুয়েট হবার জন্যে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এখানে এসে অধিকাংশ অগ্রজ মুসলমান ছেলেদের মতো মুসলিমলীগের কর্মসূচির সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেন। এ সময়ে তাঁর নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন বৃহত্তর বাংলার মুখ্যমন্ত্রি। পরবর্তীতে তিনি অবশ্য এক বছরকাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আইন পড়া শুরু করলে সোহ্‌রাওয়ার্দী তা অপছন্দ করেন এবং খুব শীঘ্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মুসলিমলীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের একজন হয়ে ওঠেন।

অবশ্য চল্লিশ বছর বয়সের পার্থকের এ দুই ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারেন তাঁদের জন্মভূমি বাংলার জন্যে তারা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে ন্যায্যটুকুও পাচ্ছেন না। আর তখনই ১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আওয়ামীলীগ সিদ্ধান্ত নেয় 'বাংলা বাঙালিদের' এ ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

বঙ্গবন্ধু এ পথ অবলম্বন করেন এবং খুব শ্রীঘ্রই বেআইনিভাবে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট করার দায়ে দু বার কারাবরণ করেন। জেল থেকে বাইরে এসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামীলীগের ভেতর সোহরাওয়ার্দীর ডান হাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে খর্ব করে অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে মিলে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা হয়। তাঁর সক্ষম প্রচেষ্টায় আওয়ামীলীগ ১৯৫৬ সালে পূর্বপাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর ১৯৬৩ সালে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু অনুভব করেন বৃদ্ধ লোকদের পরিমিত মাত্রার রাজনীতি আসলে রাজনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যার জন্যে তিনি আওয়ামীলীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পুনরুজ্জীবিত আওয়ামীলীগ তাঁর নির্দেশিত স্বায়ত্বশাসনের দাবির রাজনীতি শুরু করে। ১৯৬৬ সালে জেনারেল আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেন। এর ফলে পূর্বপাকিস্তান দ্রুত আন্দোলনের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং জনতার আন্দোলনের ফলে আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ততোদিনে বঙ্গবন্ধু তাঁর জনগণের নায়ক হয়ে ওঠেন।

বাঙালিদের ভেতর লম্বা (সে লম্বায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি) একটু অগোছালো কাঁচাপাকা চুল, বিরাট গোঁফ এবং উজ্জ্বল কালো চোখের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহজে তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা লক্ষ লক্ষ জনতাকে আকৃষ্ট করতে পারেন। এমন কি যখন আপনি তাঁর সাথে একাকী কোনো কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বললেন, তিনি তখনো তাঁর ঐ বিশেষ বক্তৃতার ঢং এ অর্থাৎ যেনো এক লাখ জনগণকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন, এমনভাবে কথা বলবেন। উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি পাকিস্তানের এ তিন প্রধান ভাষায় সাবলীল ও অভূতপূর্ব বক্তব্য রাখতে সক্ষম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনোই নিজেকে একজন চিন্তাবিদ বলে জাহির করেন না।

বঙ্গবন্ধু মূলত 'রাজনীতির কবি', তিনি কখনোই 'রাজনীতির ইঞ্জিনিয়ার' নন। অবশ্য চিন্তা-চেতনাতে বাঙালিরা সব সময়ই 'শিল্পী', কখনোই 'মিস্ত্রী' নয়। সর্বোপরি তাঁর

পন্থা সঠিক হতে পারে। কারণ তিনি তাঁর দেশের সকল শ্রেণিকে আদর্শগতভাবে একত্র করতে সমর্থ হয়েছেন। একমাস পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি জনসমক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন—সে সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিউজউইক-এর লর্নজেকিনকে বলেছিলেন, "বর্তমান সমস্যার মীমাংসার কোনো আশা নেই। কারণ যে দেশকে আমরা জানি সেটা মূলত শেষ হয়ে গেছে।"

কিন্তু তিনি শুধু অপেক্ষা করছিলেন, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানই যাতে শেষ করে দেন। তাঁর মতে, *'আমরা সংখ্যা গুরু, আমরা চলে আসতে পারি না, তারা অর্থাৎ পশ্চিমারা সংঘ্যালঘু তারাই চলে যাক।'* এর দুই সপ্তাহ পরে যখন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে, সে সময় বাঙালি জঙ্গী জনতার শত শত মিছিলে শহরের উপকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়িতে যেতে থাকে। তিনি পাইপ (*'এই একমাত্র বিদেশি দ্রব্য যেটা আমি ব্যবহার করি'*—বঙ্গবন্ধু) টানতে টানতে তাদের উদ্দেশ্যে হাসি মুখে বক্তব্য রাখছিলেন। একদল জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা শেষ করে বঙ্গবন্ধু পশ্চিমা সাংবাদিকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "আমি ভোর ৫টা থেকে ভাবছি, ভাবতে পারেন, জনতার এ শক্তিকে কেউ মেশিনগান দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারবে?" অবশ্য কয়েক দিন পর থেকেই কোনো একজন সেই চেষ্টা করছে।

(দ্য নিউজউইক, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু : তেইশ বছর আগে ও পরে

একথা সত্য যে, তেইশ বছর আগে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঢাকার পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করছিলেন তখন কি তিনি স্বপ্নে ভেবেছিলেন পাকিস্তানের সমাধি রচনাকারীও সেই জনসমাবেশ উপস্থিত? ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ জিন্নাহ্ সাহেব পল্টন ময়দানে লক্ষাধিক নর-নারীর জন সমাবেশে যখন বক্তৃতা করছিলেন তখনই আমি রিপোর্টার হিসেবে ঐ জন সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। যে দিকে তাকাই শুধু জিন্নাহ্ ক্যাপ পরা মানুষ আর পাকিস্তানের পতাকা, জিন্নাহ্ যখন জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে—যে অন্য কথা বলবে সে পাকিস্তানের শত্রু' তখন কিন্তু জনতা হর্ষধ্বনি করে নি। শুধু সমাবেশের এক প্রান্ত থেকে কয়েকটি ছেলে আওয়াজ তুলেছিলো, *'নো-নো। উই ওয়ান্ট বেঙ্গলী।'* কিন্তু সে প্রতিবাদ জনসমাবেশকে চঞ্চল করে নি। জিন্নাহ্ সাহেব স্বাভাবিকভাবে তার বক্তৃতা চালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে শুনেছি, বিক্ষোভকারীদের নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান বলে একটি ছাত্র। এ অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে যেতে হয়েছিলো। ঢাকা আর পূর্বপাকিস্তান তখন চারদিকে জিন্নাহ্ ক্যাপ, জিন্নাহ্ ব্যাজ আর জিন্নাহ্র ছবিতে সয়লাব।

তারপর তেইশ বছর পরে সেই মার্চ মাসে আবার পূর্বপাকিস্তানে (মাফ করবেন বাংলাদেশে) ঢুকেছিলাম। কী দেখলাম? কোথাও জিন্নাহ্ সাহেবের কোনো ছবি নেই। জিন্নাহ্ ক্যাপ ইতিহাসের পাতায়। পাকিস্তানি পতাকার জায়গায় জয়বাংলার প্রতাকা উড়ছে। দোকানে দোকানে জয়বাংলার পতাকা বিক্রি হচ্ছে। শুধু পাকিস্তানি নোটে তখনো জিন্নাহ্র ছবি। প্রশ্ন করেছিলাম কয়েক জন বয়স্ক মুসলমান

নাগরিককে, 'কর্তা, জিন্নাহ্‌র ছবি কোথায়?' উত্তর পেয়েছি একই ভাষায় 'ক্যান? কুত্তার গায় ঝুলাইয়া দিছি।' এখন পূর্ববাংলার ঘরে ঘরে তিন নেতার ছবি। তারা হচ্ছেন, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তেইশ বছর আগে কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমানদের দেবতা। 'দেবতা'কে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন পূর্ববাংলার মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—যিনি পল্টন ময়দানের সভায় উপস্থিত ছিলেন। জিন্নাহ্‌র সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কিন্তু বিরাট পার্থক্য। জিন্নাহ্‌ ছিলেন মুসলমানদের নেতা। সাম্প্রদায়িকতাই তার মূলধন ছিলো। আর বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন পূর্ববাংলার মিলিত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র নেতা। সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বঙ্গন্ধু এক নতুন পূর্ববাংলার সৃষ্টি করেছেন।

কোনো ভাব আর প্রবণতা নিয়ে একথা বলছি না। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি এলাকা সফর করে, সেখানকার বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী আর ক্ষেত-খামারের চাষী ভাইদের সঙ্গে কথা বলেই এ ধারণা হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ যে এতোখানি এগিয়ে গিয়েছেন তা কল্পনাও করতে পারি নি। এ এক নতুন পূর্ববাংলা। যে পূর্ববাংলা ছেড়ে এসেছিলাম তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বহু পরিচিত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, আজো বয়ে চলছে, কিন্তু সেই ধারাতেও বুঝি নতুন স্রোত।

পূর্ববাংলা সফর করার সময় সবচেয়ে যেটি চোখে লেগেছে সেটি হচ্ছে এক নতুন যুব সমাজ। এ সমাজের তরুণদের সঙ্গে কথা বলার সময় যদি ভুল করে বলেছি 'পূর্বপাকিস্তান' তখনই সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিয়ে বলেছে বলুন 'বাংলাদেশ'। যদি বলেছি বাংলাদেশের 'মুসলমান' তখন তারা বিরক্ত হয়েছে। বলেছে, মুসলমান হিন্দু বলবেন না। বলবেন 'বাঙালি'। ওসব পুরোনো দিনের কথা টেনে আনবেন না। আমরা ওসব বিশ্বাস করি না।'

প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু ধীরে ধীরে এ তরুণ ছাত্র সমাজের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তখন উপলব্ধি করেছি, কথাগুলো খাঁটি সত্যি। ট্রাউজার শার্ট পরা এ তরুণ ছাত্ররা পারতপক্ষে লুঙ্গি পরে না। হাতে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কাব্যের বই। পশ্চিমবাংলার নতুন সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ। সত্যজিৎ রায়ের ছবি কোথায় দেখতে পারবে জিজ্ঞেস করছে। এদের মধ্য মুসলমান হিন্দু দুই-ই আছে। কিন্তু কোনো পার্থক্য দেখছি না। নাম জিজ্ঞেস করলে ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। নইলে সব সমান। হিন্দু ছাত্রদের আলাদা করে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারাও এ ধরনের প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে। ছাত্র আন্দোলনের যাঁরা নেতা তাঁদের অন্তত দু জন শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দুটিই তরতাজা আশাবাদী ছেলে। ঢাকা থেকে কোনো মতে পালিয়ে এসেছে। নিজেদের সহপাঠীদের হত্যার ঘটনা বলতে বলতে গলার স্বর ঘন হয়ে এসেছে। ওরা বেরিয়েছে আবার হারিয়ে যাওয়া সহপাঠিদের একত্র করতে। ওরা কিন্তু আওয়ামীলীগের নীরব অনুগামী নয়। ওরা আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টিকারী জঙ্গী ছাত্রসমাজ। ওরাই বঙ্গবন্ধুর ডান হাত।...

এ প্রসঙ্গে একটি কঠোর সত্য কথা বলতে হবে। আওয়ামীলীগের একজন নেতা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই জনগণের প্রতিনিধি। কিন্তু তারপরে আওয়ামীলীগের কোনো দ্বিতীয় নেতা নেই যাঁর সারা দেশের উপর প্রভাব আছে।...

(অনিল ভট্টাচার্য, দৈনিক যুগান্তর, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং রাজনীতি

....বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা হলো সেখানে, যেখানে তিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সুদূর ঐক্যের ভিতে এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন। পূর্ববাংলার জনগণের প্রাণ-প্রেরণা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মুক্তির প্রসন্ন প্রভাবের সন্ধানে বেরিয়েছিলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে মাত্র দু দশকের মধ্যেই স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে এনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ অপরাজেয় আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান। তাই তাঁরা আধুনিক সমরাস্ত্রের ঔদ্ধত্যের মুখে প্রায় নিরস্ত্র হয়েই বিরাট প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, নিজেদের ন্যায্য অধিকারের জন্যে যে জাতি এমনভাবে আত্মবিসর্জন করতে পারে, সে জাতির কোনোদিন মৃত্যু নেই। ইতিহাস বিধাতা সে জাতির জন্যে একটি গৌরবময় অধ্যায় রেখে দিয়েছেন। একদিন সেখানে নক্ষত্রের অক্ষরে মনুষ্যত্বের ইতিহাস লিখিত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর গতিশীলতা। কোনো অত্যচার, কোনো নির্যাতনের মুখেই এ নেতৃত্ব থমকে দাঁড়ায় নি বরং কুল ছাপানো পদ্মার দুরন্ত স্রোতের মতো তা পথের প্রতিবন্ধকতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির রক্ত স্নানের ভিতর দিয়ে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ববাংলার মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, বিভিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এ নেতৃত্ব সেই জাতীয়তাবাদের বিজয় বৈজয়ন্তীকেই সাফল্যের শেষ সীমান্তে নিয়ে গেছে। এ নেতৃত্ব সেই জাতীয়তাবাদের কবরখানায় মানবতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তার জন্ম দিয়েছে। এ নেতৃত্ব মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বাঙালি মুসলমানকে আধুনিক যুগের উদারনৈতিক চিন্তার প্রসন্ন আলোতে টেনে এনেছে। এ নেতৃত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর জন মনস্তত্বকে অনুধাবনের অসাধারণ ক্ষমতা।

এ নেতৃত্ব গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলো, পূর্ববঙ্গের উপর যখন পশ্চিমপাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থের ভয়াবহ শোষণ শুরু হয়েছে, তখন বড় বড় কেতাবি তত্ত্বের আলোচনায় না নেমে, বাঙালিকে বাংলাদেশের নামে ডাক দিতে হবে। আর এ শোষণ বন্ধ করার জন্যে পশ্চিমপাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ধ্বংস করার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন বাঙালিকে শক্তি আহরণ করতে হবে বাংলাদেশরই সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে।

অনেকে মনে করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো সুস্পষ্ট জীবন দর্শন নেই। একথা যে কতো মিথ্যে তা তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দি থেকে প্রমাণ করা যায়। সে জবানবন্দিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন : 'আওয়ামীলীগ পূর্বেও যেমন ছিলো এবং এখনো সেইরূপ

নিয়মতান্ত্রিকতার প্রথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান।' এ জীবন দর্শনকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী সাথী জনাব রেজাউল করিম খান। এক প্রবন্ধে তিনি আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'এক শ্রেণীর প্রতিবাদী রাজনীতিক বিশেষ করে ন্যাপপন্থীরা। এই বলে ৬ দফার বিরোধিতা করেছে যে ৬ দফার কৃষক শ্রমিকের মুক্তি তথা সমাজতন্ত্রের কোনো কর্মসূচি নেই। কিন্তু এ দিগগজ রাজনীতিকরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা যদি নিজস্ব নীতি নির্বাচন ও উন্নতি হাসিল করার ক্ষমতা না পায় তবে এ অঞ্চলে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে কি উপায়ে?

৬ দফাভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে পারলে তবেই পূর্ববাংলার সমাজতন্ত্র কায়েমের পথ সুগম হবে। অর্থাৎ ৬ দফার বাস্তবায়ন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে একন্তই অপরিহার্য। আমরা আওয়ামীলীগ কর্মীরা ৬ দফা আদায় করার সাথে সাথে বাংলাদেশ সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যে বদ্ধপরিকর। ....তবে কম্যুনিস্টরা যে ধরনের সমাজতন্ত্র চান তার ফলে দেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম হবে। কিন্তু আমরা একনায়কতন্ত্রের বিরোধী, তাই আমরা আওয়ামীলীগ পন্থীরা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' কায়েমে বদ্ধ পরিকর।'...

(পরেশ সাহা, দৈনিক যুগান্তর, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'.....ওরা পুরোপুরি বাঙালি হয়ে পড়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযান নিজেদের উপর আঘাত বলে মনে করেছেন। বাঙালি মুসলমান কম্যুনিস্ট হলেই সুকান্তকে আঁকড়ে ধরেন, তাদের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাবে না, দেখা যাবে সুকান্তকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কম্যুনিস্ট হন নি বলেই বাঙালিত্ব ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথের-জীবনানন্দের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। একমাত্র জাতীয়তাবাদই পারে মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা যোগাতে, দেশের বিভিন্ন স্তরের লোককে এক করতে, শত্রুর বিরুদ্ধে এক মিলিত সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করতে বিভিন্ন কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের নতুন জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। . . .

(নিরঞ্জন হালদার, কালি ও কলম, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বৈশাখ ১৩৭৮, ১৯৭১ইং)

তৃতীয় অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর বিচার পর্ব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার হবে

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জানান, 'নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হবে।' তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহীতার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী তাঁর প্রতি ব্যবহার করা হবে। গতরাতে (৩ আগস্ট ১৯৭১) পাকিস্তানের সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন, 'যেহেতু শেখ মুজিবও একজন পাকিস্তানের নাগরিক, তাই পাকিস্তানের প্রচলিত আইন তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে।'

প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্যে কী ঘটবে; তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা থেকেই তো পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি করে আসছিলেন।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'নির্বাচনে জনতার রায় পাবার পর থেকেই শেখ মুজিব এবং তাঁর কিছু সংখ্যক লোক দেশদ্রোহীতার অপরাধে অপরাধী, তিনি সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।'

এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'শেখ মুজিব কোনো ক্রমেই আমার ব্যক্তিগত শত্রু নয়। একজন রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবের সাথে আমার বিরোধ নেই। আমি পাকিস্তানের একজন খাদেম (সেবক) মাত্র।'

প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে আরো বলেন, 'আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। আমি একজন সৈনিক মাত্র। আমি আমার সাময়িক দায়িত্ব পালন করছি'। জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়। প্রেসিডেন্ট দুঃখ করে বলেন, 'শেখ মুজিব যা করেছেন, এ জন্যে তিনিও সত্যিকারভাবে দুঃখিত।' অপরদিকে উপস্থিত এক বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট পাল্টা প্রশ্ন করেন 'আপনি আপনার শত্রুর সাথে কীরূপ ব্যবহার করতেন?'

(দ্য ডেইলি ডন, করাচি, পশ্চিমপাকিস্তান, ৫ আগস্ট ১৯৭১)

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই বঙ্গবন্ধুর অপরাধ

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য অপরাধে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার একটি বিশেষ সামরিক আদালতে শুরু হবে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে আজ (৯ আগস্ট ১৯৭১) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আগামি ১১ আগস্ট ১৯৭১ থেকে বিচার শুরু হবে। গোপন কক্ষে এ বিচার হবে এবং বিচারের যাবতীয় তথ্যাবলি গোপনীয় থাকবে।'

প্রেস বিজ্ঞাপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়, 'অভিযুক্তকে আইনত সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে অভিযুক্ত'র সব রকমের সুযোগ থাকবে। তিনি ইচ্ছামতো একজন কৌশলী নিয়োগ করতে পারবেন। তবে কৌসুলিকে অবশ্যই পাকিস্তানের নাগরিক হতে হবে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৬ মার্চ ভোর রাতে তার ধানমণ্ডি বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। বস্তুত পূর্বপাকিস্তানে সরকারের অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যে সামরিক অভিযান শুরুর প্রাক্কালেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে তাঁকে হেফাজত আইনের আওতায় পশ্চিম পাকিস্তানে আনা হয়।

(ডন, করাচি, পশ্চিমপাকিস্তান, ১০ আগস্ট ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর বিচার কার্যক্রমের মেয়াদ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মি. আগা শাহী গতকাল (৩১শে আগস্ট ১৯৭১) জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মি. উ. থান্টকে জানান, 'পাকিস্তান তার সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নতুন পদক্ষেপগুলো গভীর মনোযোগের সহিত বিবেচনা করছেন।' তিনি প্রতিনিধিকে জানান, 'পাকিস্তান সরকার ইতোমধ্যে আস্থা অর্জনের জন্যে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এ নির্দেশ মোতাবেক আস্থা অর্জনের ব্যাপারটি গভীর মনোযোগের সাথে বিবেচনা করেছেন।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিচার গত ১১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এবং দু সপ্তাহের ভেতর বিচার শেষ হবে।' তিনি আরো জানান, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা এবং সহিংস বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে।' কোথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার হচ্ছে এ স্থান উল্লেখে রাষ্ট্রদূত অপরাগতা জানান। তবে তিনি জানান, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন।' আইনজীবী কে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন মি. এ. কে. ব্রোহি। তিনি পাকিস্তানের একজন সেরা আইনজীবী।

(ডেইলি নিউজ, করাচি, পশ্চিমপাকিস্তান, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

লা'মঁদ-এর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া

'আমি একজন বিদ্রোহীর সাথে কথা বলতে পারি না'—

ফরাসি'র বিখ্যাত সংবাদপত্র ল'মঁদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার চলছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তাঁকে পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত আইনজীবী নিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।' তিনি উল্লেখ করেন, 'দেশের অখণ্ডতা যে সময় হুমকির মুখে তখন এ ধরনের গোপন বিচার কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।' তিনি আরো বলেন, বিচার শেষ হলে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল অবস্থায় এলে অবশ্যই তাঁর বিচারের পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করা হবে, তবে সেটা খুব শীঘ্র নয়।'

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবের সাথে আপনি আলোচনায় বসবেন বলে যে কথা শোনা যাচ্ছে এর সত্যতা কতোটুকু?' উত্তরে প্রেসিডেন্ট জানান, 'আমি কোনোমতেই একজন বিদ্রোহীর সাথে কথা বলতে পারি না। আগে কোর্ট মার্শাল তাকে নির্দোষ প্রমাণ করুক—তবেই এ বিষয়ে চিন্তা করা যাবে। তবে সর্বোপরি আমি এমন কিছু করতে পারি না যাতে জাতির ক্ষতি হয়।'

(ডন, করাচি, পশ্চিমপাকিস্তান, ২০ অক্টোবর ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জনগণের শত্রু

প্রশ্ন : তিনিই (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) কি আপনার প্রধান শত্রু?

উত্তর : তিনি আমার ব্যক্তিগত শুধু নয়। তিনি পাকিস্তানের জনগণের শত্রু এবং ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ পাকিস্তানের প্রতিটি লোক জানেন, কোথায় তিনি আছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই, কেননা তারা কেউ আপনাকে বলবে না।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক মতামত?

উত্তর : আমার নিজেরই যথেষ্ট বিচার বুদ্ধি রয়েছে। আমি বলছি তিনি বেঁচে আছেন এবং এ ব্যাপারে আমার এই একটা কথাই যথেষ্ট।

(প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ। প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ল্যা ফিগারো' পত্রিকায় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত হয়।)

বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিবরণী

'বিশেষ সামরিক আদালত দেশদ্রোহীতার অপরাধে অপরাধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এবং খুব শীঘ্র তারা এর পূর্ণ বিবরণী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে হস্তান্তর করবেন। উর্দু সংবাদপত্র 'ইমরোজ' আজ সংবাদ প্রকাশ করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ২৫ মার্চ পূর্বে বাংলায় সামরিক অভিযান শুরুর প্রাক্কালেই গ্রেফতার করা হয়েছিলো। সরকারি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে 'ইমরোজ' জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি ডাক্তার প্রতিদিনই তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। 'ইমরোজ' আরো জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সবগুলো জাতীয় দৈনিক পড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে কারো সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। সংবাদপত্রটি জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রয়েছে, মাছ, ভাত, ডিম, সব্জি, ফল, রুটি, মাখন ও মাংস।

(রয়টার পরিবেশনা, লাহোর, পশ্চিমপাকিস্তান, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর বিচার এখনো চলছে

'বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এখনো চলছে। তথ্য দফতরের একজন মুখপাত্র আজ (করাচি, ২১ সেপ্টেম্বর) একথা জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কীয় এ প্রথম সরকারি মন্তব্যে বলা হয় যে,

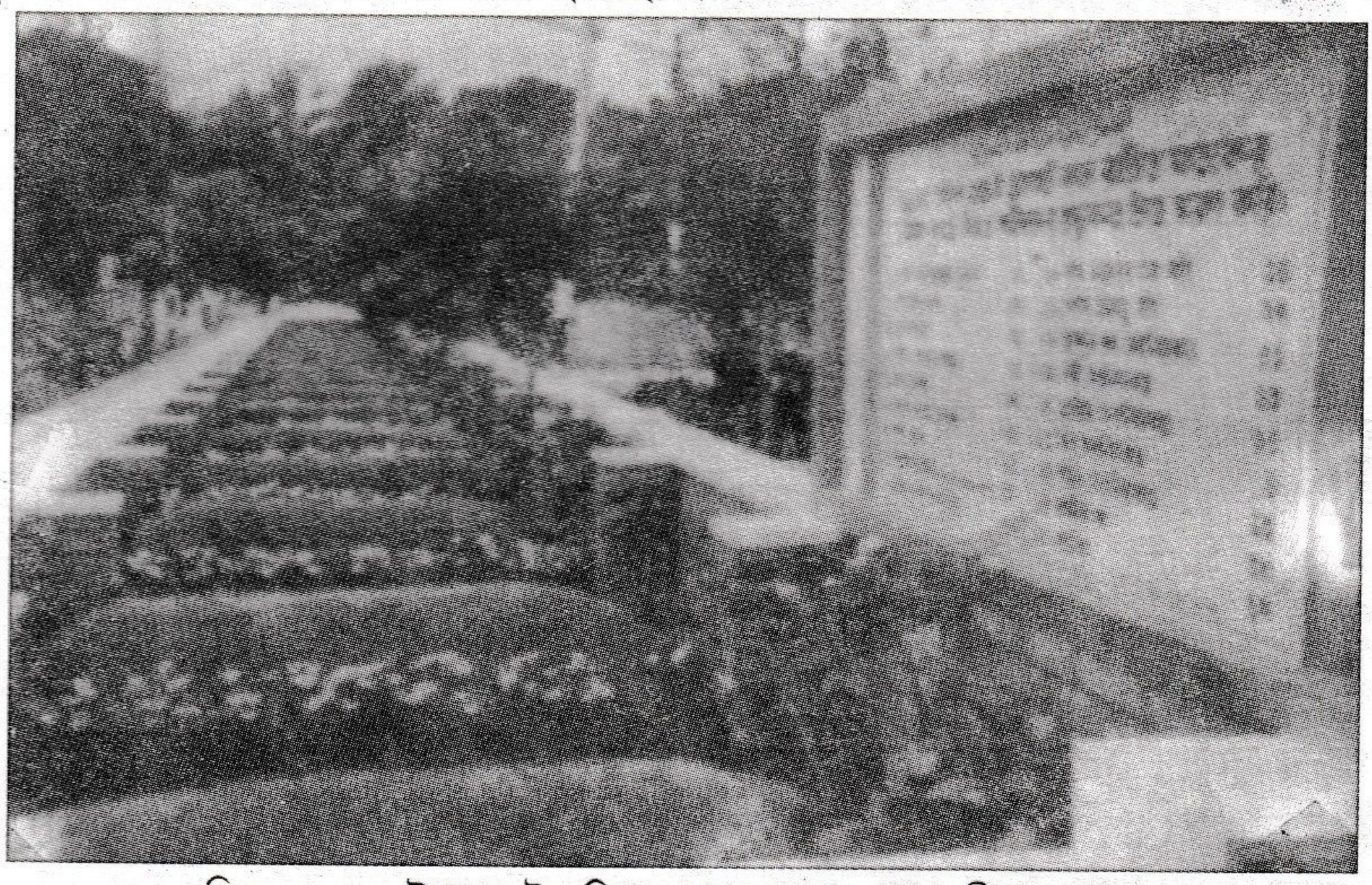
ব্রিটিশ বিচার বিভাগীয় আইন অনুযায়ী তাঁর (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের) বিচারের শুনানি হচ্ছে। মুখপাত্র জানান, বিচার কতো দূর এগিয়েছে এ সম্পর্কে তিনি কিছুই বলবেন না।

বিচার কোথায় হচ্ছে সেটা জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে, পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়লাপুরে এ বিচার কার্য চলছে। কারণ গত মাস থেকে সেখানে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনো পর্যন্ত একজন নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য। এমন কি আগামি নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ পূর্ববাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচন করার জন্যে যে একটি তালিকা প্রণয়ন হয়েছে, সে তালিকাতেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আসনের উল্লেখ নেই।'

(এএফপি পরিবেশনা, করাচি,পশ্চিমপাকিস্তান, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর বিচার শেষ হয়েছে

'দেশদ্রোহীতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার শুরু হয়েছিলো সেটা শেষ হয়েছে। আজ ১৮ ডিসেম্বর একজন সরকারি মুখপাত্র এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিচারে কী দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় নি।' আওয়ামীলীগ নেতাকে বাংলাদেশে ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের সময় গ্রেফতার করা হয়েছিলো।



চিত্র : ৬। ১৫ই আগস্টের নিহতেরা শুয়ে আছেন বনানী কবরস্থানে।

তিনি এখনো পর্যন্ত ইসলামাবাদ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত লায়লাপুর অন্তরীণ আছেন। মুখপাত্র জানান, 'বিচার শেষ হয়েছে। সমস্ত বিষয় ক্ষতিয়ে দেখার কাজও শেষ। তবে আমি বলতে পারবো না কি নাগাদ বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে। তবে বিচারের রায় দ্রুতই ঘোষিত হবে এবং যতো দূর ধারণা করা যাচ্ছে সেটা এ মাসেই ঘোষণা করা হবে।'

সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার হয়েছে এবং এই কোর্ট ছিলো সম্পূর্ণরূপে জনগণের জন্য নিষিদ্ধ।

(ইউপিআই পরিবেশনা, ইসলামাবাদ, পশ্চিমপাকিস্তান, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেছে

'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এক জরুরি সভা গতকাল (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করেছে। গতকালের সভা অবশ্য তাদের জেনারেল সেক্রেটারি মি. মামুদুল হক উসমানীর মুক্তি দাবি করেছে। এ ছাড়া যতো দূর জানা যায় তাদের নেতা আবদুল ওয়ালী খান খুব শীঘ্র দেশে ফিরবেন। তিনি বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন আছেন। ইতোমধ্যে গতকাল এখানে (পাকিস্তান) এক সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মা'কে (৭৫) গত মঙ্গলবার, (২২ সেপ্টেম্বর) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যাজমায় ভুগছেন। তাঁর পিতাকেও (৯০) ঐ একই হাসপাতালে গত শুক্রবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভর্তি করা হয়েছে। তিনি গ্যাস্টিক আলসারে ভুগছেন।'

(রয়টার পরিবেশনা, করাচি, পশ্চিমপাকিস্তান, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

পাকিস্তানি নেতারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেছেন

চল্লিশজন রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিকনেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ছাত্রনেতা সমাজসেবী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী নেতা ইস্তিক্লাল পার্টি প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) আজগর খান এবং লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ। ফয়েজ আহমদ বলেন, 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র পথ একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার।' গতকালের (৪ নভেম্বর) লাহোরে প্রদত্ত যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি বিচার বিভাগের মৌলিক অনুশাসন অনুযায়ী দেওয়া হতে পারে।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'যদি একান্তই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সামরিক আদালতে অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার অবিলম্বে বন্ধ করে তাঁকে বিচার বিভাগের অধীনে আনা উচিৎ।' প্রেসিডেন্ট তিন দিনের সফরে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে গতকাল লাহোর এসে পৌঁছেছেন। তাঁর এ আগমনের সময়ের সাথে মিল রেখেই বিবৃতিটা প্রধান করা হয়েছে।

বিবৃতি প্রদানকারীরা বলেন, তারা সম্প্রতি নিউজউইকে দেওয়া প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎকারের আলোকে এ দাবি করেছেন। কারণ ঐ সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, তিনি অবশ্যই শেখ মুজিবের মুক্তি দিতে রাজি যদি জাতি তাঁর মুক্তি দাবি করে থাকে।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটানোর একমাত্র উপায় একটি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার এবং সেটা সম্ভব কেবল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের মাধ্যমে।' বিবৃতি প্রদানকারীরা অধিকাংশই

বামপন্থী এবং প্রেসিডেন্টের লাহোর পৌঁছানোর সাথে সাথেই এ বিবৃতি প্রদত্ত হয়। উল্লেখ্য লাহোরই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় মুজিব বিরোধী ঘাঁটি।'

(রয়টার পরিবেশনা, লাহোর, ৫ নভেম্বর ১৯৭১)

ভারতীয় লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রি সর্দার শরণ সিং-এর বিবৃতি

'আমার বক্তব্য'র বিষয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সকল তথ্য পেয়েছি সেগুলো। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের প্রস্তাব এসেছে। যতো দূর জানা যাচ্ছে এ বিচার সামরিক আদালতেই হবে। অবশ্য তারা বলেছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্যে একজন আইনজীবী দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তারা উল্লেখ করেছে যে, কোনো বিদেশি আইনজীবী নিযুক্ত করার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হবে না। এ বিচার যে একটি প্রহসন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ একথা সবাই জানেন যে, পাকিস্তানে কোনো স্বাধীন বিচার বিভাগের অস্থিত্ব নেই। তাছাড়া গোপন বিচার হোক আর স্বাধীনভাবে বিচার হোক এটা কোনো মতেই আইন সঙ্গত নয়, যেহেতু বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করেছি।

বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র প্রয়োগের পর থেকেই আমরা জানিয়ে আসছি সামরিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক, তাই এর রাজনৈতিক সমাধানই করতে হবে। সমাধান বলতে এমন কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে যেটা বাংলাদেশের জনগণ, আওয়ামীলীগ এবং বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৮ জুনের বিবৃতি অনুযায়ী যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা খারাপ হবে। তবে এ ধরনের যে-কোনো পদক্ষেপই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কী করবে আরো দৃঢ়চেতা।

সুতরাং আমরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলতে চাই যে, বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপর যদি কোনো রূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয় বা বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর যদি এমনিভাবে বর্বর সামরিক আক্রমণ চলতে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আরো দৃঢ়চেতা করবে। তবে এটাও ঠিক, মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যাহত চাপে দিশেহারা ইয়াহিয়া এখন যুদ্ধ ঘোষণার পায়তারা খুঁজছে। তা ছাড়া সে বিশ্ব জনমতকে মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে অন্যত্র সরানোর জন্যে ভিন্ন পথ অবলম্বনের চেষ্টা করছে।

(দ্য ডেইলি স্টেটসম্যান, নয়াদিল্লী, ভারত, ২০ আগস্ট, ১৯৭১)

বিশ্ব রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বার্তা

অত্যন্ত গোপন মার্শাল কোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে এবং তাঁকে কোনো রূপ বিদেশি আইনজীবী রাখতে দেওয়া হবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এ বিবৃতির পর থেকে ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণ সাথে সাথে ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও ভারতীয় সংসদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি এ ধরনের বিচার কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার লক্ষ্যে ছলনার গায়ে একটি

আইনের মোড়ক দেওয়া মাত্র। কিন্তু এটা নিশ্চিত এ ধরনের পদক্ষে পূর্ববাংলার পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তুলবে, সাথে সাথে ভারতের অবস্থাও উদ্বেগজনক হবে। কারণ ভারতের জনগণ এবং ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে গভীরভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন। আর এ জন্যেই আমাদের এতো উদ্বেগ। তাই আমরা মনে করি, এ এলাকায় শান্তির জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যাতে বাস্তবসম্মত পন্থা গ্রহণ করে সে লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে আপনি আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(দ্য ডেইলি স্টেটসম্যান, নয়া দিল্লী, ভারত, ৮ আগস্ট, ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া

গত ডিসেম্বরে (১৯৭০) অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পশ্চিমপাকিস্তানের সামরিক আদালত গোপন বিচার শুরু করেছে। তাদের অভিযোগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশদ্রোহী এবং সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণাকারী। এ সংবাদে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপত্র বলেন, পূর্বপাকিস্তানের বৃহত্তম পার্টির নেতার জীবনাশঙ্কায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বিগ্ন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ এজন্যে পাকিস্তান সরকার প্রতি আবেদন জানায়, পাকিস্তান সরকার যেনো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ন্যায্য বিচার এবং মানবতা প্রদর্শন করে। তবে যদি এ কোর্ট মার্শাল চলতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে কেবল পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি ঘটবে না; বরং উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে আসবে এবং এ ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে দেখা দেবে। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র জানান, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি এ আবেদন জানায় যে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও পাকিস্তানের সামরিক সংঘাত সমাধানের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে যেনো পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ক্ষমতাশালী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কোর্ট মার্শাল বন্ধ করে। তারা মনে করে এ পদক্ষেপ পাকিস্তানের সংঘাতের একটি শান্তি পূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের পথ সুগম করে দেবে এবং এ ধরনের মানবতা এবং বিবেচনা নিরাপত্তা ও শান্তির সহায়ক হবে।

(দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লী, ভারত, ১৪ আগস্ট, ১৯৭১)

ইয়াহিয়ার প্রতি জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট কমিশনের টেলিগ্রাম

১৭ আগস্ট, ১৯৭১
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান
প্রেসিডেন্টস হাউস
রাওয়ালপিণ্ডি, পশ্চিমপাকিস্তান।

বিশ্ব জনমত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কারণ সামরিক আদালত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যাতে এটা না ঘটে, এ জন্যে ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট

কমিশন আপনাকে নম্রতা প্রদর্শন করার জন্যে অনুরোধ করছে। দণ্ডাদেশ পরিবর্তনের মতো বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত পুনরায় সহিংসতা বা বিপ্লবের তীব্রতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং প্রশমনে সাহায্য করবে।

ম্যাক্ ডার্মোট্

সেক্রেটারি জেনারেল

আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদের আহ্বান

'গোপন বিচার বন্ধ করুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি দিন

সম্পুর্ণরূপে মনুষ্যনীতি'র প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে এবং বিশ্বজনমতকে কোনো রূপ তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশের) জনগণের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অব্যাহত রেখেছে। বিচার কার্য সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়ভাবে চলছে, কেউই জানে না যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার কী করতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, এ ধরণের যুদ্ধ ঘোষণার মতো শ্লোগান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত ভারতে বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দোহাই দিয়ে সে সময় বহু ভারতীয় দেশপ্রেমিককে তারা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। অবশ্য যে সব বিচারগুলো অন্তত প্রকাশ্যে করা হতো।

অপরদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী বা যে সকল শাসকের জনগণের প্রতি কোনো রূপ দায়-দায়িত্ব থাকে না, ঠিক তেমনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে লুঠতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র অন্যায় ইয়াহিয়া খান যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন অনুগত দাস ছিলো সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার জন্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আর এজন্যে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর দলকে ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টিতে নির্বাচিত করেছে।

যদি গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে বিন্দুমাত্র মানা হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি। কিন্তু মার্শাল বুরোক্র্যাসি এবং সামন্তবাদের প্রতীক ইয়াহিয়া খান কোনো মতেই ক্ষমতার ভাগ ছেড়ে দিয়ে জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রাজি নয়। আর এ ক্ষমতা নিশ্চিত করণের জন্যে তারা সমস্ত রকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গোপন বিচার শুরু করেছে এবং এটা ইতোমধ্যে ধ্বংস বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রও বটে।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্রর জনগণ পূর্বপাকিস্তানের ধ্বংসযজ্ঞের জন্যে গভীরভাবে দুঃখিত এবং সবাই মনে করে এ সমস্যা আরো জটিল হবার পূর্বে এর সমাধান প্রয়োজন। কারণ সমস্যা আরো জটিল হলে তখন আর ফেরার পথ থাকবে না এবং গোটা দেশ জুড়ে এ ধরণের দুর্ভাগ্যজনক সংঘর্ষ নিঃসন্দেহ বিশ্বশান্তির জন্যে হুমকিস্বরূপ। বিশ্ব জনমত অবিলম্বে এ ধ্বংসযজ্ঞের অবসান চায়। সবাই এ বিষয়ে

একমত যে, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান রাজনৈতিক মীমাংসা। আর এ ধরনের রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার পর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জনগণের প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অপরাপর সহকর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ তাই শান্তির পক্ষে সমস্ত শক্তির প্রতি আহ্বান জানায় যে, পাকিস্তানের জনগণের আইনের জন্যে তারা যেনো অবিলম্বে ইয়াহিয়ার প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানায় এবং তাঁর মুক্তি অতি শীঘ্রই প্রয়োজন, কারণ তাঁর বিচারের চেয়ে তাকে মুক্তি দেবার সময় অনেক পেছনে ফেলে আসা হয়েছে। বিশ্বশান্তি পরিষদ তার সমস্ত জাতীয় কমিটির প্রতি আহ্বান জানায় তারা যেনো অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ইয়াহিয়ার প্রতি তারবার্তা প্রেরণ করে।

বিপদের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে তাই চরম দুঃখজনক পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্যে বিশ্বশান্তি পরিষদ সমস্ত শান্তির স্বপক্ষ শক্তিকে এ মুহূর্তে পূর্ব সাবধানতার লক্ষ্যে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।'

জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট কমিশনের টেলিগ্রাম

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান
প্রেসিডেন্ট ভবন
রাওয়ালপিণ্ডি, পশ্চিমপাকিস্তান।

ইন্টারন্যাশনাল জুরিস্ট কমিশন সম্মানিত আইনজীবী এ.কে. ব্রোহীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কৌসুলি নিয়োগ করার জন্যে স্বাগত জানাচ্ছে। তবে সম্মানের সাথে আপনাকে আবারও জানাচ্ছি, গোপন বিচার বন্ধ রাখুন।

ম্যাক্ ডার্মোট্
সেক্রেটারি জেনারেল।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করবে

নেপালের পূর্ববাংলা শরণার্থী সাহায্য কমিটি এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করেছে। তারা জানিয়েছে, এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং পূর্ববাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরই কেবল শরণার্থীরা ঘরে ফিরে যেতে সমর্থ হবে।

গতকাল (৭ সেপ্টেম্বর ১০৭১) কাঠমুণ্ডুতে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বলা হয় এটাই এশিয়ার শান্তি নিশ্চিত করানোর একমাত্র পথ। সভার গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, 'পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং গণহত্যার জন্যে সে দেশের সামরিক জান্তাই দায়ী।

নেপালের প্রখ্যাত নেতারা এ জনসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা প্রত্যেকে তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নেপালের জনগণের সাহায্যের হাত রয়েছে এবং এগিয়ে যাবে বলে জানান। জনসভা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বীর জনগণের এ গৌরব উজ্জ্বল সংগ্রামকে অভিনন্দন জানায়।

প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রি এবং সাহায্য কমিটির চেয়ারম্যান মি. ঋষিকেশ সাহা সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি মি. সূর্য বাহাদুর থাপা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি মি. এস.পি. উপাধ্যায় এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ড. কেশর সিং রামজী সভায় বক্তব্য রাখেন।

(দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, নয়া দিল্লি, ভারত, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

মি. আর্থার বোটমলি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চেয়েছেন

কুয়ালালামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ : কমন্ওয়েল্থ পার্লামেন্টারি বৈঠকের উদ্বোধনী দিনে আজ প্রাক্তন কমন্ওয়েল্থ সেক্রেটারি মি. আর্থার্ বোট্মলি কমন্ওয়েল্থভুক্ত দেশগুলোকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে চাপ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি পূর্বপাকিস্তানের জনগণের সাথে কথা বলতে পারেন। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, পূর্বপাকিস্তানে খুব শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং তাতে হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

(দ্য গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)



চিত্র : ৭। জেল থেকে বের হলেই গলায় মালা পরে এমন হাস্যোজ্জল হতেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর চার্লস এইচ. পার্সির বিবৃতি,

পশ্চিমপাকিস্তানের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পূর্বপাকিস্তানের প্রতিবাদের প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ব জনমতের সাথে আমিও একমত যে, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় বা তাঁকে আরো অধিক সময় কাল বন্দি রাখা হয় তাহলে তাঁর জাতির দুর্ভোগ আরো গভীরতর হবে। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও

তাঁর দল গত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনিই তাঁর দেশের আইনত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রি।

(ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, বোস্টন, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে চাপ প্রয়োগ করুন

মি. ক্লোভিস্ ম্যাকসুদ্

নয়া দিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর আরবলীগের প্রাক্তন নয়া দিল্লিস্থ প্রতিনিধি এবং কায়রোর আলআহ্রাম পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদক মি. ক্লোভিস ম্যাকসুদ আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ এবং জোটনিরেপক্ষ বিশ্বের প্রতি অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে কার্যকরি চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং গত ডিসেম্বরের নির্বাচন উত্তর অবস্থানে ফিরে যাবার পরই পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের পথ খুলবে। তিনি বলেন, এ ছাড়া কোনোক্রমেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়।

নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত দু দিনের বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগদান কালে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে মি. ম্যাকসুদ বলেন, আরব জনগণ এবং আরব রাষ্ট্রগুলো ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশে দুঃখজনক পরিস্থিতি এবং ভারতের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও নিরাপত্তার বিষয়টি বুঝতে সমর্থ হচ্ছে।

(হিন্দুস্থান টাইমস, নয়া দিল্লি, ভারত, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরের বিবৃতি

অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ড. ব্রুনো ক্রিস্কাই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি করে রাখার ব্যাপারে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইউরোপের কোনো গণতান্ত্রিক দল এ অন্যায় সহ্য করতো না।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক ইউরোপ ও আমেরিকা সফর সঙ্গী সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে ড. ব্রুনো একথা বলেন। অবশ্য তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তার এ বক্তব্য অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর হিসেবে নয়, তিনি অস্ট্রিয়ার সোসালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবই একথা বলছেন। তিনি বলেন, ঘটনার আবর্ত অনেকখানি সহজ হতো যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হতো। তিনি আরো বলেন, ঘটনা সম্পর্কে তার ধারণা কম, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, বিষয়টি জটিল এবং এটা শান্তির জন্যে হুমকিস্বরূপ। যেমন ইসরাইল সমস্যা—এ সমস্যা কোনো মতেই যুদ্ধ দ্বারা সমাধান হবে না। তার মানে এ কথাই বলতে চাচ্ছি যে, এক পক্ষ এখন মিত্র শক্তি নিয়ে কুর্দন আরম্ভ করে তখন রাজনৈতিক সমাধান ক্রমান্বয়েই পিছিয়ে পড়ে।

(টাইমস অব ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি, ভারত, ২৯ অক্টোবর ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার

পাকিস্তান ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রকৃত অধিকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার চলতে থাকলে যে পাকিস্তানের সার্বিক সমস্যা বর্তমানের চেয়ে আরো অধিক জটিল হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অধিকাংশের ধারণা।...

(ট্রিবিউন দ্য জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ১০ আগস্ট ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু, বিচার পূর্ববাংলায় নভেম্বরের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করবে- উ. থান্ট

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল মি. উ. থান্ট হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'পূর্বপাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর অভিযোগ এনে গোপন বিচার করলে—পূর্ববাংলার অবস্থা গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংস ও মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর হবে। এদিকে ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কোথায় রাখা হয়েছে সেটাও স্বীকার করতে নারাজ। তাদের তথ্য বিভাগ এটুকুই শুধু বলতে রাজি যে, পাকিস্তানের কোনো এক স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার হচ্ছে।

ঐতিহ্যগতভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, গণচীনের প্রতিবেশী এ দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের অর্থাৎ জনগণের ভোট শক্তি এবং ইয়াহিয়া খানের মিত্র শক্তির ভেতর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই একমাত্র সমঝোতা। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দল গত ডিসেম্বর-এর নির্বাচনে শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পেয়েছিলো। অপরদিকে বিশ্বজনমতও মি. উ. থান্টের সাথে একমত যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারের পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

(লা নাসিঅন, বুয়েন্স আয়ার্স, ১৫ আগস্ট, ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেশদ্রোহিতার প্রকৃতি

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার ১১ আগস্ট হতে শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি দেশদ্রোহী। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এ দেশদ্রোহীতার প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ সরস ইতিহাস রয়েছে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন স্বায়ত্ত শাসন দাবি সম্মিলিত ছয় দফা ঘোষণা করেন, তখন তাঁকে বলা হয়েছে দেশদ্রোহী। কলঙ্কিত করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আনা হয়েছিলো। উল্লেখ্য, ঐ ছয় দফাই ছিলো গত নির্বাচনে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। স্বায়ত্বশাসনের দাবি পাকিস্তানে এ নতুন নয়। বস্তুত জিন্নাহ্‌র যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই লাহোর প্রস্তাবই এ স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি। লাহোর প্রস্তাবে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে ভারত-পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম এমনি কয়েকটি জোনে বিভক্ত হবে এবং যেখানে মুসলিম প্রধান সেখানে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে আর ঐ রাষ্ট্র থাকবে স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পূর্ব খণ্ড কখনোই স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র নয়, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এ অংশটি পশ্চিমা শাসকদের দ্বারা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৭০-এর নির্বাচনে সাধারণ স্ট্যান্ড নিয়েছে। যার ফলে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দল জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ....।

কিন্তু গণহত্যার শুরু থেকেই আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'দেশদ্রোহী' বলে কলঙ্কিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। .... অবশ্য এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উল্লেখ করার প্রয়োজন, লাহোর প্রস্তাবে যে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের উল্লেখ আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ছয় দফায় সেটাও চান নি, কেন্দ্র বিদেশনীতি এবং প্রতিরক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে—এটা মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন . . .।'

(সানডে টাইমস, জাম্বিয়া, ২২ আগস্ট ১৯৭১)

অবশ্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে

'পশ্চিমপাকিস্তানের একটি সামরিক আদালত গোপনে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নির্ধারণ করছে। পশ্চিমপাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সাফী'র মতে, 'তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।'

"যেমন একটি মহিষের শিং, একটি বাঘের থাবা, একটি মৌমাছির হুল, বাঙালি ঠিক এমনিই বিশ্বাসঘাতক"। ১৮ শতকে প্রথম ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এভাবেই বাঙালিকে বিচার করেছিলেন।

বাঙালির নতুন শাসক পশ্চিমপাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সামরিক জান্তা যোগ্য ব্রিটিশ উত্তরসূরির মতোই আঘাত হেনেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের ২০০ বছর পরে বাঙালির 'বিশ্বাসঘাতকতা'র বিরুদ্ধে ঠিকই ব্রিটিশ শিক্ষাকে নতুন করে শাণিয়ে নিয়ে নেমেছে। আর এটার আরম্ভ হয়েছে গাঙেয় ব'দ্বীপ থেকে ২ হাজার কিলোমিটার দূরে লায়ালপুর জেলে মুজিবের বিচারের ভেতর দিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অপরাধ তিনি বাংলার জন্যে স্বায়ত্বশাসন চেয়েছিলেন এবং গত নির্বাচনে তাঁর দল এবং তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন।

পশ্চিমপাকিস্তানের শাসকরা কখনোই পাকিস্তানে বাঙালিরা কর্তৃত্ব করুক এটা চায় না। এ জন্যেই তারা দেশটাকে একটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের ভেতর ঠেলে দিয়েছে। আর এটাই অভিযোগ, "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।"

পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান ইয়াহিয়া খান বিচারের রায় আগেই স্থির করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি মি. কার্গিল তাকে এরূপ একটি সাধারণ ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেন যে, "এ ব্যক্তি দোষী এবং ভয়ানক দেশদ্রোহী, তাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।" এ আদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করে মি. ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষের কৌসুলি হিসেবে মি. এ.কে. ব্রোহিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু 'মর্নিং নিউজ' এ ঘোষণার সমালোচনা করে বলে, মি. এ.কে. ব্রোহি'র নিযুক্তকরণ পাকিস্তান সরকার যে একটি ন্যায্য কাজ করলো তারই স্টেজ মহড়া মাত্র।

এদিক থেকে বিচার করে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বলেন, সামরিক রায় অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্যে মৃত্যুদণ্ড হবে—বড় জোর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে নামতে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উচ্চ শাস্তি পাকিস্তানের বিচার বিভাগের নায্য ক্ষমতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রোধকে সন্তুষ্ট করবে। অপরদিকে সে দণ্ডাদেশ লঘুকরণের মাধ্যমে পাকিস্তান বিশ্বে কিছুটা সুনাম অর্জন করতে পাররে। পাকিস্তানের এ মুহূর্তে সুনাম অর্জনের জন্যে মরিয়া—কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারই তাদের একমাত্র সমস্যা নয়।

আওয়ামীলীগের জাতীয় পরিষদের ১৬৭ জন সদস্যর ভেতর মাত্র ৮৮ জন প্রশ্চিম পাকিস্তানের সাথে দালালি করতে রাজি হয়েছে। অপরদিকে প্রাদেশিক পরিষদের ২৮৮ জনের ভেতর মাত্র ৯৪ জন।

অপরদিকে বাকি যে সকল সদস্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর পার্টির প্রতি অবিচল রয়েছে। গত ২৬ আগস্ট সকাল ৮টায় তাদের জন্যে এক সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে কোনো আইনজীবী ছাড়া তাদের জন্যে যুদ্ধকালীন জরুরি সামরিক আদালত অপেক্ষা করছে।

এ সকল এম.পি.দের ভাগ্যে কী ঘটবে এ প্রসঙ্গে মেজর ইফতেখার পত্রিকা স্পাইজেল্‌কে জানান, 'এসব বিচার তৃতীয় জেনারেশন উপলব্ধি করতে পারবে যে তাদের জন্যে কতোখানি সঠিক কাজ করা হয়েছিলো।'

(স্পাইজেল্, বন, জার্মান, ৩০ আগস্ট ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সমন্বয়ের লক্ষ্যে আবার একটি নতুন চমক সৃষ্টি করেছেন। গত বৃহস্পতিবার আবার একজন বেসামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। নব নিযুক্ত গভর্নর একজন বাঙালি। ইতোপূর্বের সামরিক গভর্নর ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানি। তাছাড়া পশ্চিমপাকিস্তানি এ গভর্নর টিক্কা খান বাঙালিদের কাছে একজন 'কসাই' হিসেবে পরিচিত। যেহেতু সামরিক বাহিনী বাঙালি বিদ্রোহীদের উপর বর্বরের মতো অত্যাচার চালিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের পরিবর্তন বাঙালির কাছে কতোটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা সন্দেহের বিষয়। কারণ ২৬ মার্চের তাণ্ডবতার পর বাঙালির কাছে যে এটা গ্রহণযোগ্য হবে এ আশা করা ভুল। সমস্ত বিদেশি পরিদর্শকের মতে, বাঙালি তাদের দেশের উপর খবরদারকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং তাদের গভীর সহযোগী বিহারি মুসলমানকে গভীরভাবে ঘৃণা করে। এ জন্যে বলা চলে ৬৬ বছর বয়স্ক পুরাতন কূটনীতিক মালেক সাহেব গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বাঙালির কাছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিহ্নিত হবেন। এ মুহূর্তে যদি সত্যিকারভাবে কোনো একক ব্যক্তি থেকে থাকেন, যার প্রতি প্রত্যেক বাঙালির শ্রদ্ধা আছে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—তাঁকে মুক্তি না দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুন না কেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ রূপে অর্থহীন।

(দ্য লন্ডন টাইম্‌স, লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

নির্বাচিত নেতা রাজক্ষমার অপেক্ষা রাখে না

অতি বড় মূর্খ ছাড়া এ মুহূর্তে কেউই ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে সাহসী হবে না। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এদেশটি এখন মানুষের সৃষ্ট দুর্ভোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। এমন কি নিরাপত্তার খোঁজে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ জনগণ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দায়িত্ব ছিলো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা। আর এ লক্ষ্যে তার উচিত ছিলো পদত্যাগ করা, কিন্তু তা না করে গত কয়েক মাসে তিনি আরো সমস্যার জট পাকিয়ে তুলেছেন, তা আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

সবেমাত্র নয় মাস হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে পূর্বপাকিস্তানের ভোটাররা তাঁকে নিরঙ্কুশ জয় এনে দিয়েছিলো। কিন্তু সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এখন দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচারের মুখোমুখি এবং সম্ভবত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তব্য, পূর্বপাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ সব সময়ের জন্যে পশ্চিমপাকিস্তানের শিল্পপতিদের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। বস্তুত পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান কলোনি হিসেবে ব্যবহার করছে। ঐ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হন এবং তিনি তার স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। কিন্তু এ দাবি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পশ্চিম খণ্ডের বিজয়ী নেতা মি. ভুট্টো (অবশ্য ভুট্টোর আসন সংখ্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তুলনায় নগণ্য।) কর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সামরিক শাসন জারি হবার সাথে সাথে বাংলাদেশও স্বাধীনতার দাবিতে চলে এসেছে। তাই যদিও সাধারণ ক্ষমা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টার একটি প্রতীক তবুও এক্ষেত্রে সেটা খুব বেশি কার্যকর হবে না, বা কার্যকর হবে না গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যতোক্ষণ না পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি ভদ্রতা প্রদর্শন করা হবে।'

(সম্পাদকীয় : ত্রিনিদাদ গাউয়িন্, পোর্ট অব্ স্পেন, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি ও যথাযথ সময়....

'আমরা মনে করি, যদি যথাযথ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দেওয়া হতো তাহলে সমস্যার একটা প্রকৃত শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিলো। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এবং তার পার্শ্ব চরেরা যখন এসে এ পথ খুঁজছে তখন বস্তুত অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ....'

(দ্য ট্রিবিউন আফ্রিকান, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

পরিণতি সম্পর্কে ইয়াহিয়া অন্ধ

'পাকিস্তানের উপর অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে শরণার্থীদের দেশে ফিরতে রাজি করানোর মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে। একমাত্র তখনই একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব এবং কেবল পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তান তাদের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার পরই আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অন্ধের মতো যেসব আচরণ করছেন তাতে একক পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাজনৈতিক সমাধানের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

গোপন কক্ষে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামীলীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার চলছে। যদি তাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

(সম্পাদকীয়, দ্য ক্যানবেরা টাইমস, অস্ট্রেলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দিন

'ইসলামাবাদকে অবিলম্বে পূর্ববাংলার বাস্তবতা স্বীকার করা উচিত এবং সেই মোতাবেক সে দেশের জনগণের জন্যে একটি সম্মানজনক সমাধানের পথ খুঁজতে

হবে যাতে করে তারও সম্মান থাকবে। অপরদিকে এশিয়ারও শান্তি বিঘ্নিত হবে না, এ বিষয়ে নেপালি জনগণের মতামত গত ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত জনসভার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এবং নেপালের বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রশ্নে নেপালের সম্মানিত সরকার নিশ্চয়ই তাঁর জনগণের মতামতকে মূল্য দেবেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের এখন একমাত্র পথ এ মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া এবং ঐ পথে অর্থাৎ ২৩ বছরের সম্পর্ক পরিবর্তন করে সমান সম্মানজনক অবস্থায় আলোচনা শুরু করা।

যদি ২৩ বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দরজা খুলে যায় তবুও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ভেতর গভীর বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ কোনো মতেই রুদ্ধ হয় নি বরং খুব সহজেই এ পথ সুগম রাখা সম্ভব। আমরা মনে করি ইসলামাবাদ বিবেচকের মতোই দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বের এ সম্ভাব্যতাকেই গ্রহণ করবে।'

(সমীক্ষা, নেপালী সাপ্তাহিক, কাঠমুণ্ডু, নেপাল, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

মুজিবের অনুসারীরা সক্রিয়

'এক সপ্তাহের ভেতর নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে সরকারিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র রাওয়ালপিণ্ডি থেকে জানিয়েছে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে যে, এদিকে বর্তমান দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুসারীরা পশ্চিমপাকিস্তানেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবের সাথে সম্পর্ক আছে এমন একটি সংবাদপত্র এখানে তাঁর মুক্তির পথ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার এককালীন সহযোগীরা এখানে কথা বলার চেষ্টা করছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি কেবল এ মুহূর্তেই হওয়া উচিত নয় এটা প্রয়োজনীয়। অপরদিকে পূর্বপাকিস্তানের দেশপ্রেমিক নেতারা মনে করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি পুনরায় প্রদেশের শান্তি বিঘ্নিত করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশদ্রোহীতা বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে বিচারাধীন রয়েছেন।'

(দ্য ডেইলি নিউজ, করাচি, পশ্চিম পাকিস্তান, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

অনিবার্য ট্র্যাজেডির হাত থেকে রক্ষার উপায়

'পূর্বপাকিস্তানের এ জটিল এবং ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একজনই ব্যক্তি আছেন, যিনি এ পরিস্থিতি সামলে নিতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর দলই গত ডিসেম্বরের (১৯৭০) সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পর থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমপাকিস্তানে বন্দি আছেন এবং দেশদ্রোহীতার অপরাধে মার্শাল কোর্টে তাঁর বিচার চলছে। যদিও এখন পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়া হয় নি, তবে এ বিচারের রায় মৃত্যুদণ্ডই ঘোষিত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই একমাত্র বাঙালি নেতা, যাকে সমগ্র বাঙালিরা ভালোবাসে এবং একমাত্র তিনিই তাঁর নিজস্ব ভাবমূর্তির বলে বাঙালিকে পুনর্গঠিত করতে পারেন। যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সামনে এ মুহূর্তে রাজনৈতিক সমাধানে অনেক বাঁধা। কারণ, তাঁর অনেক অনুসারীদের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, তবুও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়া কোনো সমাধানই সম্ভব নয়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, পশ্চিমপাকিস্তান সরকার একথা ভালোভাবে বোঝে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করে আরো গভীরতর আলোচনার ভেতর যাওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিঃসন্দেহে ইসলামাবাদের উপর তাঁর প্রভাব খাটাতে পারে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইসলামাবাদকে খয়রাতি সাহায্য দিয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপ একটি অনিবার্য ট্র্যাজেডির প্রতিষেধকই হবে।'

(দ্য ইভিনিং স্টার, ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)

চতুর্থ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন

(প্রত্যাবর্তন ও মুক্তির দাবি সংক্রান্ত সম্পাদকীয়)

ভুট্টোর তুরুপের তাস

'ধূর্ত রাজনৈতিক খেলোয়াড় মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো দুই সপ্তাহ আগে পরাজিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার সাথে সাথে এক হাত খারাপ তাসের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। কিন্তু মি. ভুট্টো উত্তরাধিকারীভাবে একটি তাস পেয়েছেন, যেটাকে তিনি পাকিস্তান বিভক্তি, ভারত ও বিদ্রোহী পূর্ববাংলা (যেটা এখন বাংলাদেশ)-এর সাথে কূটনৈতিক খেলায় কঠোরভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন।

মি. ভুট্টোর তুরুপের তাস পূর্ববাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কলঙ্কিত সরকার ২৫ মার্চের গণহত্যার পূর্বাহ্নে গ্রেফতার করে। কিন্তু এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব একান্তভাবে জরুরি। এ নতুন জাতির পুনর্বাসন ও অগ্রগতির জন্যে তাঁর নেতৃত্বের বিকল্প নেই। অপরদিকে ভারতের জন্যেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রয়োজন। কারণ, ভারতের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র এ বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল সরকার। তদুপরি শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন, ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনা এসব সমস্যার সমাধানের জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব অপরিহার্য।

অবশ্য মি. ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে গৃহবন্দি হিসেবে স্থানান্তরিত করতে সময় নষ্ট করে নি এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে দেখাও করছেন। কিন্তু পাকিস্তানের নেতা এখনো স্পষ্ট করে বলেন নি যে, তিনি মুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঢাকায় পাঠানোর পরিবর্তে কী মূল্য আশা করেন। তবে যাই হোক, ভারতীয় সৈন্যের কাছে পাকিস্তানের পরাজিত হবার পর ভুট্টোর এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু আশা করার পথ খোলা নেই। বরং এ তাস নিয়ে বেশি খেলতে গেলে তিনি বিপদ ডেকে আনবেন। এ মুহূর্তে বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দ্রুত ঢাকা প্রত্যাবর্তন আশা করেন। তাছাড়া এ মুহূর্তেই তারা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সত্য কথাটি জানতে আগ্রহী।'

(সম্পাদকীয়, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জানুয়ারি ৩, ১৯৭১)

ঘড়ির কাঁটায় অনেক সময় বয়ে গেছে

'গ্রেফতারকৃত ৮০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য এবং ৯০ লক্ষ পাকিস্তানিদের মুক্তি দেবার ব্যাপারটি এখনো বাঙালি জনগণের ইচ্ছের উপর। এ পরিস্থিতিতে মি. ভুট্টো যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে দ্রুতই তাঁর মোহমুক্তি ঘটবে। মুজিব বাংলাদেশের জাতির পিতা, তিনি কখনো চান না যে, তাঁর জাতি অন্য কোনো আদর্শের পতাকা তলে পরিচালিত হোক। যদি মি. ভুট্টো উপলব্দি করে থাকেন, তার এ ক্ষমতা পাওয়া পূর্ব খণ্ডের মতোই একটি

গণতান্ত্রিক বিজয়; তবে তিনি বাংলাদেশের জন্ম ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ঘড়ির কাঁটা পেছনে ফিরিয়ে নেবার মতো এক ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।'

(দ্য স্ট্রেইট ইকো, পেনাং, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১)

সত্য ও বাস্তবতার মুখোমুখি ভুট্টো

'প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। যদিও তিনি সবসময় বলেছেন, পাকিস্তানের প্রদেশ দুটি। তবুও তিনি তার জনগণকে একটি প্রদেশ হারানোর বাস্তবতাকে গ্রহণ করার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে খুব শীঘ্রই বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হবে। কারণ, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, মুজিবকে আটকে রেখে যেমন পূর্বপাকিস্তানের জনগণের মেজাজ পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না, তেমনি ইসলামাবাদের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। বরং পাকিস্তানের এ মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন ভারতের সাথে একটি সমঝোতায় আসা। যেহেতু, অফিসারসহ ৯০ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারতের কাছে বন্দি। কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তিই যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাবার লক্ষ্যে ভারতের সাথে আলোচনার দ্বার খুলতে সমর্থ হবে।'

(সম্পাদকীয়, দ্য স্ট্রেইট টাইমস, মালয়েশিয়া, কুয়ালালামপুর, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১)

জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং বঙ্গবন্ধু

'প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তার এ ঘোষণা প্রকাশ করে তিনি বাস্তবতাকে স্বীকার করতে এগিয়ে আসছেন। যদিও এ ঘটনা পাকিস্তানের পশ্চিম খণ্ড এবং সাবেক পূর্ব খণ্ডে একই প্রতিক্রিয়া আনবে না।

তবে এ সত্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরায় কেবল সাবেক পূর্বপাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যেও একটি শুভ সূচনা হলো। মি. ভুট্টোও পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষমতা পেয়েছেন, ভারতীয় সৈন্যের কাছে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়ের পর। তা বলে বাংলাদেশ কেবল ভারতীয় সৈন্য দ্বারা বিজয় করা একটি দেশ ভাবলে ভুল হবে। বাংলাদেশ মূলত সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিজয়ের কারণেই। সর্বোপরি তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণায় ইহজাগতিক (ধর্ম নিরপেক্ষতা) নীতি স্থান পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, এ বাস্তবতাকে স্বীকার করেই মি. ভুট্টো বলেছেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে জোর করে কোনো প্রতিজ্ঞা আদায়ের চেষ্টা করছিলেন না এবং তা তিনি করতে যাবেনও না। তাঁর মতে, বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বেঈমানির ফলে জনগণের রক্তের উপর জন্ম নিয়েছে।'

(সম্পাদকীয় : স্ট্রেইট ইকো পেনাং, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২)

সঠিক, সময়োপযোগী এবং বিজ্ঞ পদক্ষেপ

'পাকিস্তান নেতা মি. ভুট্টো জানিয়েছেন, তিনি পূর্ববাংলার সাথে ফেডারেশনের মতো একটি সম্পর্ক রাখতে চান। বাস্তবে এ ধরনের আশা করা ভুলের স্বর্গে থাকারই সমান। কারণ পূর্ববাংলা এখন গর্বিত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বরং পূর্ব প্রদেশে দুঃখজনক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানের জন্যে এ মুহূর্তে বিজ্ঞ পদক্ষেপ হবে উপমহাদেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিবেশী গড়ে তোলার চেষ্টা। এ লক্ষ্যে তার অবিলম্বে ভারতের সাথে আলোচনায় বসা প্রয়োজন। আর এ আলোচনার পথ খোলা সম্ভব একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবার মধ্য দিয়ে।'

(সম্পাদকীয় : দ্য ক্রিশ্চিয়ান্ সায়েন্স মনিটর, বোস্টন্, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২)

পরিবর্তনের সূচনা : বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

পূর্ববাংলার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নিঃশর্ত মুক্তি দেবার পর গত রবিবার নাটকীয়ভাবে লন্ডনে পৌঁছান। লন্ডনে পৌঁছানোর পর তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার এ ঘোষণা কেবল পাকিস্তানের ইতিহাসকে ভিন্নখাতে বইয়ে দেবে না এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের এক পরিবর্তনের সূচনা হলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগারে অন্তরীণ থাকা পর্যন্ত মি. ভুট্টোর কথা ছিলো যে, পাকিস্তানের দুই প্রদেশের ভেতর কনফেডারেশনের মতো একটি যোগসূত্র থাকবে। বস্তুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা করা যাচ্ছিলো না। যেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুধু বাংলাদেশের প্রেরণার উৎস নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলাদেশের আইনত কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু এ মুহূর্তে অর্থাৎ তার এ অভাবনীয় হিথরো বিমান বন্দরে অবতরণের পর মূলত বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাবার ক্ষেত্রে এক বিরাট পথ এগিয়ে গেলো। এমন কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে এ বাস্তবতাকে স্বীকার করলেন। বস্তুত ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে গত ১৪ দিনের যুদ্ধের পরবর্তী উপমহাদেশের রাজনীতির বাস্তবতা স্বীকার করলেন। এমন কি এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে যেসব দেশ অপেক্ষা করছিলো—এখন আর তাদের পক্ষে কোনো বাঁধা থাকলো না। এখন এ সকল দেশগুলো ইতোপূর্বে ভারত ও ভুটান যে পথ অনুসরণ করছে, খুব সহজে ঐ পথ অনুসরণ করতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে মি. ভুট্টো অবশ্য একজন গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭০ সালে মি. ভুট্টো পশ্চিমপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোট পেয়েছিলেন, ঐ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কাজেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে মি. ভুট্টো জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করলেন। যদিও মি. ভুট্টোর এ পদক্ষেপ বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক চিরতরে কেটে দিলো, তবুও এ পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্যে সম্পর্কের পথ খুলে দিলো।

অপরদিকে বাংলাদেশের জন্মের ভেতর দিয়ে এ মুহূর্তে ভারত-পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাঁড়িয়েছে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট অনেক সমস্যা। যেগুলো এখনো সমাধানহীন অবস্থায় আছে। তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ যুদ্ধ এশিয়ার ক্ষমতার পট পরিবর্তন করে দিলো। এ যুদ্ধের ভেতর দিয়ে একদিকে ভারত ও সোভিয়েতের ভেতরকার বন্ধুত্ব দৃঢ় হলো এবং অপরদিকে পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকার সম্পর্ক আরো গভীর হলো।

(সম্পাদকীয়, দ্য রাইজিং নেপাল, কাঠমুণ্ডু, নেপাল, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২)

একটি চিরন্তন সত্যের শুভ সূচনা

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখন কেবল একজন মুক্ত মানুষই নন, তিনি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা এবং এ বাস্তবতাকে মেনে নেওয়াই এখন প্রতিটি দেশের কর্তব্য। সন্দেহ নেই, অনতিবিলম্বে বেশির ভাগ দেশ নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। নেপালের জনগণও আশা করে নেপালও অবিলম্বে বাংলাদেশের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। কারণ এ সত্য এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ নেপালের চীন ও ভারতের পর তৃতীয়তম প্রতিবেশী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, এ মুহূর্তে কোনো দেশেরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করার অবকাশ নেই। কারণ তারা প্রত্যেকেই জানেন, কী পরিমাণ সংগ্রাম ও ত্যাগের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বিশ্বনন্দিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ 'চিরন্তন সত্য'। বস্তুত বাংলাদেশ যে সত্য, মি. ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে সেটা প্রমাণ করে দিলেন। এমন কি পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে মেনে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এ রকম মুহূর্তে নেপালের জনগণ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গভীরভাবে সহমর্মী ছিলো তারা আশা করছে নেপাল সরকার খুব শীঘ্রই বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে। সর্বোপরি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঐ স্পষ্ট ঘোষণার পর নিশ্চয়ই নেপালের পক্ষে কোনো বাঁধা থাকার কথা নয়। তা ছাড়া এ কাজের ভেতর নেপালের একটি জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে।'

(সম্পাদকীয় : দ্য নিউ হেরাল্ড, কাঠমুণ্ডু, নেপাল, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২)

জয়, জয়, জয় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করলো যে, ভারত এবং পাকিস্তানের ভেতরকার যুদ্ধ পৃথিবীর দুঃখজনক ঘটনার একটি মাত্র। বস্তুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধি, বাংলাদেশকে পরিচালনা করার প্রকৃত এখতিয়ার তাঁরই। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ মূলত উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসান হবার পর থেকেই তাদের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে আসছে এবং তারা আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এ পথ পাড়ি দিতে তাদের বুলেট ব্যাধি ও ক্ষুধার মুখে অনেক জীবন বলি দিতে হয়েছে।

তাই আজ সাড়ে ৭ কোটি মানুষের প্রিয় 'মুজিব'-এর প্রত্যাবর্তন তাদেরকে পরিপূর্ণ করেছে। এখন যদি তারা পাকিস্তানের সাথে এক থাকতে চায়—সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা সেটা শ্রদ্ধা করি। যদি তারা ভিন্ন কিছু পছন্দ করে আমরা অবশ্য সেটার প্রতি সম্মান করি এবং আমাদের সহযোগিতার হাত সেখানেও থাকবে।

অপরদিকে কোনো সন্দেহ নেই যে, মি. ভুট্টো একটি সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে তিনি যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন।

অমর হোন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ধন্যবাদ তোমার জাতিকে।'

(সম্পাদকীয়, দ্য আল্ আয়'আম, খার্তুম, সুদান, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২)

শেখের অনেক দায়িত্ব

'সদ্য স্বাধীন' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সত্যিই ভাগ্যবান। কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানের কারাগারে একজন শাস্তিযোগ্য দেশদ্রোহী। অথচ নয় মাসের এ কারাভোগ থেকে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করে বাংলাদেশের পথে হঠাৎ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হলেন।

অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এ নিঃশর্ত মুক্তি যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সব সমস্যা সমাধান করে দেবে তা নয়, তারা আরো অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন। গত ৪৮ ঘণ্টার ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব খণ্ডের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর আবেদন সম্পূর্ণরূপে নাচক করে দিয়েছেন। তিনি তখন জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সাথে পূর্বের সম্পর্কে ফিরে যাওয়া তার দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। মি. এডওয়ার্থ হিথের সাথে আলোচনা করেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একই কথা বলেছেন। এদিকে ভুট্টোর নিজের দলের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারেন। এমন কি পশ্চিমপাকিস্তানেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যথেষ্ট সমর্থক রয়েছে। তিনি মি. ভুট্টোর প্রতি পুনরায় সংসদ আহ্বানের আবেদন জানিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ক্ষমতার ভাগ দিতে বলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের ইতিহাস যে গতিতে চলেছে তাতে এ ধরনের চিন্তা বা পদক্ষেপ এখন পুরোপুরিভাবেই ব্যর্থ হবে।

বরং এ মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রয়োজন একজন শক্তিশালী নেতা, যিনি বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারেন। অবশ্য এটা একটি গুরুদায়িত্ব এবং এ জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। কারণ, ভিন্ন মতাবলম্বীরা দেশের ভেতর সহিংসতা বজায় রাখার চেষ্টা সবসময় চালিয়ে যাবে। তবে একথা সত্য যে, পশ্চিমপাকিস্তানের ঐ ফেডারেশনের আবেদন কোনো ক্রমেই আর পূর্বখণ্ডে গ্রহণযোগ্য হবে না।'

(সম্পাদকীয়, দি অ্যাডভোকেট ব্রুনাই, তাস্মেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দায়িত্ব গ্রহণ

'লাখো বাঙালির আবেগমথিত সংবর্ধনার ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকায় প্রবেশ করলেন। আর এর সাথেই তিনি প্রবেশ করলেন নতুন জাতিকে গড়ে তোলার এক বিশাল কর্মরাজ্যে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। শেখের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। এখন চোখের সামনে একমাত্র যুদ্ধ তাঁর স্বপ্নের জাতিকে বাস্তবে রূপ দেবার।

পৃথিবীর কোনো জাতির নেতাকে বস্তুত এমন দুর্গম পথ পেরিয়ে এবং এমনি নাটকীয়ভাবে ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করতে হয় নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের শৃঙ্খল ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু এ পথে গত ৯ মাস তাদের ওপর চলেছে এক রক্তক্ষয়ী ও বর্বর পাশবিক অত্যাচার। এক কোটির উপর সর্বস্ব হারানো লোক এখন এ নতুন রাষ্ট্রকে পুনর্বাসন করতে হবে। তার উপর অধিক জনসংখ্যা বহুল এ দেশটি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটি। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ লুণ্ঠিত, প্রশাসন বিধ্বস্ত, সর্বোপরি যুদ্ধের ভয়াবহতায় জনগণ হতাশ।

এ মুহূর্তে এ নতুন জাতিকে একতাবদ্ধ করে গড়ে তোলার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই রয়েছে।'

(সম্পাদকীয়, দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান, পার্থ, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

'উত্তাল জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঢাকায় আবেগঘন সংবর্ধনা জানিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর জনগণ যে ধরনের সংবর্ধনা জানিয়েছে, উপমহাদেশে এ ধরনের সংবর্ধনা ইতোপূর্বে দেখা যায় নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জনগণের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস উপমহাদেশ থেকে যেদিন ব্রিটিশ চলে গিয়েছিলো সেদিনের ইতিহাসকে সব দিক থেকে ম্লান করে দিয়েছে। অবশ্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর নেতাকে যতো দূর ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার চেয়ে অনেক বেশি পথ অতিক্রম করে এলেন। বাংলাদেশে পশ্চিমাদের অবহেলার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সব সময়ের জন্যে পশ্চিমপাকিস্তানি সরকার এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে খুব সামান্যই করেছে এবং এ শোষণের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্যে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমপাকিস্তানিরা তাদের রক্তাক্ত অপারেশন শুরু করেছিলো।

এখন স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এ মুহূর্তে তাদের সমস্যা—কীভাবে তারা পরিচালিত হবে। অবশ্য এটা পুরোপুরি নির্ভর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর, তিনি কীভাবে তাঁর জাতিকে পরিচালিত করবেন। কীভাবে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের দমন করবেন এবং কী ধরনের আইন ও প্রশাসন তিনি গড়ে তুলবেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর দেশে বর্ণনাতীত জনপ্রিয়। তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিনও প্রমাণিত হলো যে, জনপ্রিয়তায় এখনো ভাঁটা পড়ে নি। তবে বাস্তব পরীক্ষা শুরুর সময় এখন। বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের গতি ধীরই হয়ে থাকে—এ সময়েই তাঁর জনপ্রিয়তা বাস্তবের মুখোমুখি হবে।

এ নতুন সদ্যোজাত স্বাধীন দেশটির পুনর্গঠনের জন্যে এ মুহূর্তে প্রয়োজন কার্যকরী বিদেশি সাহায্য। অবশ্য এ লক্ষ্যে প্রয়োজন সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্রিটেনের স্বীকৃতি আদায়ের পথ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। আশা করা যায় অস্ট্রেলিয়া শীঘ্র অনুরূপ সিদ্ধান্তে যাবে।



চিত্র : ৮। ৩২ নম্বারের বঙ্গবন্ধুর এ বাড়িই ছিলো রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র।

অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারকে ইতোমধ্যে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁর দেশ ও জনগণ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটা প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়া স্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবে। বৃহৎ শক্তি কোন্ দিকে যায় এটা অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাপার নয়।'

(সম্পাদকীয়, দ্য মারকুরি, হাবার্ট, তাস্মানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ

মুজিব মুক্তি পেয়েছে

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ খুব সকালে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লন্ডনে পৌঁছেন। বিশেষ বিমান 'পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ৬৩৫'-এ তিনি লন্ডনে পৌঁছান। তিনি বিমানবন্দরের ভি.আই.পি. লাউঞ্জের ব্রিটিশ বিদেশ সম্পর্কীয় এবং কমন্ওয়েল্থ অফিসের তিন সিনিয়র মুখপত্রে'র সাথে দেখা করেন। মুখপাত্র জানান, শেখ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই বলবেন না। তাঁর বাংলাদেশ সমর্থকরা তাঁকে সদ্যোজাত দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এক বছর আগে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর পার্টির বিপুল বিজয়ের পর পূর্ব খণ্ডে সঙ্কট আরম্ভ হয়েছিলো এবং সেই ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে এ নতুন দেশটির জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গত মার্চ মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানের গণহত্যা শুরুর পূর্বাহ্নে গ্রেফতার হয়েছিলেন। অবশ্য বিমান লন্ডন বিমানবন্দরে অবতরণের পূর্বপর্যন্ত ঢাকা বা দিল্লি কেউ জানতো না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোথায়? শেখের রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগের এক ঘণ্টা পরে যে ধারণা দেওয়া হয় তাতে তাঁর গন্তব্যস্থলের কোনো উল্লেখ ছিলো না।

রেডিও পাকিস্তান জানায়, শেখ একটি বিশেষ বিমানে পশ্চিমপাকিস্তান সময় বেলা ৩ টায় (মালয়েশিয়ার সময় ৫.৩০ মি.) রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করেছেন। রেডিও পাকিস্তান আরো জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কোথায় যাচ্ছেন এ সম্পর্কে কিছুই জানানো হবে না। ঘোষক আরো জানান, শেখ তাঁর গন্তব্যে পৌঁছানোর পর নিজেই ঘোষণা দেবেন।

এদিকে রয়টার ঢাকাস্থ রেডক্রস মুখপাত্র ও বিদেশি সংবাদদাতাদেরকে টেলিফোন করেছিলেন, সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গন্তব্য সম্পর্কে সেখানে কোনো খবর পৌঁছায় নি। এমন কি কোনো গুজবও পূর্বপাকিস্তানে পৌঁছায় নি। রেডিও পাকিস্তান জানায় মি. ভুট্টো মুজিবকে রাওয়ালপিণ্ডিতে বিদায় সংবর্ধনা জানান। ইতোমধ্যে আজ (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমদ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে জানিয়ে দিয়েছেন, মি. ভুট্টো যদি তার পাকিস্তান রক্ষা করতে চান বা উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন তাহলে যেনো অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন।

মি. তাজউদ্দিন আহমদ আজ ঢাকায় আওয়ামীলীগের এক কর্মীসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করার জন্যে যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে যেতে প্রস্তুত। যদি ভুট্টো তার পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চান, তাহলে তিনি যে অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুকে ('বঙ্গবন্ধু' একটি আবেগমথিত নাম, এ নামে শেখ পরিচিত) তাঁর জনগণের মাঝে ফিরে আসার ব্যবস্থা করেন।

এছাড়া মি. তাজউদ্দিন আহমদ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার জন্যে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। তিনি অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যে তার দেশকে দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন এ জন্যে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যখন তার দেশের হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হচ্ছিলো, সে সময় যুক্তরাষ্ট্র বা চীন কেউই তাদের মিত্র পাকিস্তানকে বাঁধা দেয় নি এবং তারা আরো হত্যার রসদ জুগিয়েছে। তিনি জানান, সোভিয়েত ইউনিয়নের হুঁশিয়ারির কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশে প্রবেশ বন্ধ করে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট ভারত-বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী আরো দৃঢ় হবে।

৫১ বছর বয়স্ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নয় মাস আগে গোপনে পশ্চিমপাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো, দেশদ্রোহীতার অপরাধে তাঁর বিচার হবে। তিনি গত ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কালেও পশ্চিমপাকিস্তানের জেলখানাতে ছিলেন। যুদ্ধের শেষে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও

বাংলাদেশের জন্মের পর ভুট্টো ক্ষমতায় আসেন এবং এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জেলখানা থেকে গৃহে অন্তরীণ করা হয়। গত ২২শে ডিসেম্বর তাঁকে জেলখানা থেকে নিয়ে আসা হয়।'

(দ্য সানডে মেল, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২)

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ (৮ জানুয়ারি) বলেন, বাংলাদেশ একটি 'প্রশ্নাতীত বাস্তবতা'। তিনি পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি তাঁর দেশকে স্বীকৃতি দেবার আহ্বান জানান এবং জাতিসংঘের প্রতি তাঁর দেশকে সদস্যপদ দেবার অনুরোধ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেড. এ. ভুট্টো কর্তৃক মুক্তি দেবার পর আজ (৮ জানুয়ারি) খুব সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লন্ডনে পৌঁছান। এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, তাঁকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে গত নয় মাস কনডেম সেলে রাখা হয়েছিলো। কোনো রূপ অসুস্থতার চিহ্নহীন শরীরে, তেজস্বী গলায় ৫১ বছর বয়স্ক বঙ্গপিতা (বাঙালি জাতির জনক) বলেন, পাকিস্তানের সাথে কোনো রূপ সম্পর্ক থাকবে এ ধরনের কোনো কথাই তিনি মি. ভুট্টোকে বলেন নি। ক্লারিজ হোটেলের বলরুমে উল্লসিত বাঙালির ভিড় ও মুহূর্মুহু টেলিভিশন ক্যামেরার আলোর ঝিলিকের ভেতর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন করেন। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'কেন আপনি ঢাকা না যেয়ে লন্ডনে এলেন?'

উত্তরে শেখ জানান, 'আমি তাদের বন্দি ছিলাম, অতএব এটা পাকিস্তান সরকারের ব্যাপার, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।' শেখ জানান, তিনি কতোক্ষণ পর্যন্ত লন্ডনে অপেক্ষা করবেন এটা এখনো নির্ধারিত হয় নি। তবে তিনি লন্ডন ত্যাগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রি মি. এডওয়ার্ড হিথের সাথে দেখা করতে চান। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, আজ সন্ধ্যায় মি. হিথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দেখা করবেন। শেখ সাংবাদিকদের জানান, মি. ভুট্টো তাঁকে বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভেতর একটা যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করতে। তিনি জানান, আমি তাঁকে স্পষ্টই বলে দিয়েছি, আমি আমার জনগণের কাছে না গিয়ে এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি নে। সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রিয় নেতা, বা মুক্ত দেশের মুক্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরনে ছিলো কালো রঙের রোমান স্যুট। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শহীদদের স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ এ স্যুট তাঁকে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জানান, পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালিয়েছে, তা আজ হিটলার বেঁচে থাকলে লজ্জা পেতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরাসরি মি. ভুট্টোকে কোনোরূপ সমালোচনা করেন নি। তিনি শুধু বলেন, 'আমি তার সৌভাগ্য কামনা করি।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতি তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এ ছাড়াও তিনি পৃথিবীর মুক্তিকামী জনতা এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে তাঁর ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে গোটা পৃথিবীকে আহ্বান জানিয়ে বঙ্গপিতা (বাংলাদেশের

জাতির জনক) বলেন, 'আমি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আমার লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর অনুরোধ করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করা হয়, পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিলো কি না বা অমানুষিক ব্যবহার করা হয়েছিলো কি না?

তিনি জানান, তাঁকে মরু অঞ্চলের এক নির্জন জেলে রাখা হয়েছিলো। তাঁর কাছে কোনো দর্শনার্থীকে যেতে দেওয়া হতো না এবং সমগ্র পৃথিবীর সাথে তাঁকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জানান, তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের অধীনে নেওয়া হয়েছিলো এবং বিচারের মাঝপথেই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তখন তাঁর সমর্থনে একজন কৌসুলি নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, 'এটা ছিলো একজন বেসামরিকের জন্যে কোর্ট মার্শাল', 'তারা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চেয়েছিলো।' তিনি বলেন, ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হবার পর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আরো জানান, তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরেছিলেন নিষ্প্রদীপ মহড়া দেখে। তবে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ভুট্টোই প্রথম তাঁকে এ সংবাদ দেয়। শেখ বলেন, এ মুহূর্তে আমি একজন মুক্ত মানুষ। কিন্তু তখন আমি ছিলাম সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ। তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'প্রহসনমূলক বিচারের পর আমি মানসিকভাবে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।' তিনি বলেন, 'যেদিন আমি জেলে গিয়েছিলাম সেদিন থেকেই আমি জানতাম আমি নাও বাঁচতে পারি, তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।' শেখকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ওয়াশিংটন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো, এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর মনোভাব কী?' উত্তরে শেখ জানান, 'আমি বন্দি ছিলাম, আমি অনেক কিছুই জানি না, ঢাকায় যাওয়ার পর আমার জনগণের সাথে আমাকে আলোচনা করতে হবে।'

শেখের একজন প্রবীণ সঙ্গী জানান, তিনি পূর্বের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন। কিন্তু তার গলার স্বর পূর্বের মতোই আছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ জানান, তিনি যখন রাওয়ালপিণ্ডি বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তখনো তিনি জোরে 'জয়বাংলা' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। হোটেলের আশপাশে অবস্থানরত শেখের সমর্থকরা তখন প্রায় সম্মিলিত স্বরে এ জয়সূচক ধ্বনি দিতে থাকেন।

রয়টার জানায় : শেখ জানান, 'আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারছি নে, আমি এ মুহূর্তে আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' তিনি বললেন, তিনি আশা করছেন আগামিকাল অথবা পরশু তিনি ঢাকা ফিরবেন। আবেগমথিত গলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন, কোনো জাতিকেই এতো মূল্য দিতে হয় নি যেমনটি তাঁর জাতিকে দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে এতো জীবনদান ও এতো ত্যাগ স্বীকার কোথাও দেখা যায় নি। ২০ মিনিট সাংবাদিক সম্মেলন শেষে তিনি সাংবাদিকদের 'জয়বাংলা' জানিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশ মিশন মুখপত্র জানায়, ঢাকা [illegible] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কমপক্ষে দশ লাখ লোক বিমানবন্দরে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবে। বাংলাদেশ মুখপত্র আরো জানান, গত নয় মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৪২ পাউন্ড (১৯ কে.জি.) ওজন কমে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংকিং জাতীয়করণ নীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, এগুলো আওয়ামীলীগের মেনিফেস্টোতে আছে। যে মেনিফেস্টো অনুযায়ী ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে নিরঙ্কুশ রায় দিয়েছিলো। তিনি বলেন যে, তাঁর সহকর্মীদের প্রতি তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস আছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, আমি আমার স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র বিসর্জন না দিয়ে সবার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান জঘন্য কাজ করেছে, এ গণহত্যার জন্যে তাদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু এখন আমার জনগণ স্বাধীন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি মি. ভুট্টোর সৌভাগ্য কামনা করি।'

(রয়টার পরিবেশনা, ডেট লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ৮ জানুয়ারি ১৯৭২)

শেখের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো 'জয়বাংলা'

'বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে নাটকীয়ভাবে আজ (৮ জানুয়ারি) লন্ডন বিমানবন্দরে নামেন। ক্লারিস হোটেলের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, 'আজ আমি প্রাণভরে আমার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আনন্দ উপভোগ করতে পারছি।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গতরাতে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়েছে। গত বছরের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে তিনি সেখানে বন্দি ছিলেন।

পশ্চিমপাকিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান। তাঁর বিদায়কালে সমস্ত বিমানবন্দর নিরাপত্তারক্ষী দ্বারা ঘেরা ছিলো এবং পরবর্তীতে মি. ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, 'পাখি উড়ে গেলো।' লন্ডনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি আশা করছেন আগামি দিন অথবা পরশু দিন তিনি ঢাকা পৌঁছাবেন।

আবেগমথিত স্বরে তিনি বলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত আমার জনগণকে ছেড়ে থাকতে পারছি না, আমি তাদের ভেতর যেতে চাই।' তিনি আরো বলেন, 'কোনো জাতিকেই এতো মূল্য দিতে হয় নি যেমনটি দিতে হলো আমার বাংলাদেশের জনগণকে। এতো জীবন, এতো ত্যাগ কোনো জাতিকেই করতে হয় নি।' তিনি বলেন, 'যেভাবে লাখ লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে, তাতে আজ যদি হিটলার বেঁচে থাকতেন তিনিও লজ্জা পেতেন।' তিনি স্বীকার করেন, বন্দিদশায় তার প্রতি কোনো রূপ শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় নি। তবে তাঁকে নির্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় অমানবিকভাবে রাখা হয়েছিলো।

এক আবেগঘন পরিবেশে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সমর্থকরা তাঁর চারপাশ ঘিরে 'জয়বাংলা' শ্লোগানে উচ্চকণ্ঠ ছিলো। এক পর্যায়ে হোটেলের পাশেই কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রায় ১২-১৩ জনের মতো বাংলাদেশের সমর্থক একজন মধ্যবয়সী লোককে মেঝেতে ভূপতিত করে ফেলে। সমর্থকরা জানান, ঐ ব্যক্তি পশ্চিমপাকিস্তানি এজেন্ট, তাকে হত্যা করা উচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে সমস্ত দেশ তাঁর স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং সমস্ত দেশের প্রতি তাঁর দেশকে স্বীকৃতি দেবার ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান। তিনি জাতিসংঘের প্রতি তাঁর দেশের সদস্যপদ প্রদানের জন্যে অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ সরকারি মুখপাত্র জানান, ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মি. এড্ওয়ার্ড হিথের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।'

(দ্য সানডে টাইম্স অব্ জাম্বিয়া, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রির সাক্ষাৎ

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং মি. এড্ওয়ার্ড হিথের মধ্যে গত রাতে (৮ জানুয়ারি) ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে এক ঘণ্টার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের জন্যে কিছু প্রোটকল মেনে চলার প্রশ্ন আছে। যেমন বাংলাদেশের নতুন সরকারকে দেখাতে সমর্থ হতে হবে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের সমর্থন এ সরকারের প্রতি রয়েছে।

মি. এডওয়ার্ড হিথ বলেন, অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেনো এ জন্যে কিছু মনে না করেন—কারণ বাংলাদেশের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে। খুবই উষ্ণ আন্তরিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেখ তাঁর জীবন রক্ষায় এবং তাঁর দেশের স্বাধীনতার সাহায্য করার জন্যে মি. হিথ্কে অভিনন্দন জানান। মি. উইল্স্ন ক্লারিজ্ হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে ৩০ মিনিট সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। কমন্ওয়েল্থ সেক্রেটারি মি. আর্নল্ড স্মিথ্ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে ক্লারিজ্ হোটেলে দেখা করেন।'

(দ্য সানডে টাইমস, লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২)

দিল্লির পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পূর্বপাকিস্তানের নেতা) ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের কমেট জেটে আজ (৯ জানুয়ারি) সূর্যোদয়ের পর পরই ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করলেন। ৫১ বছর বয়স্ক বাঙালি নেতা প্রায় ১০ মাস পাকিস্তান কারাগারে বন্দি থাকার পর ২৪ ঘণ্টা পূর্বে পাকিস্তান এয়ার্ওয়েজের একটি বিশেষ বিমানে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লন্ডন এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষিত) ক্লারিজ হোটেলের প্রধান ফটকে অবস্থানরত সাংবাদিকদের এড়ানোর জন্যে খুব ভোরে হোটেলের পার্শ্ববর্তী গেট দিয়ে দ্রুত লন্ডন এয়ারপোর্টে চলে যান।

ঢাকাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিজয়ী সেনাপতির সংবর্ধনা দেবার পূর্বে জাম্বিয়ান সময় ১০.৫০-এ তাকে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দেওয়া হবে। লন্ডন সংবাদ সূত্র জানায়, স্বাধীন বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি মি. এড্ওয়ার্ড হিথের প্রতি তাঁর দেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে অনুরোধ জানান। এ ছাড়াও তিনি তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কে মি. হিথ্কে অভিহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র গতরাতে জানায়, পাকিস্তানের একজন জেলারের বদান্যতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। মুখপাত্রটি আরো জানান, জেলারটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দুই দিন নিজের গৃহে লুকিয়ে রাখেন। প্রায় ১০ মাস অন্তরীণ থাকার পর বিজয়ী সৈনিক বেশে এ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তাঁকে বিজয়ী সংবর্ধনার জন্য তাঁর দেশে একদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।'

(দ্য জাম্বিয়া ডেইলি মেইল, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২)

দিল্লিতে স্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ (১০ জানুয়ারি) রাজধানীতে (নয়া দিল্লি) পৌঁছালে তাঁকে এক আনন্দঘন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন তাঁর বহনকারী রয়েল এয়ারফোর্স-এর এয়ার ক্রাফট থেকে নামছিলেন, তখন তাঁকে কিছুটা পথশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিলো। সবাই উচ্চৈঃস্বরে *'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দীর্ঘজীবী হোক'* ধ্বনি দিয়ে তাঁকে আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছিলো।

রয়েল এয়ারফোর্স কমেটটি যখন ধীরে ধীরে প্রভাতী সূর্যের আলোয় বিমানবন্দরের টেকনিক্যাল এরিয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো তখন মুহূর্তে বিমাবন্দরটি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় এক পিনপতন নিস্তব্ধ রাজ্যে পরিণত হয়। এয়ার কমেটটি গতি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায় চার মিনিট সময় নেয়। এ চার মিনিট যেনো একটি যুগ। এমন কি রাজকীয় সামিয়ানাও যেনো এ দীর্ঘ চার মিনিটের প্রতীক্ষা সহ্য করতে পারছিলো না। সবাই তখন উত্তেজনার শিখরে, সমস্ত স্নায়ু যেনো একটি আকাঙ্ক্ষায় কেন্দ্রীভূত কখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতের মাটিতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপটি রাখবেন।

এ সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রি আবদুস সামাদ আজাদ বিমানের ভেতর গেলেন এবং কয়েক মিনিট ভেতরে কাটালেন। অতঃপর সেই মহালগ্ন এলো। শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ডার্ক গ্রে স্যুট ও কালো ওভারকোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এয়ার ক্রাফট থেকে বাইরে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ রাখলেন। তিনি যখন হাত নেড়ে নেড়ে অভ্যর্থনার জবাব দিচ্ছিলেন, সে সময় ভোরের নরম হাওয়া তাঁর চুলগুলোকে মৃদু এলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরি তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনাবদ্ধ করার সাথে সাথে রাজকীয় সর্বোচ্চ সম্মানের তোপধ্বনি ২১ বার দিক-বিদিক প্রকম্পিত করে উঠলো। প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উষ্ণ অভ্যর্থনায় শেখকে গ্রহণ করলেন। আলোকচিত্রীদের মূহূর্মুহু ক্যামেরা ফ্ল্যাশের ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রি ও বিভিন্ন ভি.আই.পি.-দের সাথে কুশল বিনিময় করলেন।

প্রারম্ভিক সৌজন্য বিনিময় শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তিন বাহিনী আয়োজিত গার্ড অব্ অনার দেওয়া হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণ মন অধিনায়ক' সামরিক বাহিনীর ব্যান্ডে বাজানো হয়।

ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনসভায় ভাষণ দেন, সেখানে গেলে একনজর ভালোভাবে দেখার জন্য জনগণ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাঁকে একটি ছয় দরজার মার্সিডিজ বেঞ্জে করে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে যাবার সময় জনতা তাঁকে একনজর দেখার জন্য বা একটু হাত মেলাবার জন্য তাঁর গাড়ি আটকে ফেলে। ভোররাত থেকে দিল্লি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রাণোচ্ছল সংবর্ধনা জানানোর প্রস্তুতি নেয়। প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর অন্তর 'বাংলাদেশের স্রষ্টা দীর্ঘজীবী হোক', 'বাংলাদেশের মহান রাষ্ট্রপতি দীর্ঘজীবী হোক' শোভিত ব্যানার ও তোরণ শোভা পাচ্ছিলো। তোরণগুলোতে বিভিন্ন ফুল ও লতার ছবির সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি শোভা পাচ্ছিলো।

প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত দীর্ঘ সারিবদ্ধ জনতার ভেতর দিয়ে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বহনকারী মোটর শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় তখন জনতা বাংলাদেশের নেতার দীর্ঘ জীবন কামনাসূচক ধ্বনি দিতে থাকে।'

(দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, নয়া দিল্লি, ভারত, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন

'সদ্যো' স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর জাতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি তাদের স্বাধীনতা দেবেন; তিনি সে প্রতিজ্ঞা রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, ভারত প্রতিজ্ঞা করেছিলো বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরবেন এবং শরণার্থীরা অনতিবিলম্বেই তাদের নিজ গৃহে ফিরে যাবে— ভারতও তাদের সে প্রতিজ্ঞা রেখেছে।'

তিনি বলেন, 'এখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমি বিশ্বাস করি তাঁর নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বাংলাদেশে সমুন্নত থাকবে। তিনি বলেন, মুজিবুর রহমান যখন জেলে ছিলেন তখন বাংলাদেশের যুবকরা তাঁরই অনুপ্রেরণায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং একমাত্র তিনিই অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন বলে বাংলাদেশের জনগণ এমনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর দেশ, তাঁর জনগণ ও তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আজকের দিনটি একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, শেখের সামনে এখন এক মহাযজ্ঞ অপেক্ষা করছে। বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে।' শ্রীমতি গান্ধী খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কারণ বিশাল জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলো এ জন্যে তিনি বেশি সময় নেন নি।'

(দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, নয়া দিল্লি, ভারত, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

নয়া দিল্লির জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ

বজ্রগম্ভীর অথচ আবেগমথিত গলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, *'বাংলাদেশ কখনোই আপনাদের প্রধানমন্ত্রি, আপনাদের সরকার, আপনাদের সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণকে ভুলবে না। তারা অবশ্যই আপনাদের সব রকম ত্যাগ ও সহযোগিতার কথা মনে রাখবে।'*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরনে ছিলো একটি গ্রে স্যুট ও গায়ে বাদামি ওভারকোট। বিমানবন্দরের অভ্যর্থনা শেষে প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে এ প্যারেড গ্রাউন্ডে আসেন। বঙ্গবন্ধু বাংলায় বলেন, পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে বন্যপশুর মতো যে বর্বরতা চালিয়েছে এর নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তিনি বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ধর্মনিরপেক্ষতায়, গণতন্ত্রে, মানুষের স্বাধীনতা ও বিশ্ব শান্তিতে। একপর্যায়ে আবেগআপ্লুত বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি কখনোই ভাবতে পারেন নি তিনি তাঁর 'সোনার বাংলা'য় ফিরে যেতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানিরা তাঁর ১০ লাখ লোক মেরেছে, ভারত তাঁর এক কোটি গৃহচ্যুত মানুষকে সেবা করেছে। তাঁর ভাষণে শুরু ছিলো, *শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ...।*

যখন তিনি এ বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন মাঝে মাঝে জনতা *'বঙ্গবন্ধু'* শ্লোগান দিচ্ছিলো। তিনি বলেন যে, তিনি মুক্ত জনগণের কাছে ফিরে যাচ্ছেন বটে তবে তাঁর জনগণের চোখ আজ জলে ভরা। তিনি তাঁর বিপুলসংখ্যক বন্ধু ও সহকর্মী হারিয়েছেন। তা ছাড়া পাকিস্তানিরা তাদের প্রায় সকলেরই বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে—তাদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। তিনি দুই দেশের বন্ধুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, দুটি দেশ একই আদর্শে বিশ্বাস করে এবং তাঁর দেশ সোনার বাংলার উন্নতি এ দুই দেশের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করছে। তিনি আরো বলেন, *'আজ থেকে দু দিন আগেও আমি জানতাম না যে, আমি মুক্তি পাবো, আমি আমার মানুষের কাছে যেতে পারবো। কিন্তু আজ আমার আশা পরিপূর্ণ হয়েছে।'*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সামনে এখন বিরাট কাজ। তিনি আবারও বলেন, তিনি বা তাঁর জাতি কখনোই তাদের স্বাধীনতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দানকে ভুলবে না। তবে তাঁর জাতিকে স্বাধীনতার জন্যে যতো রক্তমূল্য দিতে হয়েছে পৃথিবীর কোনো জাতিকে এমনটি দিতে হয় নি।

তিনি তাঁর ভাষণ শেষে বলেন 'জয় হিন্দ'। শ্রীমতি গান্ধী তখন তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোনের সামনে এসে যোগ করেন, *'পবিত্র 'জয়বাংলা'।*

(ই.এন.আই, নয়া দিল্লি, ভারত, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২)

ভারতের সাথে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি

'নয়া দিল্লি, ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, তাঁর দেশ ও ভারতের ভেতর চিরস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যেমনটি ভাইয়ে ভাইয়ে হয়ে থাকে। ৯ মাস পাকিস্তান কারাগারে বন্দি থাকার পর বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর জনগণের মাঝে ফিরে যাবার পথে কয়েক ঘণ্টা দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। এ

যাত্রাবিরতিকালে তিনি বলেন, 'ভারতের জনগণ আমাদের দুঃসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো, এ সহযোগিতা আমরা কখনোই ভুলবো না।'
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এই প্রথম সাক্ষাত হয়। শ্রীমতি গান্ধী তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান এবং খুবই হাসিখুশি অবস্থায় তিনি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মোটর শোভাযাত্রার ভেতর দিয়ে বিমানবন্দর থেকে জনসভায় যান, সেখান থেকে আবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আসেন। সর্বশেষ তিনি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিমানবন্দরে ফিরে আসেন দেশে ফেরার জন্য।

হাজার হাজার ভক্ত

তীব্র শীতে ৮ মাইল মোটর শোভযাত্রার দুই ধার দিয়ে হাজার হাজার ভক্তরা দাঁড়িয়েছিলো এবং একটি বিমান খুব ধীরগতিতে উপর থেকে গোলাপ পাপড়ির বর্ষণ করে চলেছিলো। দু দিন আগে পাকিস্তান সরকার তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আজ ভোর ৮টায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে আজ ভোর ৮টায় ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্স-এর একটি কমেট তাঁকে দিল্লি পালাম বিমানবন্দরে নিয়ে আসে। তিনি পৌঁছানোর সাথে সাথে 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে তাঁকে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডানহাত নেড়ে সে অভ্যর্থনার জবাব দেন। অদূরেই আর্টিলারি কামান ২১ বার গর্জন করে তাঁকে স্বাগত জানায়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরনে ছিলো কালো ওভারকোট ও কালো স্যুট। মিসেস গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি মেরিগোল্ডসের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করেন। অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের সদস্যবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সঙ্গীত বাজানো

বাঙালি নেতা যখন একটি ছোট প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন গুর্খা ব্যান্ডে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। দুই দেশেরই জাতীয় সঙ্গীত বিখ্যাত বাঙালি কবি নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই লেখা।
১৫০ জন সৈন্যের এক গার্ড অব অনার শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি ভারতীয় জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের মহৎ প্রধানমন্ত্রির জন্য এ সফর সম্ভব হয়েছে'। তিনি বলেন, এ ফিরে আসা অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আসা, বন্দিদশা থেকে মুক্তির আনন্দে ফিরে আসা, হতাশা থেকে আশার মাঝে পা বাড়ানো।
তিনি বলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। আমি ফিরে যাচ্ছি লাখো বিজয়ী হাসির মাঝে। আমি ফিরে যাচ্ছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। তাঁর ছয় ফুট দীর্ঘ শরীর কিছুটা রোগা হয়ে গেছে। একজন মুখপাত্র আরো জানান, তাঁর চল্লিশ পাউন্ড ওজন কমে গেছে। কিন্তু তাঁর আবেগ জড়ানো স্বরের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

অনেক কূটনীতিকের উপস্থিতি

প্রায় বিশটি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তার ভেতর প্রায় অধিকাংশই ছিলেন রাষ্ট্রদূত স্বয়ং। সোভিয়েত ব্লক খুবই জাঁকজমকপূর্ণভাবে উপস্থিত ছিলো। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, পশ্চিম জার্মানি, নরওয়ে ও ডেনমার্কের প্রতিনিধিগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ দেশগুলো খুব শীঘ্রই বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। যুক্তরাষ্ট্র গত ৯ মাসের ঘটনায় এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে। তাতে করে বোঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনাথ বি কেটিংকে বিমানবন্দরে উপস্থিত না থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ ছিলো। বিমানবন্দরের অভ্যর্থনা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি যেই মাত্র 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেল্‌ম্যান' শব্দ দুটি ইংরেজিতে উচ্চারণ করেন তখনই সম্মিলিত জনতা চিৎকার করে তাঁকে বাংলায় বলার জন্য অনুরোধ করে। তখন স্মিত হেসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর মাতৃভাষায় বক্তব্য প্রদান শুরু করেন।

তিনি উপস্থিত জনগণকে 'আমার ভাই ও বোনেরা' বলে সম্বোধন করে পুনরায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর দেশের স্বাধীনতা ও তাঁর মুক্তির জন্য ভারতের সাহায্যকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, তাঁর দেশ এবং ভারত একই আদর্শের দেশ অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।'

(দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

উল্লাসিত ঢাকা : লাখ লাখ লোক মহান মুজিবকে স্বাগত জানায়

'রয়েল্ এয়ার্‌ফোর্স জেটটি মাটি ছোঁয়া মাত্রই বিশাল জনতা এগিয়ে আসে এবং প্রায় বিমানটির দোড়গোড়ায় পৌঁছে যায়। খুব কষ্টে এ জনতাকে ঠেকিয়ে রেখে তাঁকে তিন বাহিনী গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে এবং তাঁর সাথে কূটনীতিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে বিশাল জনতার সামনে উচ্চ মঞ্চে শেখকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো। উল্লেখ্য, এ-সেই বিমানবন্দর, ১০ মাস পূর্বে যেখানে তাঁকে গভীর রাতে বন্দি হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিলো আর আজ সেখানে তাঁর বিমান নামলো সূর্যালোকে এবং তাঁকে বরণ করা হলো বিজয়ী বীরের সংবর্ধনায়। তোপগুলো তাঁর সামনে গর্জন করে উঠলো ৩১ বার।

তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রথম এগিয়ে আসেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এরপর প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য কেবিনেট মন্ত্রিরা। অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কেবল ইরান এবং চীনের কোনো প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিলর জেনারেল উপস্থিত ছিলেন।

জনতার স্রোতের ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মোটর শোভাযাত্রা বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পুরো দু ঘণ্টা সময় নেয়। রমনা রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভুট্টোর কনফেডারেশন স্বপ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং এর একটি মানুষ বেঁচে থাকতেও এ স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। প্রিয় নেতাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেবার জন্য সমস্ত ঢাকা শহরের মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলো রমনা রেসকোর্স থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের এ চার মাইলের ভেতর। এছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলা ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা থেকেও হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলো। খুব সকাল থেকেই ঢাকাকে মনে হচ্ছিলো একটি উৎসবের নগরী। অসংখ্য মিছিল রেসকোর্স ও তেজগাঁও বিমানবন্দরের ভেতর ছোটাছুটি করছিলো। সমস্ত রাস্তা ছিলো মানুষে পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে ছিলো 'জয়বাংলা' শ্লোগান। অধিকাংশের হাতে ছিলো বাংলাদেশের পতাকা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি। বিমানবন্দর ছিলো মুক্তিবাহিনীর কড়া নিয়ন্ত্রণে। মুক্তিবাহিনীরা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মোটর শোভাযাত্রার পথ তৈরি করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গতিপথের দু ধারের সমস্ত ব্যালকনি ও ছাদ ছিলো মানুষে পরিপূর্ণ। তাদেরও মুখে ছিলো উল্লসিত শ্লোগান। জনতার শ্লোগান ছিলো 'জাতির পিতা—দীর্ঘজীবী হোক' 'মুজিব ভাই—দীর্ঘজীবী হোক।' কিন্তু কিছু কিছু মিছিল শ্লোগান দিচ্ছিলো, 'সপ্তম নৌবহর জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও;' 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ—ধ্বংস হোক নিপাত যাক' এবং 'বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী, দীর্ঘজীবী হোক'।

৫২ বছর বয়স্ক বাঙালি নেতা জনসভায় পাকিস্তানিদের গণহত্যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বার বার চোখের পানি সামলাচ্ছিলেন। বিশাল জনতাকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, *'লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, পশ্চিমপাকিস্তানের সাথে কোনো রূপ কনফেডারেশন রাখা সম্ভব কিনা, আমি বলেছিলাম আমি আমার জনগণের সাথে আলাপ না করে কিছুই বলতে পারি নে। ভুট্টো সাহেব আপনার উদ্দেশ্যে আমি এখন বলতে চাই—আপনার (পশ্চিমপাকিস্তান) সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'*

তিনি বলেন, *'স্বাধীন বাংলাদেশ ছিলো তাঁর আজন্ম সাধনা—আজ সে সাধনা পূর্ণ হয়েছে। কবিগুরুর কথা আজ মিথ্যে হয়েছে, আজ বাঙালি মানুষ হয়েছে—আজ আমার কোনো দুঃখ নেই।'* তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে তাঁর গৃহহীন, দুঃখী মানুষের জন্য ও বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

রমনা রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১০০ ফুট লম্বা নৌকাকৃতির মঞ্চ থেকে ভাষণ দেন। উল্লেখ্য, নৌকা আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রতীক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মঞ্চে আরোহণের সাথে সাথে সমস্ত জনসভা শ্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। কেউ কেউ নেতার প্রতি পুষ্প বর্ষণ করতে থাকে। কেউ বা নেতার মুক্তির আনন্দে আকাশে পায়রা ওড়াতে থাকে।

সর্বত্রই হাসিখুশি মুখ। কারো মনে কোনো দুঃখের চিহ্ন নেই। আজ তাদের দেখলে বোঝাই যায় না তারা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্যোগময় ৯ মাসের গণহত্যার পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। বরং আজ তারা তাদের নেতাকে ফিরে পেয়ে যেনো সুন্দর ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চিত। মুহূর্মুহ করতালির ভেতর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৩৫ মিনিট ভাষণ দেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। ধন্যবাদ জানান সোভিয়েত ইউনিয়নকে। তিনি আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের জনগণ যারা তাঁর মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন করেছিলেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর এক কোটি গৃহহীন মানুষকে খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে প্রতিপালন করার জন্য ভারতকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্মীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি আমরা আমাদের জনগণের মৌলিক অন্ন, বস্ত্র ও কাজের সংস্থান করতে না পারি তাহলে আমাদের এ কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রশংসা করে বলেন, তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে আমাদের দ্রুত মুক্তিতে সাহায্য করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তার প্রহসনমূলক বিচারে কিছু বাঙালিকে সাক্ষী দেবার জন্যে নেওয়া হয়েছিলো—তিনি বিশ্বাস করেন, তাদেরকে জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছিলো।'

বক্তব্য শেষে শেখ জনসভায় উপস্থিতদেরকে শহীদদের স্মরণে প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান এবং তাঁর সাথে সাথে শ্লোগান ধরতে বলেন 'জয়বাংলা ও ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই' উপস্থিত জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেন।

(দ্য স্টেটসম্যান, নয়া দিল্লি, ভারত, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু নিজ দেশে : পাঁচ লাখ লোকের উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা

'ঢাকা, পাকিস্তান, ১০ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আজ প্রায় ৫ লাখ বাঙালি এক উচ্ছ্বসিত বিজয় সংবর্ধনা জানায়। নয় মাস গ্রেফতার থাকার পর আজ তিনি তাঁর নিজ দেশে ফিরলেন। তাঁকে বহনকারী ব্রিটিশ রয়েল ফোর্স-এর কমেট জেটটি বিমানবন্দরে অবতরণের সাথে সাথেই উত্তেজিত জনতা 'জয়বাংলা' শ্লোগানে সমস্ত এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপর পুষ্প বর্ষণ করে।

সংবর্ধনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হলেও তাঁকে গর্বিত মনে হচ্ছিলো। রমনা রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় তিনি বলেন, 'আমার আজন্ম সাধনা আজ সফল, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কথা বলার সময় তাঁর গলা আবেগে ভেঙে আসছিলো। পশ্চিমপাকিস্তান থেকে ফেরার সময় তাঁর প্রতি যে ফেডারেশনের আহ্বান ছিলো, তাঁর প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, পশ্চিমপকিস্তানের সাথে সব সম্পর্ক শেষ হয়েছে।'

কূটনৈতিক অভিবাদন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করার পর তিন বাহিনী তাকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করেন। এ তিন বাহিনী বাংলাদেশেরই সৈন্য বাহিনী বস্তুত বাংলাদেশের জন্ম গতমাসে তাঁর সমর্থকরা পূর্বপাকিস্তানকে জয় করার পর করেছে।

অবশ্য ভারতীয় সৈন্যরা বিজয়ে তাঁর সমর্থকদেরকে সাহায্য করেছে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিমানবন্দরে অনেক কূটনীতিকরা সংবর্ধনা জানায়, যদিও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কেবল ভারত ও ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমেরিকান কাউন্সিলর জেনারেল হার্বাল ডি. স্পিভ্যক সহাস্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে করমর্দন করে বলেন, আপনার ঢাকা প্রত্যাবর্তন স্বাগতম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহাস্যে তাকে ধন্যবাদ জানান। মি. স্পিভ্যক বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এটা কোনো রাজনৈতিক যোগদান নয়। কারণ, বাংলাদেশ ও আমেরিকার ভেতর সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ধারণা করা হয় তিনি এতোই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন, তার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। গত শনিবারে মুক্তি পাবার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগারে দেশদ্রোহীতার অপরাধে বন্দি ছিলেন। বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবাইকে ক্ষমা করতে বলেন, তিনি আর যাতে নতুন করে কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী আমরা প্রত্যেকে বাঙালি। আমরা একসাথে বাস করবো। আমরা একসাথে যাবো, একসাথে হাসবো কাঁদবো এটাই আমাদেরকে সুখী করবে। আর এ উক্তি সম্ভবত ২০ লাখ বিহারিকে উদ্দেশ্য করেই। কারণ এ বিহারিরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ নিয়েছিলো। বাংলাদেশের সরকারি মুখপাত্রের বরাত অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ লাখ লোক রমনা রেসকোর্সে উপস্থিত হয়েছিলো এবং এক লাখ লোক বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স পর্যন্ত আধ মাইল রাস্তা জুড়ে সারিবদ্ধভাবে ছিলো। কিন্তু জনতার সংখ্যা মূলত শেখের ইতোপূর্বের বহু জনসভার তুলনায় কম ছিলো।

অনেকে এখন গ্রামে

অনেক বাঙালির মতে, জনতার বিরাট অংশ পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে। তাছাড়া পাকিস্তানিদের ভয়ে যারা গ্রামে পালিয়ে গিয়েছে তারা অনেকে এখন ফিরতে পারে নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন বিমানবন্দর থেকে ধীরে ধীরে জনতার ভেতর দিয়ে এগুচ্ছিলেন তখন জনতা তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করছিলো এবং তালে তালে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলে।

হাজার হাজার জনতা শ্লোগান দেয়—

'বিশ্বে এলো এক নতুন দেশ– বাংলাদেশ।'

'বিশ্বে এলো নতুন বাদ– মুজিববাদ মুজিববাদ।'

অনেকে তাঁকে স্পর্শ করার জন্যে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙে কাছে আসার চেষ্টা করে। বস্তুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি প্রত্যেকেরই প্রিয়। কারণ তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গত ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ১৬৯টি আসনের ভেতর ১৬৭টি আসন পায়।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন, তখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মো. ইয়াহিয়া খান প্রথমে সংসদ অধিবেশন বাতিল করেন এবং

পরে ২৫ তারিখে বাঙালির আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার জন্য সৈন্য বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে এবং এক কোটির মতো লোক পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুখের কথাই আইন

আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এমনই যে অধিকাংশ বাঙালির কাছে তাঁর মুখের কথাই আইন। বাস্তবে তাঁর এক ভগ্নাংশ সমান জনপ্রিয়তা তাঁর দলের বা মন্ত্রিসভার ভেতর কারো নেই। এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এতোদিন মন্ত্রিসভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভর করছিলো।

এ সকল সিদ্ধান্তের ভেতর রয়েছে এক লাখ সশস্ত্র গেরিলা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাদের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়। দ্বিতীয়ত প্রায় ২০ লাখের মতো বিহারীর নিরাপত্তা। অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ তাঁর দেশকে স্বীকৃতি প্রদান করুক এবং তাঁর বিশ্বস্ত অর্থনীতি পুর্নগঠনে সাহায্য করুক, এটাই প্রত্যাশা করছেন। সরকারি ধারণা এ মুহূর্তে তাদের ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য প্রয়োজন; যা এ দেশটির মোট উৎপাদনের ৪ ভাগের ৩ ভাগ।'

(দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

মুজিব পাকিস্তানের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন

'গতকাল (১০ জানুয়ারি) ঢাকা রমনা রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ বাঙালির সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং চিরদিন স্বাধীন থাকবে।' গত সপ্তাহের শেষ দিনে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও নয়া দিল্লি হয়ে ঢাকা পৌছান। ঢাকায় আজ জনতা তাঁকে এক বিজয়ী বীরের সংবর্ধনা দেয়। তিনি বিমানবন্দর থেকে সোজা রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় পৌছান।

অত্যন্ত ক্লান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ৪০ মিনিটের বক্তৃতার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'পৃথিবীর কোনো জাতিকেই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য এতো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি।' তিনি বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের ভেতরকার সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, সমস্ত দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং বাংলাদেশ অবশ্যই জাতিসংঘের সদস্যপদ পাবে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলাদেশের মূল ভিত্তি হবে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তানের মুসলিম রাষ্ট্রের সমস্ত আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলো।'

চোখে রুমাল চেপে ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছো, আমার মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছো এবং এক কোটি লোককে গৃহত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলে, তবুও তোমাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই, আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমিও স্বাধীন থাকি।'

তিনি তাঁর ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করার অপরাধে হত্যাকারীদের বিচারের দাবি করেন। তিনি আশা করেন, অবশ্যই এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে তদন্ত হবে। তিনি বলেন, 'বাঙালিরা যারা দালালি, বেঈমানি করেছে এমনকি যারা তাঁর প্রহসনমূলক বিচারে সরকারি পক্ষ নিয়েছিলো তাদের সবার বিচার হবে। তবে আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নেবেন না।' তিনি তাঁর জনগণকে কঠোর পরিশ্রমী হবার জন্য বলেন এবং সরকারি কর্মচারীদের হুঁশিয়ার করে দেন—যেনো তারা কেউ ঘুষ গ্রহণ না করেন। তিনি কখনোই এ অপরাধ ক্ষমা করবেন না বলে জানিয়ে দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গভীরভাবে ধন্যবাদ জানান। মাতৃভূমির মাটি স্পর্শ করে আবেগআপ্লুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জানান, আমি আমার মনকে স্থির করে ফেলেছিলাম, আর কখনোই আমার সোনার বাংলায় ফিরে যাওয়া হবে না। তারা আমার কবরও খুঁড়েছিলো। আজ আমি এখানে, এটা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে।

উপস্থিত কূটনীতিকদের ভেতর চীনের কোনো প্রতিনিধি ছিলো না। উল্লেখ্য, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মি. স্পিভ্যাক উপস্থিত ছিলেন। মি. জন স্টোন হাউস এম.পি. সভামঞ্চেই ছিলেন। বিমানবন্দর থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে রাষ্ট্রপতির ১২ মিনিট লাগে। কারণ ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের বিমানটি মাটিতে নামার সাথে সাথে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো উত্তাল জনতা বিমানটিকে ঘিরে ফেলে। তাঁর প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন তাঁকে সংবর্ধনা জানান, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার, সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনীতিক প্রতিনিধিরা সংবর্ধনা জানান।

জনতার ভিড়ে বেগম মুজিব ও তাঁর দুই ছেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোজাসুজি একটি খোলা পুলিশ লরিতে রমনা রেসকোর্সে যান। বিশাল জনসভা শেষে ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে একটি গৃহে বর্ণনাতীত এক আবেগপ্রবণ পুনর্মিলন। বন্ধুদের শুভেচ্ছাসূচক ফুলের পাপড়িতে শোভিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। ঘটনা এর চেয়েও এগিয়ে যায় যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ৯০ বছরের পিতার পা স্পর্শ করে ৮০ বছরের মাকে বুকে জড়িয়ে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন।

(দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, যুক্তরাজ্য, লন্ডন, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

সাক্ষাৎকার

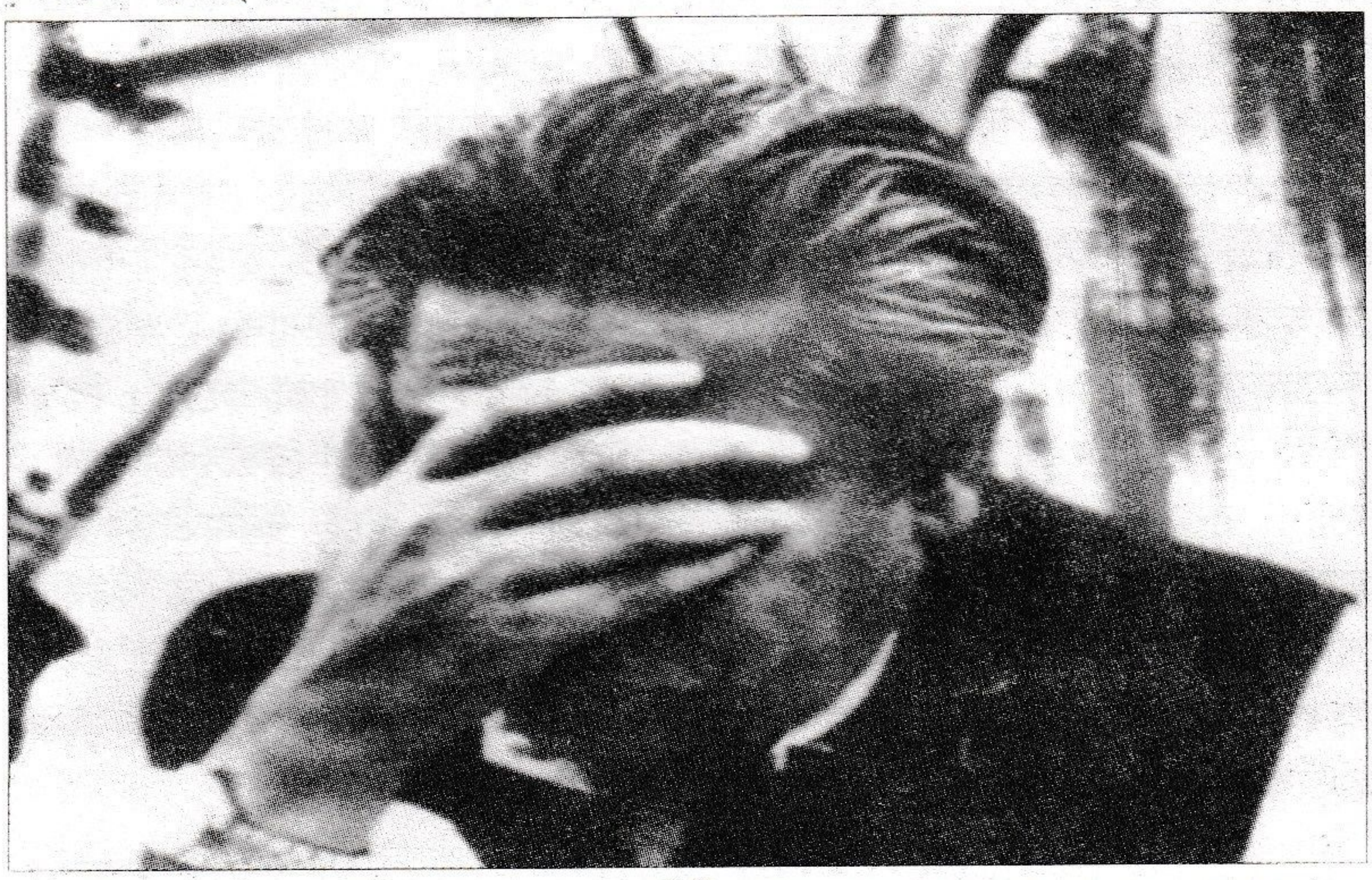
[ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার]

ফ্রস্ট : যে রাতে আপনি গ্রেফতার হয়েছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন আপনি গ্রেফতার হতে পারেন। তা ছাড়া পাকিস্তানিরা যে আক্রমণ করবে এ ধরনের একটা ইঙ্গিতও নিশ্চয়ই আপনি তাদের যোগসাজশমূলক আলোচনার সময় জানতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া পাক সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে এ ধরনের সংবাদও আপনি টেলিফোনে পেয়েছিলেন; তা সত্ত্বেও আপনি গ্রেফতার হবার জন্য অপেক্ষা করলেন কেন?

বঙ্গবন্ধু : ঘটনার দিন বিকেলে আমার বাড়ি চারপাশ কমান্ডো দিয়ে ঘেরা ছিলো। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেই তারা আমাকে হত্যা করতো এবং বলতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চরমপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমি নিহত হবার পর ইয়াহিয়া খান বিশ্ববাসীকে বলতো তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা করছিলো কিন্তু চরমপন্থীরা তাঁকে হত্যা করেছে এবং তারা আমার সমস্ত জনগণকে হত্যা করতো এবং তারা একটা তাণ্ডব অবস্থার সৃষ্টি করতো। এটাই ছিলো তাদের প্রথম মতলব। আমি জানি তারা অসভ্য, তারা পশু। আর এজন্যই আমি চিন্তা করেছিলাম আমার মৃত্যুই শ্রেয়, তবু আমার জনগণ বেঁচে থাকুক; তারা আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ফ্রস্ট : আপনি অন্তত কোলকাতায় যেতে পারতেন?

বঙ্গবন্ধু : যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে আমি যে-কোনো জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু আমি আমার জনগণকে ফেলে কীভাবে যাই? আমি আমার জাতির নেতা। আমি তাদের জন্যে যুদ্ধ করতে পারি, মরতে পারি, যেহেতু আমিতো তাদেরকে প্রতিরোধে নামতে বলেছি।



চিত্র : ৯। পাক আর্মিদের অত্যাচারের কাহিনী শুনলে বঙ্গবন্ধুর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতো।

ফ্রস্ট : আপনি অবশ্য ঠিক; যেহেতু গত নয় মাসে আপনি আপনার জনগণের কাছে একটা প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এখন তারা আপনাকে একজন ঈশ্বরই মনে করে।

বঙ্গবন্ধু : না, সেটা আমি মনে করি না। আমি মনে করি তারা আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদেরকে ভালোবাসি এবং তাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বন্য পশুরা আমাকে গ্রেফতার করে এবং আমার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে। এমন কি তারা আমার গ্রামের বাড়িও ধ্বংস করে। সেখানে আমার ৯০ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং ৮০ বছরের বৃদ্ধ মাতা বাস করতেন। তারা তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের চোখের সামনে ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনিভাবে তারা সব কিছু পোড়ায়।

অবশ্য আমি মনে করেছিলাম যদি তারা আমাকে পায় তাহলে আর আমার নিরীহ জনগণকে হত্যা করবে না। অন্যদিকে আমি জানি আমার পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি একটি শক্তিশালী পার্টি সংগঠিত করেছি এবং আমার পার্টির পেছনে রয়েছে বিপুল জনসমর্থন। আমি জানি তারা যুদ্ধ করবে। তাদের প্রতি আমার নির্দেশ ছিলো, আমি থাকি আর না থাকি, যতোক্ষণ না পর্যন্ত মুক্তি অর্জিত হবে তোমরা প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

ফ্রস্ট : কীভাবে তারা আপনাকে গ্রেফতার করে। তারা কি আপনাকে রাত ১.৩০ মিনিটে গ্রেফতার করে? গ্রেফতারের সময় কী কী ঘটেছিলো?

বঙ্গবন্ধু : আমি আমার শোয়ার ঘরেই ছিলাম। এটাই আমার শোয়ার ঘর। ওদিক দিয়েই তারা প্রথম গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। কিছু মেশিনগানে এদিক দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। আর এ দিকটা দিয়ে তারা জানালায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করে।

ফ্রস্ট : এগুলো কি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আমার পরিবার আমার সঙ্গে ছিলো এবং একটা বুলেট সরাসরি আমার শোয়ার ঘরে ঢোকে। আমার ছয় বছরের ছেলেটি এ বিছানাতেই শুয়েছিলো। আমার স্ত্রী ও মেয়ে দুটিকে নিয়ে এখানে ছিলেন।

ফ্রস্ট : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢুকেই কী শুরু করেছিলো?

বঙ্গবন্ধু : তারা চারপাশের জানালা দিয়ে গুলি করা শুরু করে। সে সময় আমি আমার স্ত্রীকে এবং দুই সন্তানকে নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে বাইরে চলে আসি।

ফ্রস্ট : আপনার স্ত্রী কিছু বলেন নি?

বঙ্গবন্ধু : না, সে কোনো কথা বলে নি। আমি শুধু তাকে একটি বিদায় চুমু জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দরজা খুলে বাইরে এসেই আমি বলি, 'গুলি বন্ধ করো, তোমরা চিৎকার করছো কেন? আমি তো এখানেই আছি।' তখন সৈন্যরা আমার চারপাশ দিয়ে বেয়নেট চার্জ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একজন অফিসার দ্রুত আমাকে ধরে ফেলে বলে 'একে মেরো না।'

ফ্রস্ট : শুধু একজন অফিসারই তাদের থামিয়ে দেয়?

বঙ্গবন্ধু : একজন অফিসারই থামিয়ে দেয়, তারপর তারা আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে শুরু করে। যদিও একজন অফিসার আমাকে ধরেছিলো, তবুও তারা চারপাশ দিয়ে রাইফেলের কুঁদো ও বুট দিয়ে আমাকে গুঁতাতে থাকে। আমি তাদের বলি, তোমরা আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছো কেন? আমাকে আমার প্রয়োজনীয় পাইপ ও তামাক নিয়ে আসতে দাও অথবা আমার স্ত্রীকে দিয়ে যেতে দাও। আমি সেগুলো নেবার জন্যে এসে দেখি আমার স্ত্রী পাইপ ও একটি ছোট স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো নিয়ে এসে দেখি সর্বত্র আগুন জ্বলছে। ওরা তখন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।

ফ্রস্ট : আপনি যখন এ ৩২ নম্বর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছিলেন, আপনি ভেবেছিলেন কি, আবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারবেন?

বঙ্গবন্ধু : না, আমি মনে করেছিলাম এটাই আমার শেষ। তবে আমার সান্ত্বনা ছিলো,

আমি আমার জাতির সম্মান রক্ষা করতে পেরেছি। আমার জাতি পৃথিবীর বুকে মুখ দেখাতে পারবে। আমি আত্মসমর্পণ করি নি। তাদের নেতা হিসেবে আমি মাথা উঁচু করে মরেছি।

ফ্রস্ট : আপনি না এক সময় বলতেন, 'যদি কেউ মরার জন্যে প্রস্তুত থাকে তাকে মারতে পারে না?'

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই বলি, 'যে মানুষ মরার জন্যে প্রস্তুত কেউ তাকে মারতে পারে না।' আমি বিশ্বাস করি, একজন মানুষকে শারীরিকভাবে হত্যা করা যায়, কিন্তু একটি মনের সত্ত্বা কখনোই হত্যা করা যায় না। কেউ-ই পারে না। এ ছাড়া আমি একজন মুসলমান। একজন মুসলমান একবারই মরে। সর্বোপরি আমি মানুষ, আমি মানবতাকে ভালোবাসি। আমি তাদেরকে ভালোবাসি—এর চেয়ে আমার আর বেশি কিছু পাবার নেই এবং তাদের মুক্ত করার জন্যে আমার মরতেও কোনো দ্বিধা নেই। তারা আমার জন্যে তাদের সর্বস্ব দিয়েছে—আমিও তাদের জন্যে তাদের মুক্তির জন্যে আমার সর্বস্ব দিতে চাই। আমি যখনই আমার প্রতি আমার জনগণের ভালোবাসার কথা মনে করি তখনই আমি অভিভূত হয়ে পড়ি।

ফ্রস্ট : পাকিস্তানিরা কি আপনার ঘর থেকে সবই নিয়ে গিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : হুঁ। সবই নিয়ে গিয়েছিলো। এই যে সব দেখছেন না, এর কিছুই ছিলো না। তারা ঘরের বিছানা, আলমারি, কাপড়-চোপড় যাবতীয় সব কিছুই নিয়ে গিয়েছিলো।

ফ্রস্ট : পাকিস্তানিরাই নিয়ে গিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : হুঁ। সবই পাকিস্তানি সৈন্যরা নিয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য আমার আসবাবপত্র, আমার ছেলে-মেয়েদের কাপড়-চোপড় নিয়েছিলো এজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই, আমার দুঃখ তারা আমার গত ৩৫ বছরের রাজনৈতিক ডায়েরিটা নিয়েছে। এ ছাড়া আমার একটা সুন্দর লাইব্রেরি ছিলো। তারা তার যাবতীয় বইগুলো নিয়েছে সেখানে কিছু মূল্যবান দলিলপত্র ছিলো তাও নিয়েছে।

ফ্রস্ট : আবার প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি, কেন তারা এমনটি করলো?

বঙ্গবন্ধু : জানি না। তবে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়। বাস্তবিক তারা বন্য, বর্বর। আমার বাড়ির ঘটনা না হয় বাদ দেন, তারা অন্য ক্ষেত্রে কী করেছে—এগুলো একটু ভেবে দেখুন। ২ বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু, ৫ বছরের নিষ্পাপ শিশুকেও তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে অসহায় স্ত্রীলোককে। শুধু তাই নয় তারা আমার অসহায় দরিদ্র জনগণের বস্তিতে আগুন জ্বালিয়েছে। তাদেরকে টেনে বের করে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এমন কি রাস্তার দু ধারে এলোপাতাড়ি মেশিনগান চালিয়ে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, তারা সাধারণ লোককে বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য করেছে এবং তাদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই।

ফ্রস্ট : তারা কি জানতো না তাদের দ্বারা কী করা হচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু : না।

ফ্রস্ট : কেউ নিশ্চয় তাদের দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : নিশ্চয়ই, তবে তাদের ধারণা ছিলো প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমর্থক। অতএব সবাইকে হত্যা করতে হবে।

ফ্রস্ট : যখন আপনি মানুষের এরূপ আচরণ দেখেন, তখন আপনি মানুষ সম্পর্কে কী ভাববেন, বাস্তবিক কি মানুষ সুন্দর না এমনি বর্বর?

বঙ্গবন্ধু : সুন্দর ও বর্বর সত্ত্বা সব কিছুর ভেতরই রয়েছে। মানবিক গুণাবলি সমন্বিত মানুষও আমি অনেক দেখেছি। আসলে পাক সৈন্যরা মানুষ নয়। তারা পশুরও অধম। অবশ্য মানুষের ভেতরও জন্তুর গুণাবলি থাকে; তবে মানুষ কখনোই জন্তুর অধম নয়। কিন্তু পাক সৈন্যরা জন্তুরও অধম। পশু একটি মানুষকে আক্রমণ করেই হত্যা করে। কিন্তু যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে না। অথচ পাক সৈন্যরা আমার জনগণকে পাঁচ-সাত এমন কি ১৫ দিন ধরে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : আপনার বিচারের নামে কী ঘটেছিলো?

বঙ্গবন্ধু : তারা ৫ জন সামরিক অফিসার ও বাদ-বাকি সিভিল অফিসার নিয়ে একটি কোর্ট মার্শাল গঠন করেছিলো।

ফ্রস্ট : আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : রাষ্ট্রদ্রোহ, পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধাচরণ, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা এমনি সব আর কি। সব মিলিয়ে বারোটার মতোই অভিযোগ ছিলো, যার যে-কোনো ছয়টা অভিযোগের প্রত্যেকটিরই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ফ্রস্ট : আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন?

বঙ্গবন্ধু : সরকার প্রথমে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু পরিস্থিতি দেখে আমি নিজেই চিন্তা করলাম—এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো যুক্তি নেই। কারণ ওটা কোনো বিচার ছিলো না। ওটা ছিলো সম্পূর্ণরূপে একটা প্রহসন। এজন্য আমি কোর্টকে সরাসরি বলেছিলাম, 'মি. বিচারপতি, দয়া করে আমার পক্ষ সমর্থনকারী আইনজীবীকে চলে যেতে বলুন। কারণ এটা বিচার নয় এটা একটা ক্যামেরা মহড়ামাত্র। আমি একজন বেসামরিক লোক, কোনো ক্রমেই আমার কোর্ট মার্শাল হতে পারে না। তা ছাড়া ইয়াহিয়া খান শুধু প্রেসিডেন্ট নন, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকও বটে। তিনিই এ বিচারালয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

ফ্রস্ট : আপনি কি মনে করেন, ইয়াহিয়া খানই বিচার শেষে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন?

বঙ্গবন্ধু : হুঁ। তিনি যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

ফ্রস্ট : তারা কি শেষ পর্যন্ত কোনো অফিসিয়ালি রায় দিতে সমর্থ হয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : কোর্টের কার্যাবলি ৪ ডিসেম্বরের ভেতর সাজানো শেষ হলে ইয়াহিয়া খান তাৎক্ষণিকভাবে বিচারকদের রাওয়ালপিণ্ডিতে ডেকে পাঠান। বিচারক মানে ঐ সকল

কর্নেল ও ব্রিগেডিয়াররা। তিনি তাদেরকে বিচারের রায় জানিয়ে দেন এবং ঐখানে তারা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ফ্রস্ট : আমি বিশ্বাস করি—বাস্তবিকই আপনি দেখেছিলেন যে জেলের পাশে আপনার কবর খোঁড়া হয়েছিলো।

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই। আমি নিজেই দেখেছি—আমার জেলের একেবারে পাশেই তারা কবর খুঁড়েছিলো।

ফ্রস্ট : আপনি কি জানতেন তারা কী করছে?

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই, আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। এমন কি আমি বলেছি, সম্ভবত এটা আমারই কবর—ভয় নেই আমি প্রস্তুত।

ফ্রস্ট : তারা কি কখনো বলেছে, এটা আপনার কবর?

বঙ্গবন্ধু : না, তারা কখনোই ঐ ধরনের কোনো কথা বলে নি।

ফ্রস্ট : তারা কী বলতো?

বঙ্গবন্ধু : তারা বলতো, না, না– এটা যদি কখনো বোমা আক্রান্ত হই, সে সময় আপনি যাতে আশ্রয় নিতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করছি।

ফ্রস্ট : ঐ সময়ে আপনি কি চিন্তা করতেন? সমগ্র নয় মাসই কি আপনার চিন্তা ছিলো, আপনি মারা যেতে পারেন?

বঙ্গবন্ধু : ঐ নয় মাসে সব সময়ই আমি জানতাম আমি যে-কোনো সময় মারা যেতে পারি। পাকিস্তানিরা মানুষ নয় বন্য।

ফ্রস্ট : আপনি এ অবস্থা কীভাবে মোকাবেলা করতেন? আপনি কি প্রার্থনা করতেন?

বঙ্গবন্ধু : আমার বিশ্বাস, আমার নীতি ও আমার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্যে আমি অবস্থার মোকাবেলা করতে পারতাম। কারণ আমার সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আমাকে তাদের ভাইয়ের মতো, পিতার মতো এবং তাদের নেতা হিসেবে ভালোবাসে।

ফ্রস্ট : যখন আপনি দেখলেন, আপনার কবর খোঁড়া হয়ে গেছে—আপনাকে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন আপনি প্রথমে কাকে নিয়ে চিন্তা করতেন, আপনার দেশ—না আপনার স্ত্রী-পুত্র?

বঙ্গবন্ধু : আমার প্রথম চিন্তা ছিলো আমার দেশ। তারপরে আমার পরিবার। আমি আমার জনগণকেই বেশি ভালোবাসি। আমি আমার জনগণের জন্যে কষ্ট স্বীকার করি ঠিকই, তবে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন—আমার জনগণ আমাকে কী পরিমাণ ভালোবাসে।

ফ্রস্ট : আসলেই তো, বাংলাদেশের মতো স্বাধীনতাযুদ্ধে নিয়োজিত একটি দেশের নেতা হতে গেলে প্রথমেই আপনাকে আপনার জনগণকে ভালোবাসতে হবে—তারপরে আসবে আপনার পরিবারের কথা।

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই, আমি আমার জনগণকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আমি জানি একজন মানুষকে আজ হোক, কাল হোক মরতেই হবে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে বীরের মতো মরা উচিত।

ফ্রস্ট : আপনাকে কবর থেকে কে রক্ষা করলো?

বঙ্গবন্ধু : আমি মনে করি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই আমাকে রক্ষা করেছেন।
ফ্রস্ট : আমি একটা সংবাদ মাধ্যমে পড়েছি যে, ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করে—সে সময় জেলার আপনাকে অন্যত্র সরিয়ে রাখে—এটা কি ঠিক?
বঙ্গবন্ধু : ইয়াহিয়া খান এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো যে, জেলের কিছু সংখ্যক সাধারণ কয়েদি খুব ভোরের দিকে আমাকে আক্রমণ করবে এবং হত্যা করবে। মনে করি এ ঘটনার দিন ক্ষণ আমার তদারককারী অফিসার জানতে পারে—সম্ভবত সে আমাকে ভালোবাসতো এবং সেই আমাকে রাত তিনটার দিকে জেল থেকে নিয়ে মরু অঞ্চলের একটা কলোনিতে চার-পাঁচ অথবা ছয়দিনের মতো লুকিয়ে রাখে। এ ঘটনা কিছু নিম্ন পদস্থ অফিসার ছাড়া আর কেউই জানতো না।
ফ্রস্ট : হায়! ঐ অফিসারদের কপালে কী ঘটেছিলো?
বঙ্গবন্ধু : আমি জানি না। তবে তাদের কপালে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দুর্ভোগ জুটেছিলো। আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন।
ফ্রস্ট : এমন কি ইয়াহিয়া খান যখন ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, সে সময়ও নাকি সে আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে ভুট্টোকে সুপারিশ করেছিলেন—এটা কি ঠিক?
বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই ঠিক। এমন কি এটা একটি রসাত্মক গল্প। মি. ভুট্টোই আমাকে বলেছেন। ইয়াহিয়া যখন ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তখন তিনি ভুট্টো, বলেন, 'মি. ভুট্টো সাহেব, আমি ঐ বড় শয়তান মুজিবকে হত্যা করে যেতে পারলাম না।'
ফ্রস্ট : সে এমনি বলেছিলো?
বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ। সে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ও ভুট্টোকে অনুরোধ করে ছিলো যে ভুট্টো যেনো তাঁকে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বের তারিখ নির্দেশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ফাঁসিটা কার্যকরী করতে দেয়। কিন্তু ভুট্টো এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলো।
ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া ভুট্টোকে কী বলেছিলো, ভুট্টো সাহেব সে কথা আপনাকে বলেছেন?
বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, বলেছিলেন।
ফ্রস্ট : ভুট্টো সাহেব আপনাকে কী বলেছিলেন?
বঙ্গবন্ধু : ভুট্টো বলেছিলেন, না, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ সেনাবাহিনীর কাছে বাংলাদেশে বন্দি আছে। তার উপর প্রায় ৫ থেকে ১০ লাখের মতো অবাঙালি বাংলাদেশে রয়ে গেছে। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলে একটিও পশ্চিম পাকিস্তানি রূহ ফিরে আসবে না এবং এ কারণে পশ্চিমপাকিস্তানেও প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে যাতে আমার পক্ষেও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না। ভুট্টো যথার্থই চিন্তা করেছিলেন। ঘটনা যে এদিকে গড়াতো তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না।
ফ্রস্ট : এ মুহূর্তে যদি আপনি ইয়াহিয়া খানের মুখোমুখি হন, আপনি তাকে কী বলবেন?
বঙ্গবন্ধু : সে একটা জঘন্য অপরাধী। সে তার সেনাবাহিনী দিয়ে আমার ৩০ লাখ লোককে হত্যা করেছে আমি তার ছবিও দেখতে চাই না।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টো তাকে গৃহবন্দি করেছেন, তার প্রতি মি. ভুট্টোর কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

বঙ্গবন্ধু : আপনি জানেন বাংলাদেশে কী ঘটেছে। আমি আপনাকে বলছি, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, শিশু, স্ত্রীলোক, শ্রমিক সব মিলিয়ে তারা কমপক্ষে ৩০ লাখ লোক হত্যা করেছে। কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ঘর-বাড়ি পুড়িয়েছে। এমন কি সমস্ত খাদ্য গুদামগুলোও তারা ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

ফ্রস্ট : কেমন করে আপনি জানেন, মৃতের সংখ্যা ৩০ লাখ?

বঙ্গবন্ধু : আমার পৌঁছানোর পূর্বেই আমার জনগণ এ তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। সর্বত্রই শিকড় পর্যায়ে আমার সংগঠন আছে সেসব স্থান থেকে আমি সংবাদ পাচ্ছি। আমরা এখনো চূড়ান্তভাবে হিসাব করি নি তবে এর সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি হবে, মোটেই কম হবে না।

ফ্রস্ট : নিশ্চয়ই তারা অগণিত মানুষকে হত্যা করেছে? তারা বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে মানুষ...

বঙ্গবন্ধু : গ্রামের শান্ত নিরীহ লোক যারা দুনিয়ার কোনো খবর জানতো না, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেখানে গিয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ ঐসব লোককে পাখির মতো হত্যা করে মেরেছে।

ফ্রস্ট : কেন, কেন, কেন?

বঙ্গবন্ধু : আমি জানি না। এমন কি আমি বুঝতেও পারি নি। এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে কোনো কালে ঘটে নি। এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের কোনো ঘটনার নজিরও নেই।

ফ্রস্ট : এটা কি মুসলমানের হাতে মুসলমান হত্যা নয়?

বঙ্গবন্ধু : তারা কেবল মুসলমানের বুলি আওড়ায়। কেমন করে একজন মুসলমান মুসলিম বালিকাকে হত্যা করে। এ ছাড়া আমরা হাজার হাজার মেয়েকে উদ্ধার করেছি। তাদের অনেকেই আমাদের ক্যাম্পে আছে। এসব মেয়েদের পিতা স্বামী সবাই নিহত হয়েছে। পাকিস্তানিরা মায়ের সামনে ঐসব মেয়েদের শ্লীলতা নষ্ট করেছে। তারা ছেলের সামনে মায়ের শ্লীলতা নষ্ট করেছে। আপনিই চিন্তা করুন, এরপর তারা কেমন করে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করে। আমি নিজের চোখের জল সামলাতে পারি না। বাস্তবিক তারা বন্য পশুর চেয়েও জঘন্য। আমার বন্ধু এবং আমার পার্টির একজন প্রথম সারির নেতা মি. মশিউর রহমান (তিনি কেঁদে ফেললেন) এমন কি তিনি বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন মন্ত্রি, তিনি নির্যাতিত ও নিহত হয়েছেন। তারা তাকে ২৪ দিন ধরে নির্যাতন করেছে। প্রথমে তারা তাঁর ডান হাত কেটেছে, এরপর বাম হাত, এরপর কান, পা এমনি চব্বিশ দিন ধরে নির্যাতন করে তবেই তাকে হত্যা করে, এটা অনেক ঘটনার একটি মাত্র। এমনভাবে তারা আমার বহু নেতা, ছাত্র, কর্মী, অফিসার, বুদ্ধিজীবীকে তাদের হেফাজতে নেবার পর সাতদিন, দশদিন ধরে নির্যাতন করে তবেই হত্যা করেছে। এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার আমি ইতিহাসেও দেখি নি। এমন কি বন্য জানোয়ার বাঘও মানুষকে এভাবে হত্যা করে না।

ফ্রস্ট : তারা কীসের আশায় এ কাজ করেছিলো?

বঙ্গবন্ধু : তারা এ দেশকে একটি কলোনি করতে চেয়েছিলো। আপনি জানেন, তারা আমার পুলিশ হত্যা করেছে শুধু পুলিশকে কেন, তারা বাঙালি সৈন্য, বাঙালি অধ্যাপক, বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি ডাক্তার, যুবক-ছাত্র এমনিভাবে সকল শ্রেণীকে হত্যা করেছে।

ফ্রস্ট : তারা কি যুদ্ধের শেষ শেষ মুহূর্তে এ ঢাকাতেই ১৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে যেয়ে হত্যা করে?

বঙ্গবন্ধু : শুধুমাত্র এ ঢাকায় আত্মসমর্পণের একদিন পূর্বে তারা ঐ কাজ করে এবং ১৫০ নয় ৩০০ জন বুদ্ধিজীবীকে তারা হত্যা করে। তারা সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এসকল বুদ্ধিজীবীরা তাদের বাড়িতেই নিহত হয়েছিলেন। আরো নির্মম ঘটনা শুনুন, তারা প্রথমে গোটা শহরে কারফিউ জারি করে। যার ফলে প্রত্যেকটি লোকই যার যার ঘরেই ছিলো, আর ঐ সময়ে তারা বাড়ি বাড়ি ঢুকে তাদেরকে হত্যা করে।

ফ্রস্ট : কারফিউর কারণে কেউই জানতে পারে নি যে কী ঘটতে যাচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ।

ফ্রস্ট : আপনি কি মনে করেন, ইয়াহিয়া খান নিজে একজন দুর্বল চিত্তের মানুষ, যে অন্য বর্বরদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে না সে নিজেই একজন বর্বর।

বঙ্গবন্ধু : সে ব্যক্তিগতভাবেই একজন বর্বর। তার নিজস্ব বন্ধু বা সহকর্মীরাও একথা স্বীকার করে থাকে। তা ছাড়া এ দায়-দায়িত্ব আপনি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না। কারণ সে নিজেই একজন ভণ্ড ও ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। তাছাড়া মেজোরিটি পার্টির নেতা হিসেবে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলেছি তখনো আমি দেখেছি...

ফ্রস্ট : সে কী সে সময় আপনাকে ধোঁকা দিতে সমর্থ হয় নি?

বঙ্গবন্ধু : না, সে কোনো মতেই আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হয় নি। আমি ঠিক মতোই বুঝতে পেরেছিলাম কী ঘটতে যাচ্ছে; আর সে জন্যে আমিও আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত ছিলাম এবং আঘাতও সে ঠিকমতো পেয়েছে।

ফ্রস্ট : কী প্রস্তুতি ছিলো আপনার?

বঙ্গবন্ধু : তাকে প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি ছিলো এবং সেটা ঘটেছেও।

ফ্রস্ট : মুক্তি পাবার পর তার সাথে কি আপনার দেখা হয়েছে? আপনি কি কখনো তার সাথে দেখা করতে চান?

বঙ্গবন্ধু : না, কারণ সে কোনো মতেই একটি মানব সন্তান নয়।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টোর পক্ষে এখন কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

বঙ্গবন্ধু : তার পুরোপুরি বিচার করা উচতি এবং প্রকাশ্যে বিচার করা উচিত।

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া এখন গৃহবন্দি। আপনি কি মনে করেন মি. ভুট্টো ঐ কাজ করবেন?

বঙ্গবন্ধু : তার করা উচিত।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টো সম্পর্কে আপনি কী চিন্তা করেন? আপনি কি মনে করেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রি হিসেবে মি. ভুট্টো কোনো দিন এ মুক্ত ঢাকায় আসতে পারবে? বা কোনো আলোচনার জন্যে?

বঙ্গবন্ধু : জানি না, তবে ভুট্টোকে বাস্তবতা স্বীকার করতে হবে। তাকে স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এটা তার নিজের রাজ্য বলে চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। এটা অসম্ভব। কারণ আপনিই সব বাস্তবতা দিয়ে বিচার করে দেখুন। তারা যদি বলে এক পাকিস্তান তাহলে সেখানেও তো আমি মেজরিটি পার্টির নেতা। আমিই নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাবি করতে পারি। আর সে হিসেবে পশ্চিমপাকিস্তান আমারই রাজ্য। যদি তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাহলে নিশ্চয়ই মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে আমি সভা ডাকতে পারি এবং ঘোষণা করতে পারি। গোটা দেশই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান আমার রাজ্য। ভুট্টো আপনি অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়ুন, আমি গভর্নর নিযুক্ত করছি। আর যদি আপনি ক্ষমতা ত্যাগ না করেন তাহলে আমি আমার সেনাবাহিনী এবং যৌথ বাহিনীকে পাকিস্তান জয় করার জন্যে পাঠাবো। অবশ্য আমি ঝগড়া চাইনে এবং রাজ্য জয়ের কোনো বাসনাও আমার নেই। বরং মি. ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে সুখী হোক এবং আমি আমার দেশ ও জনগণ নিয়ে সুখী হতে চাই। আমার বাংলাদেশ একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র।

ফ্রস্ট : বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি লোকের ভেতর কতো ভাগ লোক এখন ক্ষুধার্ত। বাংলাদেশে কি এখন দুর্ভিক্ষ?

বঙ্গবন্ধু : আমি মনে করি কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ।

ফ্রস্ট : ৭৫ শতাংশ?

বঙ্গবন্ধু : কারণ, তারা সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে গেছে। আমার যেসব লোকদের নিজস্ব খাদ্যভাণ্ডার ছিলো তারা সে সব লুট করেছে। যাদের স্বল্প পরিমাণ পয়সা-কড়ি ছিলো তাও লুট করেছে। এমন কি আমি মনে করি ৭৫ শতাংশ নয় প্রায় ৮৫ শতাংশ লোকই দারুণ অসুবিধার ভেতর আছে। আমার জনগণ অত্যন্ত ভালো এবং তারা সব সময়ই শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চায়। আমার উপরেই তাদের সকল আস্থা তারা আমার মুখের দিকে চেয়েই বসে আছে যে আমি তাদের জন্যে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবো। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ভারত স্বীকৃতি দেবার পর পরই আমার জনগণকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছে। তারা আমার মেশিনারি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃউদ্ধারে সাহায্য করছে। কারণ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্বে আমার রেলওয়ে, বড় বড় সেতু, তেলের আধার, শিল্প-কারখানা এমনিভাবে যতো দূর সম্ভব সব কিছুই ধ্বংস করে গেছে।

ফ্রস্ট : আপনাকে নিশ্চয়ই এ নতুন দেশের জন্য প্রথম সপ্তাহেই অনেক কিছু করতে হবে। এ মুহূর্তে আপনাকে অবশ্য জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু : জাতীয় পতাকা নির্বাচিত আছেই এবং সেটা অনেক পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সেটাতে সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় সঙ্গীতও অনেক আগে থেকেই রয়েছে, তবে সেটাকে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি আমার জাতীয় পতাকায় সামান্য একটি পরিবর্তন আনবো। অর্থাৎ জাতীয় পতাকায় যে বাংলাদেশের ম্যাপটি ব্যবহৃত ওটা তুলে দেব। কারণ কোনো দেশ তার জাতীয় পতাকায় রাষ্ট্রের ম্যাপ ব্যবহার করে না।

ফ্রস্ট : কেন এমনটি?

বঙ্গবন্ধু : এমনটি পৃথিবীতে কখনো কোথাও ঘটে নি। আমরা করেছিলাম। অর্থাৎ জাতীয় পতাকার উদিত সূর্যের মাঝখানে আমরা আমাদের দেশের ম্যাপ স্থাপন করেছিলাম। জনগণও সেটা মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু এখন আমরা সেটা রাখবো না।

ফ্রস্ট : জাতীয় সঙ্গীত কার লেখা?

বঙ্গবন্ধু : এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পুরনো গান।

ফ্রস্ট : তার ইংরেজি অনুবাদ কী?

বঙ্গবন্ধু : ইংরেজিতে 'আই লাভ মাই গোল্ডেন বেঙ্গল' কীভাবে শুরু করি . . . বা 'গোল্ডেন বেঙ্গল আই লাভ ইউ।'

ফ্রস্ট : এ গান নিশ্চয়ই বাংলাদেশে বহু বছর গীত হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, অনেক বছর। ৭ মার্চ যখন আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি, ঐ মিটিংয়ে উপস্থিত দশ লাখ লোক দাঁড়িয়ে ঐ গানকে স্যালুট জানায় এবং ঐ সময়ই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়ে যায়।

ফ্রস্ট : আপনার কি ৭ মার্চ রেসকোর্স মাঠেই স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবার ইচ্ছা ছিলো?

বঙ্গবন্ধু : আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে। তাই আমি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছিলাম এটাই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করার সময়।

ফ্রস্ট : যদি আপনি ঐদিন বলতেন, 'আমি ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' তাহলে কী ঘটতো?

বঙ্গবন্ধু : আমি কোনোক্রমেই ঐদিন এরূপ ঘোষণা দিতাম না। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিলো তারা যেনো কোনো ক্রমেই বিশ্ববাসীকে বলতে না পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কাজেই, আমাদের তাকে আঘাত হানা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আমি চেয়েছিলাম তারাই প্রথম আমাদেরকে আঘাত করুক। আমার জনগণ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো।

ফ্রস্ট : আপনি তো নিশ্চয়ই চান নি যে তারা আঘাত করুক?

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই চেয়েছিলাম।

ফ্রস্ট : আপনি কখন চিন্তা করেছিলেন বাংলাদেশকে ব্রিটিশ স্বীকৃতি দেবে?

বঙ্গবন্ধু : আমি সব সময়ই আশা করতাম। কারণ আমি ব্রিটিশ জনগণকে জানি।

ফ্রস্ট : মি. হিথের সাথে আপনার আলোচনা হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : মি. হিথ্ এবং মি. উইলসনের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে এবং তাদের কথা-বার্তায় আমি খুশি।

ফ্রস্ট : আপনি কি ব্রিটেনের তামাক খান?

বঙ্গবন্ধু : হ্যাঁ, দীর্ঘকাল যাবত।

ফ্রস্ট : কী তামাক খান?

বঙ্গবন্ধু : এরিন্‌মোর্।

ফ্রস্ট : আপনি এটা পছন্দ করেন?

বঙ্গবন্ধু : আমি এটা পছন্দ করি। ১৪ বছর ধরে আমি এ তামাক খাচ্ছি। এমন কি জেলে থাকাকালীনও আমি বলতাম আমাকে অবশ্যই ঐ তামাক সরবরাহ করতে হবে। তারা অনুগ্রহ করে সেটা করতো।

ফ্রস্ট : এমন কি নির্জন জেলেও?

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই। এজন্যে আমি তাদের প্রতি খুশি (তিনি হেসে উঠলেন)।

ফ্রস্ট : এখন এ নগরী একটি ক্ষুধার্ত অথচ সুখী নগরী। আপনি কি বলতে পারবেন এ মুহূর্তে আপনার কতো টাকা প্রয়োজন?

বঙ্গবন্ধু : আমি এখন বলতে পারবো না। এ মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারবো না। তারা চলে যাবার পূর্বে সমস্ত ব্যাংক নোট আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ব্যাংকের যাবতীয় টাকা তারা পূর্বেই আত্মসাৎ করে কিন্তু সারেন্ডারের পূর্বে সবই পুড়িয়ে ফেলে।

ফ্রস্ট : বর্তমানে পশ্চিমপাকিস্তানে যে টাকা চলছে, এ টাকা কি এখানে কিছুই নেই।

বঙ্গবন্ধু : কিছুই ছিলো না। আমি আমার জনগণকে সোনা দিতে বলবো। যার যতোটুকু আছে আর কি। তারা অবশ্য তা দেবে।

ফ্রস্ট : তারা সোনা জমা দেবে, আর সেটাই আপনার জমাকৃত সোনা।

বঙ্গবন্ধু : এ ছাড়া এ মুহূর্তে কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবত আমি আগামি দিন অথবা পরশু দিন জাতির উদ্দেশ্যে আবেদন জানাবো যেনো তারা তাদের গহনাপত্র যা সামান্য কিছু রিজার্ভ আছে তা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়। কারণ আমার ব্যাংক রিজার্ভ প্রয়োজন। অবশ্য তাদের প্রায় কিছুই নেই। হানাদাররা সমস্ত সোনার দোকান লুট করে নিয়ে গেছে। মি. ফ্রস্ট এ বিষয়ে তো আমি আগেও আপনাকে বলেছি।

ফ্রস্ট : কিন্তু আমি ভাবছি, জনগণ কোথা থেকে আপনাকে সোনা দেবে?

বঙ্গবন্ধু : তাদের যা সামান্য আছে তাই দেবে।

ফ্রস্ট : পশ্চিমপাকিস্তান পুনরায় কি কোনো সঞ্চয় করতে পারবে?

বঙ্গবন্ধু : আপনি জানেন, তাদের ঘাড়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা আন্তর্জাতিক ঋণ আছে। এর খুবই সামান্য অংশ বাংলাদেশে ব্যয় হয়েছে। এখন পাকিস্তানি বলতে তারা। আমরা বাংলাদেশ। অতএব এ ঋণের কোনো দায়-দায়িত্ব আমাদের নয়। তারা ঋণ নিয়েছে, তাদেরকেই সব শোধ করতে হবে। তা ছাড়া তাদের অর্থনীতি দেখুন, তাদের অগ্রগতি দুঃসাধ্য। আমি অবশ্যই এগিয়ে যাবো। তাদের ২০০ কোটি টাকা ঋণ শোধ করতে হবে, অথচ তাদের শিল্পের কোনো বাজার নেই। সেখানে তো ভয়াবহ রকম বেকারত্ব দেখা দেবে।

ফ্রস্ট : আপনি জানেন, তারা বলে বাংলাদেশের নেতৃত্বে আপনার একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে। একটি পুরনো প্রবাদ আছে 'কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা দুঃশাসনের জনক'—আপনি কী করে এ ক্ষমতার দুর্নীতি বন্ধ করবেন।

বঙ্গবন্ধু : মি. ফ্রস্ট দেখুন, একটি মানুষ যদি হঠাৎ করে ক্ষমতা পায়, যেমন ইয়াহিয়া খান সে দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো লোক নিয়মের ভেতর দিয়ে সংগ্রাম করে, কষ্ট ভোগ করে, যুদ্ধ করে ক্ষমতায় আসে সে কখনোই দুর্নীতিপরায়ণ

হয় না। যেমন ধরুন, আমার পার্টি এবং আমি। আমার পার্টির যাবতীয় নেতা ও কর্মীরা ২৪ বছর ধরে সংগ্রাম করে তবেই ক্ষমতা পেয়েছে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের পথে তাদেরকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে। এর ভেতর অনেক পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন, অনেকে ঘর-বাড়ি সম্পদ হারিয়েছেন, তাই এতো ত্যাগের পর যদি তারা একচ্ছত্র ক্ষমতাও পায় তাহলেও সেখানে দুর্নীতির প্রশ্ন আসবে না। আমার জনগণ ইয়াহিয়া খানের মতো পশুশক্তির বলে, বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতায় আসে নি, তারা নিয়মের ভেতর দিয়ে সংগ্রাম করে তবেই ক্ষমতায় এসেছে। আর সে জন্যেই আমার পার্টির নেতা ও কর্মীর উপর আমার বিশ্বাস আছে।

ফ্রস্ট : আপনি নেতার কথা উল্লেখ করেছেন, নেতা কে? বা আপনার মতে প্রকৃত নেতৃত্বের সংজ্ঞা কী?

বঙ্গবন্ধু : প্রকৃত নেতৃত্ব একটি নিয়মের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে কেউ কখনো হঠাৎ করে নেতা হতে পারে না। নেতাকে অবশ্যই সংগ্রাম ও নিয়মের ভেতর দিয়েই নেতা হতে হবে। তাকে প্রমাণ করতে হবে তিনি সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে। মানবতার জন্য তাকে সব রকম ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোপরি তিনি অবশ্যই একটি নীতি ও আদর্শের পূজারি হবেন। এসকল গুণাবলিই একজন লোককে প্রকৃত নেতায় পরিণত করে।

ফ্রস্ট : ইতিহাসের কোন্ নেতাকে আপনি বেশি শ্রদ্ধা করেন?

বঙ্গবন্ধু : আমি অনেক নেতাকেই শ্রদ্ধা করি। অবশ্য আমি বর্তমানের কথা বলছি না।

ফ্রস্ট : অতীত ইতিহাসের কোন্ নেতা আপনাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেন?

বঙ্গবন্ধু : আমি অনেককেই শ্রদ্ধা করি যাদের ভেতর রয়েছেন আব্রাহাম লিংকন, মাও সে তুং, লেনিন, চার্চিল। তা ছাড়া প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকেও আমি খুবই পছন্দ করি।

ফ্রস্ট : প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সাথে কি কোনো দিন আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?

বঙ্গবন্ধু : না, তবে আমি তার অনেক বই পড়েছি।

ফ্রস্ট : মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

বঙ্গবন্ধু : আমি অবশ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ বসু, সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক, কামাল আতাতুর্ককে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণকে যিনি তার জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছেন তাকেও আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। এসব নেতারাও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

ফ্রস্ট : এ মুহূর্তে আপনি অতীতের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, অতীতের কোন্ মুহূর্তটি আপনার জীবনে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত হিসেবে দেখা দিয়েছিলো?

বঙ্গবন্ধু : যেদিন আমি শুনতে পেলাম আমার জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে; তারা স্বাধীন—আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি এটাই আমার জীবনের সর্বোচ্চ সুখের দিন।

ফ্রস্ট : আপনার সারা জীবনের?

বঙ্গবন্ধু : অবশ্যই।

ফ্রস্ট : আপনি এমন একটা দিনের স্বপ্ন কতো দিন ধরে দেখছিলেন?
বঙ্গবন্ধু : বহুদিন...।
ফ্রস্ট : আপনার এ স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনি প্রথম জেলে যান কবে? নিশ্চয়ই সেটা বেশ আগে?
বঙ্গবন্ধু : পাকিস্তান হবার পর আমার জেলে যাওয়া শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকে। এরপর ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হই এবং ১৯৫৩ পর্যন্ত জেলে থাকি। ১৯৫৪ সালে আমি মন্ত্রি হই। আবার ১৯৫৪ সালে পুনরায় গ্রেফতার হই, এবারও ১৯৫৫ পর্যন্ত জেলে থাকতে হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান আমাকে গ্রেফতার করে এবং পাঁচ বছর আটক রাখে। এর ভেতর দু বছর তার সরকার আমাকে বিভিন্ন মামলায় বিচার করেন। যার ভেতর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাও ছিলো। পুনরায় ১৯৬৬ সালে সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং ৩ বছর আমাকে আটকে রাখে। আর সর্বশেষে এ তো ইয়াহিয়া খানের জেল থেকে বেরিয়ে এলাম। অবশ্য এ দীর্ঘ সংগ্রাম এ দীর্ঘ কারাভোগ আমার একার উপর দিয়ে যায় নি, আমার অনেক সহকর্মীকেও ভোগ করতে হয়েছে।
ফ্রস্ট : আপনি যখন প্রথম শুনলেন যে আপনার সহকর্মীদের জীবনে গত নয় মাসের যুদ্ধে কী ঘটেছে...
বঙ্গবন্ধু : এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত যখন আমি জানতে পারি তারা আমার ৩০ লাখের উপর লোককে হত্যা করেছে।
ফ্রস্ট : (কতোগুলো ছবি চোখের সামনে ধরে) এ ছবিগুলো কোনো দিন পৃথিবী ভুলতে পারবে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ ছবিগুলো পৃথিবী জুড়ে কীভাবে নাড়া দিয়েছিলো। আপনি যখন এ ছবিগুলো প্রথম দেখেন...
বঙ্গবন্ধু : আপনি আমাকে এগুলো দেখাবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। (তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন)
ফ্রস্ট : আপনাকে বলতে হবে এ ছবিগুলো প্রথম দেখে আপনার কী মনে হয়েছিলো।
বঙ্গবন্ধু : আমার কি বলার আছে বলুন। কী ভাষায়ই বা বলি বলুন? কোনো ভাষা নেই। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি, আমার কান্না এসে যায়। চোখের পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। নিষ্পাপ ছেলে-মেয়ে নিরাপরাধ জনগণকে পাকিস্তানিরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে, বস্তুত এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সময়। ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন শক্ত মানুষ, আমাকে খুব কম লোকই কাঁদতে দেখেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি চোখের পানি রাখতে পারি না।
ফ্রস্ট : গত মাসগুলোতে আপনি আপনার জনগণের জন্যে কতো বার কেঁদেছেন?
বঙ্গবন্ধু : বহুবার...
ফ্রস্ট : এসব নিষ্ঠুর ঘটনার কথা শুনলেই আপনার কেমন মনে হয়?
বঙ্গবন্ধু : মি. ফ্রস্ট, বিশ্বাস করুন, যখনই আমার পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়ে—আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। আমার চোখের পানি বাঁধা মানে না।

আমি ভাবতে পারি না মানুষ হয়ে কীভাবে পাঁচ মাসের, এক বছরের শিশুকে হত্যা করে। কী করে একজন নিরীহ গরিব মানুষের উপর গুলি চালায়। বস্তুত এ যে কতো দুর্ভাগ্যজনক তা কল্পনা করা যায় না। আমি মনে করি জাতিসংঘসহ গোটা বিশ্ব এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে এবং যেমনটি 'নুরেমবার্গ' হয়েছিলো যুদ্ধ অপরাধী ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে, এক্ষেত্রে অনুরূপ বিচারের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অবশ্যই তদন্তের প্রয়োজন, আমি মনে করি জাতিসংঘ তা করবে। আমার কোনো আপত্তি নেই, তারা আসুক, তারা তদন্ত করুক। তবে অপরাধীরা শাস্তি পাবেই—এ বিষয়ে কোনো আপোস নেই। মি. ফ্রস্ট, বন্ধু আমার। বিশ্বাস করুন, আমি সব সময় ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু ভুলতে পারিনে। এরা আমার মানুষের উপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে—এ কথা মনে পড়লেই আমি অস্থির হয়ে পড়ি। আমার বাকশক্তি থাকে না। আপনি কেন আমাকে ঐ ছবি দেখাতে গেলেন। বিশ্বাস করুন, একথা মনে পড়লে আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলি। এ মুহূর্তেও আমার পক্ষে আর কথা বলা সম্ভব নয়।

ফ্রস্ট : আমি ভাবছি আমি কেনই বা এসেছিলাম এবং এ বিশাল জনগোষ্ঠীরও বা কী হবে?

বঙ্গবন্ধু : আপনি নিজেই হাজার হাজার মৃতদেহ দেখেছেন। তারা পরিখা খনন করেছিলো এবং হাজার হাজার লোককে হত্যা করে সেখানেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এমন কি অনেকে একেবারে মারা যায় নি তাদেরও সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং তারা সেখানে ধুকে ধুকে মারা যায়। (তিনি উচ্চস্বরে বলা শুরু করলেন) আপনি মানব ইতিহাসে নিশ্চয়ই এ ধরনের দুর্ঘটনার সংবাদ শোনেন নি। মানবতার কাছে, বিশ্বের কাছে আমি আমার দুর্ভাগ্যকবলিত মানুষের জন্যে সাহায্য চাই। তা বলে আমার মানুষকে নিয়ে কোনো শক্তিরই রাজনীতি করতে দেবো না। আমার কোনো উচ্চাশা নেই। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। একজন প্রধানমন্ত্রি একজন প্রেসিডেন্ট কিই-বা পেয়ে থাকেন। আমার জীবনে আমি যা পেয়েছি সে তুলনায় তারা কিছুই পান না। আমি আমার জনগণের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি এরপরে আমার আর কিছুই পাবার নেই। আমি এ ভালোবাসা নিয়ে মরতে চাই। এই তো গতকাল আমি একটি হাসপাতালে আমার জনগণকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম আমার আহত মানুষেরা চিকিৎসাধীন। তারা কেউ তাদের হাত, কেউ বা পা হারিয়েছে। তবু তারা আমাকে পেয়ে খুশি—তারা বললো, 'ভাই বন্ধু আমার, কোনো দুঃখ নেই, সবকিছু হারিয়েও তোমাকে ফিরে পেয়েছি।' এ ভালোবাসাকে আপনি হত্যা করতে পারেন?

পঞ্চম অধ্যায় : পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক

মুজিব-ভুট্টো এবং মুক্তিযুদ্ধ : পূর্বাপর ঘটনা

গ্রিক ট্র্যাজেডিতে যেমন একজন নায়ক থাকেন তেমনি এক বা একাধিক প্রতিনায়কও থাকেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যুদ্ধের সময় তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের ধুমায়িত ক্ষোভকে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভে পরিণত করা, সেই বিক্ষোভকে গণআন্দোলনে রূপ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলার কাজটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন যে মানুষটি—তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একাত্তরে তার নির্দেশেই বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং সেই যুদ্ধের পরিণতিই স্বাধীনতা।

আর তাই বলতে হয় যে, ঘটনার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলে প্রতিনায়ক কে ছিলেন? জুলফিকার আলী ভুট্টো। অনেকে তৎকালীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া কিংবা অন্য পাকিস্তানি নেতাদের নাম বলতে চান। কিন্তু তারা ছিলেন পার্শ্বচরিত্র মাত্র। মূল পরিকল্পনাকারী জুলফিকার আলী ভুট্টো। একদা আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরামর্শক ভুট্টো পরবর্তীকালে পশ্চিমপাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর দু জন রাজনীতিক নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর উপর প্রায় একক কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। পূর্বাংশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পশ্চিমাংশে জুলফিকার আলী ভুট্টো। ক্যাম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড ফেরত ভুট্টো রাজনীতিতে আসেন পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক আইয়ুবের হাত ধরে। পরে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রি হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে আইয়ুবকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্ররোচণাও দিয়েছিলেন তিনি। আবার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর আইয়ুব ভারতের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সই করলে ভুট্টো তার বিরোধিতা করেন। ভুট্টো দেখলেন দেশের ভেতরে বাইরে আইয়ুবের গ্রহণযোগ্যতা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। এ সময় তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসে প্রাক্তন বাঙালি আমলা জে.এ. রহিমকে নিয়ে নতুন পার্টি করলেন। নাম দিলেন 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি'। যার মূলমন্ত্র ছিলো ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েম করা।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু কলকাতায়, ছাত্রাবস্থায়। বাংলায় তখন পাকিস্তান আন্দোলনের ঢেউ। মুসলিম ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। আবার দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে প্রথম যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার পুরো ভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। দেশ ভাগোত্তর

ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ৪৮ সালের মার্চে তিনি গ্রেফতার হন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় যোগদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে। এবারে জেল ও জরিমানা দুটোই তাকে ভোগ করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বহিষ্কার করলে সেখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। এরপর থেকে রাজনীতিই হয়ে ওঠে তাঁর পেশা, নেশা ও প্রতিশোধ গ্রহণের চূড়ান্ত হাতিয়ার।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানে প্রথম বিরোধী দল মুসলিম লীগ গঠিত হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পরে তিনি এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে সংগঠনকে নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্যের বাহনে পরিণত করেন। আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। ২৩ বছরের পাকিস্তানি আমলের প্রায় অর্ধেক সময়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জেলে কাটান, তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখনো তিনি ছিলেন পাকিস্তানিদের জেলখানায়। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। সেখান থেকে পাকিস্তান ও তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে পশ্চিম ফ্রন্ট বা পশ্চিমপাকিস্তানে। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরও ছিলো সেখানে। পূর্ববাংলায় সে সব সৈন্য ছুটি কাটাতে এসেছিলেন, কিংবা অবসর জীবনযাপন করতেন তাদেরও ডাক পড়ে পশ্চিম ফ্রন্টে। যুদ্ধের কারণে দেশের দু অংশের মধ্যে প্রায় সকল যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে ভারত পূর্বাঞ্চলে হামলা চালালে তা প্রতিহত করার কোনো উপায় ছিলো না। বাঙালি উপলব্ধি করলো পশ্চিমপাকিস্তান কখনো তাদের নিরাপত্তা দেবে না, তাদের নিরাপত্তা নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নিজস্ব বাহিনী। নিজস্ব প্রশাসন, এর কোনো বিকল্প নেই।

এ ছাড়া দেশের দু অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো। কেন্দ্রীয় সরকারের নামে সবকিছু পুঞ্জিভূত করা হতো পশ্চিমপাকিস্তানে। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালি ছিলো চরম অবিচারের শিকার। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা পূর্ব ও পশ্চিমের এ পর্বত প্রমাণ বৈষম্যের বিষয়টি বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরেন। এর কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক রেহমান সোবহান 'এক দেশ দুই অর্থনীতি' নামে একটি বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধ লিখে গোটা পাকিস্তানে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ঘুমন্ত বাঙালির মধ্যে চৈতন্য দেখা দেয়। পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনেও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হয়। বাঙালি উপলব্ধি করে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই তাদের চরমভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এ সময়ে তারা নতুন কিছু চাইছিলো। জাতির আকাঙ্খাকে ধারণ করে এমন উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি। পাক-ভারত যুদ্ধের ৩ মাস পর লাহোরে বিরোধী দলের আহুত বৈঠকে আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পেশ করলেন বাঙালির মুক্তিসনদ নামে খ্যাত ৬ দফা কর্মসূচি। দলের শীর্ষ পর্যায়ের দু চারজন ছাড়া কেউই

এ কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু জানতেন না। লাহোর বিরোধী দলের বৈঠকে ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় পশ্চিমপাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে। বৈঠকে এ নিয়ে কোনো আলোচনা করতে রাজি হন নি তারা। বৈঠকের বাইরে পাকিস্তানি নেতারা ছয় দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা' বলে আখ্যায়িত করলেন। ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের কাউন্সিলে ৬ দফা কর্মসূচি অনুমোদন করিয়ে দিয়ে সারা পূর্ববাংলায় প্রচারাভিযান শুরু করেন। এখন ৬ দফা যতোই অহিংস ও নিরীহ মনে হোক না কেন সে সময়ে পাকিস্তানে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেবেন বলে ঘোষণা দিলেন। মূলধারার পত্রিকাগুলো ৬ দফার পূর্ণবিবরণ ছাপতে সাহস পেলো না। এ অবস্থায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্পাদিত সান্ধ্য 'দৈনিক আওয়াজ' প্রথম ছয় দফা কর্মসূচির বিবরণ প্রকাশ করে।

শুরুতেই এটি নতুন দফা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। কেউ বলেছেন, কিছু নয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায়ও ব্যাপকতর স্বায়ত্বশাসনের কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কোনো কৃতিত্ব নেই। তিনি জানতেন পাকিস্তানি শাসকরা কখনোই এটি মেনে নেবেন না। ফলে ৬ দফা হলো একটি অবাস্তব কর্মসূচি। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কী ছিলো সেই ৬ দফায়? ছয় দফায় এমন কিছু ছিলো যেটি ২১ দফায় নেই। দফাওয়ারি বিশ্লেষণ না করেও বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে যে কথাটি বলা যায়, সেটি হলো এ প্রথম একজন বাঙালি নেতা পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকদের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, দেশ শাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে। বলেছেন, আমরা এখানে ৫৬ ভাগ মানুষ তোমরা ওখানে ৪৪ ভাগ মানুষ—একসঙ্গে বসবাস করলে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। একটি চুক্তিতে আসতে হবে। আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। অর্থাৎ ছয় দফা হলো একত্রে বসবাস করার চুক্তি। পশ্চিমা যে সব দেশে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি আছে সে সব দেশে হয়তো ৬ দফা অবাস্তব নয়, আমেরিকার বহু রাজ্য ৬ দফার চেয়ে কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই এ ধরনের ব্যবস্থায় রাজি হবে না। আজকের কাশ্মির ও তামিল সমস্যার পেছনে আছে জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বাধিকার ও স্বশাসন থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস। এ কারণে ৬ দফার অভিনব হলেও অবাস্তব নয়।

৬ দফার কথা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বরাবরই শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো পশ্চিমপাকিস্তান। বিশেষ করে পাঞ্জাবি সামরিক ও বেসামরিক আমলারা যেভাবে চাইতেন সেভাবে দেশ শাসিত ও পরিচালিত হতো। প্রথমে তারা আঘাত করলেন বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। তারপর আঘাত করলেন প্যারিটিব নামে সংখ্যাসাম্য চাপিয়ে দিয়ে। এরপর নড়বড়ে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিলো তাও বাতিল করে দিয়ে চাপানো হলো জবরদখলকারী সামরিক শাসন। ছয় দফা ঘোষণার পর প্রথমবারের মতো

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের কাছ থেকে সত্যিকার এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো, এতোদিনকার কায়েমি শাসন ও শোষণের ভিত নড়ে উঠলো।

১৯৬৬ সালে যখন ৬ দফা ঘোষিত হয় তখনো জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রি। পশ্চিমপাকিস্তানের অন্যান্য নেতার মতো তিনিও এর ভেতরে পাকিস্তান বিভক্তির বীজ দেখতে পেলেন এবং ৬ দফা নিয়ে সরাসরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রকাশ্য বাহাসে অবতীর্ণ হতে চাইলেন। আওয়ামীলীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জানালেন ভুট্টো সাহেব যখন যেখানে চান আমরা বাহাসে বসতে রাজি আছি। আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের কঠোর মনোভাব দেখে ভুট্টো পিছু হটলেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার যারা ৬ দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিলো তাদের পেছনে ভুট্টো ও অন্যান্য পাকিস্তানি নেতার মদদ ছিলো। কোনো কোনো রাজনীতিক একে সি.আই.এ-র দলিল বলে অভিহিত করতেও কার্পণ্য করেন নি। সম্প্রতি হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাকিস্তানে সেচ্ছা নির্বাসিত দুই বাঙালি নেতা নুরুল আমিন ও মাহমুদ আলী ছয় দফাকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের মতিষ্কজাত বলেও দাবি করেছেন। তাদের এ দাবির পেছনে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ছাড়া কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। যে ৬ দফার আন্দোলন আইয়ুবের পতন ঘটিয়েছে সেই ছয় দফার প্রণেতা তার বিশ্বস্ত তথ্যসচিব হন কী করে? এ সব বাঙালি নেতা কখনো দেশবাসীর আকাঙ্খাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। ক্ষমতার জন্য তারা আজীবন পশ্চিমাদের তোয়াজ করে চলেছেন, শেষমেষ জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তানকেই নিজের দেশ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

সমসাময়িক অন্য বাঙালি নেতারা ৬ দফার মর্মার্থ না বুঝলেও পশ্চিমপাকিস্তানি নেতারা ঠিকই বুঝেছিলেন। লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলন ভেঙে যায় ৬ দফার কারণেই। পশ্চিমপাকিস্তানি নেতারাও আইয়ুবের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন কিন্তু তারা কায়েমি স্বার্থ ত্যাগ করতে চান নি। রাজি হন নি ক্ষমতা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বাঙালির ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিতে। এ কারণেই আইয়ুব অস্ত্রের ভাষায় ৬ দফাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলে পশ্চিমপাকিস্তানের কেউ টু শব্দটি করেন নি। ছয় দফা ঘোষণার অব্যবহিত পর ১৫ মার্চ চট্টগ্রামে একজন সভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঘোষণা করেন,

'পাকিস্তান ধ্বংস করার অজুহাত হলো ৬ দফা। এটি একটি বীভৎস স্বপ্ন এবং যুক্তবাংলার পক্ষে একটি অবাস্তব কল্পনা বিলাস। এ কর্মচূচি পূর্বপাকিস্তানিদের দাসে পরিণত করবে।'

৬ দফা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যখন তীব্র বাদানুবাদ চলছিলো দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের কয়েকজন প্রবীণ নেতা মিলে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' নামে একটি জোট গঠন করেন। এ জোটে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আজগর খান ও ওয়ালি খান এবং পূর্ববাংলা থেকে নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী প্রমুখ ছিলেন। জোট আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। জোট নেতারা আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান

জানালে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, ৬ দফার ব্যাপারে কোনো আপোষ নয়। তবে নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের একটি অংশ জোটে যোগ দেয়। তারা পরবর্তীকালে পি.ডি.এম পন্থী আওয়ামীলীগ হিসেবে পরিচিত হন। ৬ দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিজের ভাষ্য হলো :

'১৯৬১ সালে আমার দেশবাসী জানতে চায়, পরিষ্কার রাস্তা কোথায়? বাঙালি চায় কি? তাদের সামনে কী আছে? তখন 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান' নামে একটা পদার্থ ছিলো। ফান্ডামেন্টাল রাইট ছিলো না, আইয়ুবের শাসন চলছিলো তখন বাংলার মাটিতে। অত্যাচারের স্টিম রোলার চলছিলো বাংলার মাটিতে—আমাদের চোখের সামনে। আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে বসলাম—পরিষ্কার রাস্তা দিতে হবে। বাংলার মানুষকে এভাবে শোষিত হতে দিতে পারি না। মানুষকে একদিন মুক্ত করতে হবে। পরিষ্কার রাস্তা হিসেবে ৬ দফা দেওয়া হলো। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করবেন বলে হুমকি দিলেন। আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন ছয় দফা আওয়ামী লীগ কেন দিয়েছে? এর পেছনে উদ্দেশ্য কী? পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে পেছনে উদ্দেশ্য কী?

(১৯৭৪ সালে আওয়ামীলীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলে দেওয়া ভাষণ)

গবেষক-কূটনীতিক আবুল মাল আবদুল মুহিত তার 'বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব' গ্রন্থে লিখেছেন,

'১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধই অবশেষে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রাণসঞ্চার করলো। বাংলাদেশকে পুরোপুরি অরক্ষিত রেখে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কাশ্মিরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে মেতে উঠলো। ২০ লাখ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে ৭ কোটি বাঙালির জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা। পাকিস্তান পূর্বপকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিলো না। ১৭ দিন এদেশের মানুষ ভিত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন যাপন করে।'

ঠিক এ ঘটনার ছয় মাস পরে ১৯৬৬ সালের ১৫ মার্চ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টা সর্বপ্রথম জানালেন যে,

'পূর্বপাকিস্তানের নিরাপত্তার দুটি পরাশক্তির আলোচনার বিষয় ছিলো। ... সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কূটনীতিবিদরা পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারসতে পূর্বপাকিস্তানের নিরাপত্তা বিষয়ে অবস্থা গ্রহণ করেন।'

কি অদ্ভুত কাণ্ড! যুদ্ধ হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, প্রতিপক্ষের অস্ত্র তাক করে আছে পূর্ববাংলার সীমান্তে। আর দুই পরাশক্তি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে ওয়ারসতে। ভুট্টোর এ হাস্যকর যুক্তির জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন,

'পূর্বপাকিস্তানকে ১৭ দিনের যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লেফ্‌ট রাইট করে হেঁটে যেতো তবুও তাদেরকে বাঁধা দেওয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ববাংলার ছিলো না। আর চীনই যদি আমাদের রক্ষা কর্তা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে চীনের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধলেই হয়।'

আমেরিকান গবেষক লরেন্স জিরিং এ সম্পর্কে লিখেছেন *'The west Pakistani opposition leaders rejecred Mujib's plan interpreting it was a seocessic-nist and henee outside the purview of their deleberations ... the Awami League programme pointed up the semi-independent character of East Pakistan and the Six demand were judged fundamental to a healthy rela-tionship with in and between the provinces. But the west Pakistanis world have none of this and the Ayub Government joined with the politicians in continuning the proposal.*

(Bangladesh : from Mujib to Ershad : An inter-pretive Study)

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬ দফার মিল আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ৫৪ সালে ২১ দফার প্রণেতারা অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই কেবল জড়িয়ে পড়লেন না, তারা নানাভাবে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোস করতে থাকলেন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক—যিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রি ছিলেন, কলকাতায় দুই বাংলার অভিন্নতা সম্পর্কে আবেগপ্রবণ মন্তব্য করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী দ্বারা বরখাস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গভর্নর পদ টিকিয়ে রাখতে আবার সেই শাসকদের তোয়াজ করেছিলেন, একুশ দফার অন্যতম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা ভুলে গিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ঠ পশ্চিমপকিস্তানিদের সঙ্গে 'প্যারিটি' গড়ে তুলেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হওয়ার পর পূর্ববাংলার ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। ২১ দফার সবচেয়ে সাহসী নেতা মওলানা ভাসানী তখন নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে অবিচল থেকেছিলেন সত্য, কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের *'আসসালামু আলাইকুম'* বলেছিলেন এ কথাও কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে এ বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিক আইয়ুবের বিশেষ দূত হয়ে চীন সফর করেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন 'ডোন্ট ডিসটার্ব আইয়ুব।' এরা তিনজনই আমাদের জাতীয় নেতা এবং বিভিন্ন সময় বাঙালির স্বাধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। গণতন্ত্রের সংগ্রামেও তারা জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন। তারপরও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় পশ্চিমপাকিস্তানিদের সঙ্গে আপোস রফা করতে সচেষ্ট ছিলেন। ৬ দফা প্রণয়নকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেটি করে নি অথবা করার সুযোগ পান নি।

৬ দফা পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতি ছিলো মূলত প্রস্তুতিপর্ব। নিজেকে গড়ে তোলার। যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামীলীগ সরকারে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিও হয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিত্ব তাঁর লক্ষ্য ছিলো না, তাঁর লক্ষ্য ছিলো আওয়ামীলীগকে নিজের মতো করে গড়ে তোলা। মওলানা ভাসানী কিংবা সোহ্‌রাওয়ার্দী দলের প্রধান থাকতেও তিনি ছিলেন দলের মধ্যমণি, দলকে সংগঠিত করতে অনেক সময়ে নীতির বাইরেও কাজ করেছেন। দল ও কর্মীদের ব্যাপারে তার এ অন্ধ আনুগত্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিলো। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তার ছিলো

অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ, কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় বলতে গেলে সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতিতে আসা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ৫৬ সালে সংখ্যা সাম্যভিত্তিক সংবিধান মেনে নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তাতে আপত্তি ছিলো। সোহরাওয়ার্দী বেঁচে থাকতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু না বললেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে তিনি তা প্রকাশ করেছেন।

১৯৬৪ সালে এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'সেদিন পশ্চিমপাকিস্তানিদের বিশ্বাস করে আমাদের নেতা সোহরাওয়ার্দী প্যারিটি মেনে নিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে তাদের কথায় বিশ্বাস করা ভুল হয়েছে। আজ আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই। এ জনসভায়ই আইয়ুবের মন্ত্রি খান এ. সবুরকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আরো বলেছিলেন,

'মন্ত্রি ভায়া', বাংলার ইতিহাস আপনি জানেন না। এই বাংলা মীরজাফরের বাংলা। আবার এই বাংলাই তিতুমীর, সুভাষ, নজরুল, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ইসলামাবাদীর বাংলা। এই বাংলা যদি একবার রুখে দাঁড়ায় তবে আপনাদের সেপাই বন্দুক কামান গোলা সবই স্রোতের শ্যাওলার মতো কোথায় ভেসে যাবে হদিসও পাবেন না।'

(১২ জুলাই ১৯৬৪ সাল, জুলুম প্রতিরোধ দিবসে দেওয়া ভাষণ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন স্বৈরশাসক আইয়ুবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত ভুট্টো তখন আইয়ুবের মন্ত্রি। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান এক আদেশ বলে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে যে অভিনব শাসন পদ্ধতি দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার পরামর্শদাতা ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা জেলে। অনেকে মুচলেকা দিয়ে বেরিয়ে এলেও মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আসেন নি। ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ুব এ মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমপাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলন শুরু করে। এ সময়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করলে পূর্ববাংলায় ছাত্রগণ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

২৪ জুন ৯ জন রাজনৈতিক নেতার যুক্ত বিবৃতি দেন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আইয়ুব প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিলের দাবিতে। এ বিবৃতিতে সাক্ষর করেন নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, মাসুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) এবং পীর মোহসেন উদ্দিন। ছাত্রগণ আন্দোলনের মুখে ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর আওয়ামীলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাআতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এনডিএফ)। মূলত সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এ ফ্রন্টের উদ্যোক্তা। তার জীবদ্দশায় আওয়ামীলীগ পুনরুজ্জীবিত হয় নি। ১৯৬৪ সালে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে সভাপতি

ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামীলীগ পুনর্গঠন করা হয়। ভিন্ন মতের কারণে তখন আওয়ামীলীগের অনেক প্রবীণ নেতা এর বিরোধিতা করে দল ত্যাগ করেন।

এ সময়ই পূর্ববাংলায় আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কাশ্মিরে রক্ষিত হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর কেশ চুরিকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। সে ঘটনার ঢেউ এসে লাগে পূর্ববাংলায়ও। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আইয়ুব সরকার তার বিরুদ্ধে গণরোষ প্রশমিত করতে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সরকারি মদদে সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ঢাকায় দাঙ্গা রোধ করতে গিয়ে প্রাণ হারান প্রগতিশীল সমাজকর্মী আমির হোসেন চৌধুরী। সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল সংগঠন সংবাদপত্র বুদ্ধিজীবীরা এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। 'পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি রাজপথে মিছিল বের করে, পত্রিকায় অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ সময়ে দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বান ছিলো,

'পূর্ববাংলার মানুষের জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমি পূর্ববাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি। প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন। পূর্বপাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করুন।

(অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জল বঙ্গবন্ধু তার পরিবার ও আমি-মমিনুল হক খোকা)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামীলীগের উপর শাসক গোষ্ঠীর চরম আঘাতটি আসে ৬ দফা ঘোষণার অব্যবহিত পরই। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে ৬ দফা প্রথম উত্থাপিত হয়। পরে মার্চের কাউন্সিলে ৬ দফাকে অনুমোদন করিয়ে নেন বঙ্গবন্ধু। সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতিতে তিনি তখন দলের প্রায় একক কর্তৃত্বের অধিকারী। এ কাউন্সিলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামীলীগের সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কাউন্সিল শেষ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারা দেশে ৬ দফার পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু করেন। কিন্তু তাঁর প্রচারাভিযান বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনসভা করতে যান সেখানেই মোনেম খানের পুলিশ তাড়া করে, জনসভা থেকে ফেরার পথে তাঁকে গ্রেফতার করে। আদালতের জামিন নিয়ে বেরিয়ে এলে পরবর্তী জনসভাস্থলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রতিবারই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য রাখার অভিযোগ আনা হয়। মাস খানেকের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৫-১৬টি মামলা হয়। এমন কি তাকে একবার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে ফের গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এ সময়ে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান দম্ভ করে বলেছিলেন, 'আমি যতোদিন গভর্নর আছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ততোদিন জেলেই থাকতে হবে।'

আরেকটু পেছনের কথা

বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির বাঁশের কেল্লা গঠন করে ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গঠন করেছিলেন একাধিক গুপ্ত সশস্ত্র বাহিনী। এ বাহিনীর নেতা সদস্য ছিলেন বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকি প্রমুখ। তা ছাড়া আমরা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বাদল, দীনেশ-এর নামও জানি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কিশোর ক্ষুদিরাম ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। ত্রিশের দশকে চট্টগ্রামে মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে যুববিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিলো। তারা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য শক্তিশালী ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে তারা পরাস্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দেশ থেকে পালিয়ে জার্মানি হয়ে জাপানে গিয়ে গঠন করেছিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে সবাই এ বাহিনীতে ছিলেন এবং জাপানের সহায়তায় তারা যুদ্ধ করে ইম্ফল পর্যন্ত এসেছিলেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের মুখে নেতাজী সুভাষ বসুও অন্তর্ধান হয়ে যান। তার অন্তর্ধান রহস্য আজো উন্মোচিত হয় নি। সুভাষ চন্দ্র বসু'র এ সংগ্রামকে ভারতীয় বামপন্থীরা অবমূল্যায়ন করেছিলেন। তারা তাঁকে 'ফ্যাসিবাদের সহায়তাকারী' হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে বামপন্থীরা সুভাষ চন্দ্র বসুর পূণর্মূল্যায়ন করে তাঁকে একজন 'শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবী নন, তিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। তা সত্বেও সুভাষ বসু সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো অতি উচ্চ। তিনি যখন কলকাতায় অধ্যয়নরত তখন সুভাষ বসু'র হলওয়েল আন্দোলন বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সদল বলে যেতেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। কলকাতা নিবাসী বামপন্থী কবি গোলাম কুদ্দুস এক সাক্ষাকারে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। বামপন্থীদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরূপ ছিলেন না। তবে তিনি সবসময়ই তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলতেন, 'বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে থেকেই তাদের কল্যাণ করা বা অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাদের বাদ দিয়ে নয়।'

১৯৪৮ সালের পূর্বে পি.সি. যোশীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যে পন্থা নিয়েছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে সমর্থন করতেন, কিন্তু রনদিভের সশস্ত্র লাইন তিনি মেনে নিতে পারেন নি। স্বাধীনতার আগে ও পরে তাঁর বাহু বক্তৃতা বিবৃতিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের প্রতি পাকিস্তানি সরকার যখন পৈশাচিক নির্যাতন চালায় কিংবা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য সরদার ফজলুল করিম যখন পাকিস্তানি পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন তখন তিনি কঠোর ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তাদের পথ অনুসরণ করেন নি। ১৯৭৪ সালে আওয়ামীলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে নিজের অতীত রাজনৈতিক

অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,

'১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে 'ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। উদ্দেশ্য শোষক গোষ্ঠীকে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু আমরা এগুতে পারলাম না। অনেক সময় থিওরি ও প্রাকটিসে গণ্ডগোল হয়ে যায়। ... তখনকার দিনে একদল লোক এ ধরনের থিওরির অনুসারী ছিলো। এ সময়ে পি.সি. যোশীকে সরিয়ে রনদিভে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। আমাদের এখানেও কিছু সংখ্যক কর্মী বুঝতে না পেরে সেই পন্থা অবলম্বন করতে গেলেন। আমাদের সাথে তাদের অমিল হলো। আমরা বললাম দেশের মানুষকে না গড়ে তুলে, দেশের মানুষকে মবিলাইজ না করে এবং পপুলার আদর্শ না দিয়ে চলা যায় না। তারা বুঝতে পারলেন না। ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ ভেঙে গেলো।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাস্তবতা

এ পটভূমিতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা কীভাবে নিরূপিত হবে? আগরতলা ষড়যন্ত্র ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান চেষ্টা। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সেনা সশস্ত্র বাহিনীর ভেতর বিরাজমান বৈষম্যের কারণে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এ ক্ষুব্ধ অফিসার এবং সেনারা গোপনে বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত হতে থাকেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে থেকে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষা কখনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে এ সেনা সংগঠনটি একটি লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, আর তা হলো সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করে ফেলা। এ লক্ষ্যে তাদের কর্মসূচি নিয়ে কঠোর গোপনীয়তায় তারা কাজ করতে থাকেন। এ কর্মসূচিকে সফল করতে তারা কয়েকজন বাঙালি বেসামরিক আমলা ও জনপ্রিয় রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন।

(বঙ্গবন্ধুর দুটি ঐতিহাসিক মামলা জেরা ও জবানবন্দি)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজে আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। অভিযোগের জবাবে ১৯৬৮ সালে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন,

'কেবলমাত্র আমার উপর শারীরিক নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। এই ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায় সংগত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। ... অধিকন্ত স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে, এই মামলা তাহারই বিশেষ প্রতিক্রিয়া। আমি কখনো এমন কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল নৌ বা বিমান বাহিনীর কর্মচারীর সংস্পর্শে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আমি নিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

অবশ্য দেশদ্রোহিতামূলক কোনো মামলার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এ বিবৃতিকে সর্বাংশে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। যে কোনো মামলায় আসামীপক্ষ বরাবরই অভিযোগ অস্বীকার করে থাকেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অন্যতম আইনজীবী ও এককালীন রাজনৈতিক সহকর্মী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন,

'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর যে মুজিবকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো, তিনি তখন কোনো অপরাধ করেন নি বলে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালিদের কাছে তিনি একজন সম্মানিত আত্মবলিদানকারীর মর্যাদা লাভ করতে থাকেন।'

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন আসামীর উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরো জানান,

'তাদের পরিকল্পনার সফল প্রভাবের জন্য পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা এবং সিভিল সার্ভিস অফিসারদের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিলো। কাজেই তারা রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য নির্ভীক জাতীয়তাবাদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কয়েকজন বাঙালি আমলার সংস্পর্শে আসেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বভাবতই জানতেন যে, তাঁর দলের শক্তি এই ছোট গ্রুপটির চাইতে অনেক বেশি। তাই তিনি তাদের উপর এক ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

যেহেতু তারা পূর্বপাকিস্তানের স্বার্থে কথা বলছিলেন তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের সমর্থন না জানিয়ে পারেন নি। তাদের তৎপরতার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুজিব তাদের আর্থিকভাবেও সাহায্য করেছিলেন।'

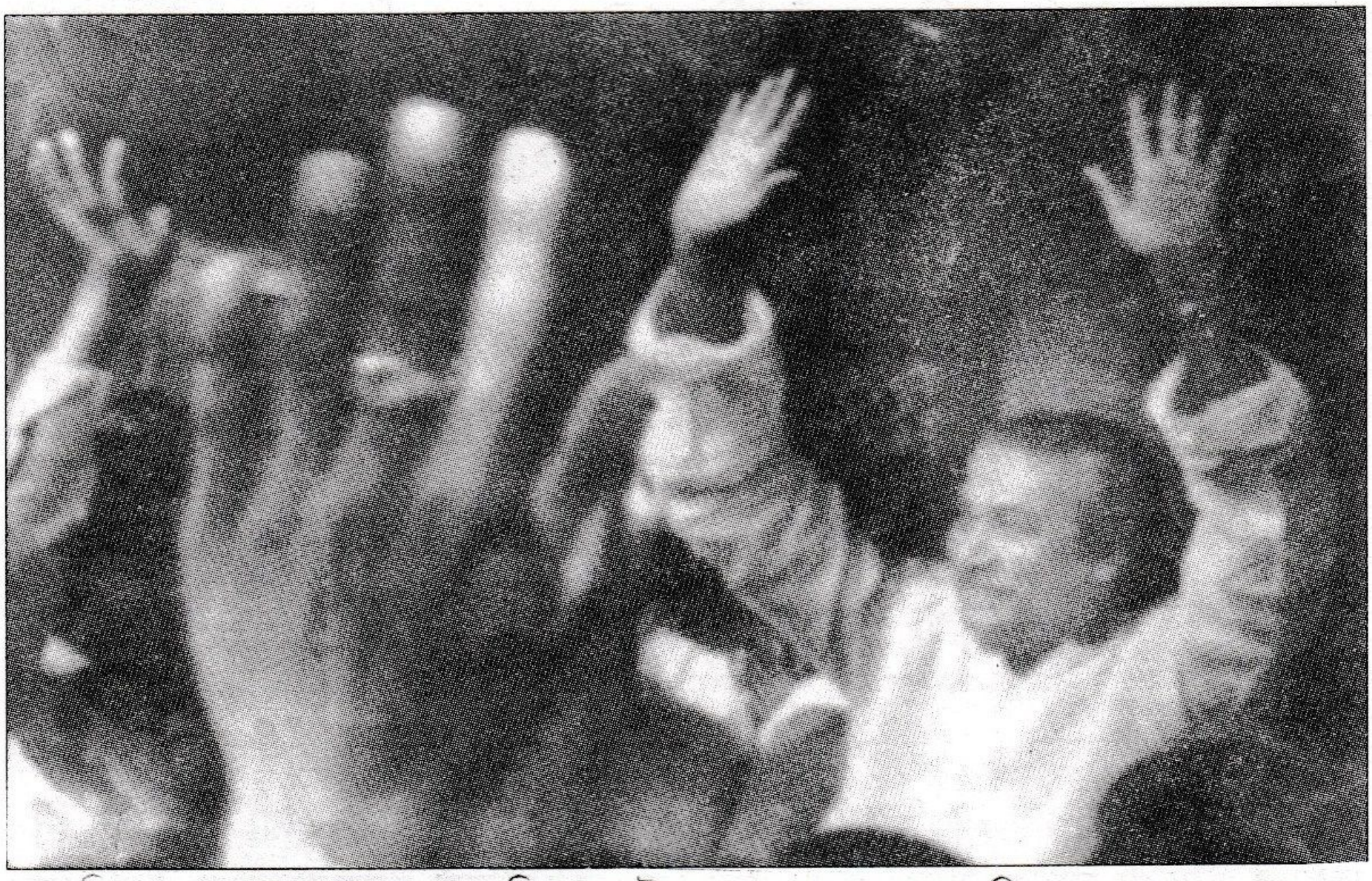
এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনেক আগে ১৯৬২ কি ৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের সাহায্যে পাওয়ার প্রত্যাশায়। ভারতীয় মিশন ও আগরতলা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে নাকি নয়া দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিলো। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগী ও আত্মীয় মমিনুল হক খোকার ভাষ্য হলো,

'মিঞাভাইর গতিবিধির ওপর সরকারের কড়া নজর। প্রায় সর্বত্র গোয়েন্দা পুলিশের চরদের সাদা পোশাকে আনাগোনা, যে কোনো মুহূর্তে আমরা তাঁর গ্রেফতার আশঙ্কা করছি। বিরোধী মহল চিন্তিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে আন্দোলন ঝিমিয়ে যাবে। বিরোধী দলের চরমপন্থী গ্রুপের কয়েকজনের সঙ্গে মিঞাভাইয়ের বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন উনি দেশত্যাগ করবেন। প্রথমে ভারত, তারপর সেখান থেকে লন্ডনে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবেন। আর একই সঙ্গে বিশ্বজনমত গড়ে তুলবেন, যেমনটি করেছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।'

এ অন্তর্ধান পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনজন। তারা হলেন প্রয়াত রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও সিলেটের চা বাগানের মালিক মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগরতলা সফর সম্পর্কে ত্রিপুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রি শচীন্দ্রলাল সিংহের বক্তব্য হচ্ছে :

'১৯৬৩ আমার ভাই এম.এল.এ. শ্রী উপমেশ লাল সিং সমভিব্যাহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকার-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রি পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রী শ্রী রমন চীফ সেক্রেটারি। তাকে (শ্রী রমনকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রির সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতো বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন।'



চিত্র : ১০। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই আবার জনতার মাঝে ফিরে যেতেন বঙ্গবন্ধু।

অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আগরতলা মিশন সফল হয় নি। অন্যান্য গবেষক ও সহকর্মী রাজনীতিকরা শচীন্দ্র লাল সিংহের বক্তব্য সমর্থন করেন নি। তাদের মতে, সীমান্ত পার হয়ে ত্রিপুরায় ঢুকতেই বি.এস.এফ. তাঁকে নজরবন্দি করে এবং আগরতলায় একরাত কাটিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। যে ব্যক্তির মাধ্যমে দিল্লিতে যোগাযোগ করার কথা ছিলো তিনি যোগাযোগ করতে পারেন নি। তাছাড়া ভারত সরকারও সে সময় চীনের বন্ধু পাকিস্তানের সঙ্গে এ রকম একটি বিরোধে যেতে চায় নি। কয়েক মাস আগে চীন-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে তখন পূর্ববাংলায় এ ধরনের গোপন অভিযান এবং তৎপরতা আরো অনেক ঘটেছে। কোনোটি রাজনৈতিক দলের নামে, কোনোটি বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে।

১৯৫৯ সালে জামালপুরে একদল যুবক গঠন করে 'পূর্ববাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনের নেতা আলী আছাদও গিয়েছিলেন প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং মেঘালয়ে। সেখানে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। পাকিস্তানি গুপ্তচর বলে ভারতীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন। পরে তাদের নামে পাকিস্তান সরকারের গ্রেফতারি পরোয়ানার কথা জানানো হলে পুলিশ ছেড়ে দেয়। পরে আলী আছাদ দেশে ফিরে ছদ্মবেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার সংগঠনের প্রচারপত্র বিলি করে ও লোকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে ময়মনসিংহ যান। সেখানে কর্মীরা তাঁকে আছাদের কথা জানালে তিনি তাকে প্রকাশ্যে এসে কাজ করার জন্য বলেন। কিন্তু আলী আছাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

এ-রকম বহু ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগ ছিলো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং তাদের ধারণা ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস' বলে পরিচিত গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাও এ সময়ে। কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় মহকুমায় নিউক্লিয়াসের শাখা গড়ে ওঠে। সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমদ ছিলেন এ গ্রুপের উদ্যোক্তা।

এ সময়ের আরেকটি ঘটনা। ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়ার মধ্যস্থতায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট তিন কেন্দ্রীয় নেতা মণি সিংহ, খোকা রায় প্রমুখের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। কমিউনিস্ট নেতারা কাজ করেন আন্ডার গ্রাউন্ডে, তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ন্যাপ ও আওয়ামীলীগের সঙ্গে ও যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে বসেছিলেন ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক করণীয় স্থির করতে। তিনি বললেন, 'এখনই আমাদের স্বাধীনতার কথা ভাবা দরকার। ওদের সঙ্গে আর থাকা যায় না।' স্বভাবতই এ কথায় কমিউনিষ্ট নেতারা খুশি হন নি। তাদের উদ্দেশ্য সমাজ বদল, দেশ বদল নয়। কমিউনিস্ট নেতারা তাঁকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'এখনই নয়।' জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'আপনাদের কথা মেনে নিলাম। কিন্তু একমত হলাম না।'

স্বাধীনোত্তর কালে ভূট্টো ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্ক

১৯৭১ সালের ঘটনাবলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কেবল বিজয়ী নেতা হিসেবেই অভিষিক্ত করে নি, তিনি হয়ে ওঠেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পরিত্রাতা। মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানি শাসকদের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে বাংলাদেশে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের সঙ্গে ক্ষীণ যে যোগসূত্র রাখতে চেয়েছিলেন সামরিক অভিযান ও ভুট্টোর কূটকৌশল

২৫ মার্চ রাতেই তার যবনিকা টানে। দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ কালে পাকিস্তানিদের জিন্দানখানায় বন্দি থেকেও তিনি হয়েছিলেন বিজয়ী বীর। আর দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীর চালক হয়েও ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রকে পরাজয়ের গ্লানি বইতে হয়েছিলো। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনোই পাকিস্তান ও পাকিস্তানি কোনো নেতার প্রতি বৈরি আচরণ করেন নি। এমন কি তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ঘোষণা দিয়েও তা থেকে পিছিয়ে আসেন উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে রমনা রেসকোর্স ময়দানের দেওয়া ভাষণেও তিনি অভিযোগহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, *'পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন–সম্ভব হলে আমি যেনো দু দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম আমার জনগণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম প্রাণ দেবে।'*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টোকে শান্তিতে থাকার পরামর্শ দিলেও ভুট্টো তার কথা শোনেন নি। তিনি বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। প্রথমে তিনি পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালি নেতাদের এ কাজে লাগান। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে বোঝাতে থাকেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না। বাংলাদেশ আসলে ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্য। সে সময়ে রেডিও পাকিস্তান এবং পাকিস্তান টেলিভিশন থেকেও অহরহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হতো। এ দুটি প্রচার মাধ্যম থেকে প্রায়শ ভুট্টো বাংলার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আবেদন জানাতেন। এ অপপ্রচারের জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি এক সমাবেশে বলেছিলেন,

'ভুট্টো সাহেব নারাজ হয়ে গেছেন। তিনি আবোল-তাবোল বকছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলি-বিকুলি করছেন। আমি বলেছি আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। তারপর এসব বিবেচনা করে দেখবো। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন নাকি! তিনি আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। যারা আমার মা-বোনের উপর অত্যাচার করেছে, যারা পশুর মতো আমার জনগণকে হত্যা করেছে, যারা নিরাপরাধ কৃষক শ্রমিক ছাত্রকে হত্যা করেছে তাদের বিচার করলে নাকি তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব শুনে রাখুন। তাদের বিচার বাংলার বুকে অবশ্যই হবে। ভুট্টো সাহেব আমার ৪ লাখ বাঙালিকে আটক রেখেছেন, তারা নিরাপরাধ, কিছুই করে নাই। তবু তিনি দর কষাকষি করছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমি বাঙালিদের ইনশাল্লাহ বাংলার বুকে ফেরত আনবো। তিনি ঠেকাতে পারবেন না।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। পাকিস্তানে আটক সকল বাঙালিকে তিনি ফেরত নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী বলে চিহ্নিতদের বিচার করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তার বাইরেও একটি বিষয় ছিলো। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে শেষ

পর্যন্ত তিন দেশ জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা আটক ছিলো ভারতের মাটিতে। ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে ভুট্টো সিমলা চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছেন। ফলে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে ভারতেরও সম্মতির প্রয়োজন ছিলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভুট্টোকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। বিপরীত দিকে ভুট্টো কৌশল এঁটেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে। এ জন্য তিনি বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী নেতাদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য ও করেছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ভুট্টোকে লেখা বামপন্থী নেতা আবদুল হক ও জনৈক আবদুল মালেকের চিঠিতে। ১৯৭৪ সালেও আবদুল হক 'আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রি' বলে ভুট্টোকে সম্বোধন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিলেন। ভুট্টো সেই চিঠি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও. আই.সি.) শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরার সুযোগ পান ভুট্টো। তিনি চাইলেন বাংলাদেশও সম্মেলনের অংশ নিক। এর আগেই অবশ্য 'ধর্মনিরপেক্ষ' বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান স্বীকৃত না দেওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্মেলনে যাবেন না বলে জানিয়ে দেন। এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করলো মিসর ও আলজেরিয়া। তাদের অনুরোধে সম্মেলনের মাত্র দু দিন আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভুট্টোর লক্ষ্য ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তার দেশে নিয়ে দেখানো যে বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় নি। অন্যদিকে মুজিব ভেবেছিলেন, এ সম্মেলনে যোগ না দিলে অন্যান্য মুসলিম দেশ তাঁর উপর নাখোশ হবে। তিনি তাদের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না।

১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে ভুট্টো বলেছিলেন, এ উপমহাদেশে শিগগিরই কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে? কী ধরনের পরিবর্তন আশা করেছিলেন ভুট্টো? এর দু মাসের মধ্যে ভুট্টো ১০৭ সদস্যের বিরাট প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। এ সফরেও দু-দেশের মধ্যকার বরফ গলে নি। বঙ্গভবনের ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কাছে দেনা-পাওনার কথা তুললে ভুট্টো শিষ্টাচার বর্জিত ভাষার জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি ব্লাঙ্ক চেক নিয়ে আসি নি।' এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাত্তরের গণহত্যার প্রশ্নটিও তুলেছিলেন। বলেছিলেন, যারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে তারা মানবতার শত্রু। তিনি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর ডায়রি পাতা তুলে দিয়েছিলেন ভুট্টোর হাতে। তাতে লেখা ছিলো 'পূর্বপাকিস্তানকে লাল করে দেওয়া হবে।'

ভুট্টোর সফরসঙ্গী এক সাংবাদিক পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে লিখলেন 'বাংলাদেশে সেনাবাহনীর ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে।' পাকিস্তানের আরেক সাংবাদিক জেড এ সুলেরী লিখলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যতোদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন

বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। সে কারণেই হয়তো ভুট্টো পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পরপরই মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন চিকন চাল ও কাপড়।' বাংলাদেশকে তখন স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তানের দুই ঘনিষ্ঠমিত্র চীন এবং সৌদি আরব। তাই বলা যায় যে, সৌদি আরব কখনোই বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে নি। ইতিহাস অবশ্যই বলে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কোন্‌টি? ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি বক্তৃতা বিবৃতি ছিলো শতভাগ সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির মনে যে প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিলো সেটা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।। শুধু রাজনৈতিক কর্মী নয়, বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল তাঁর দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আওয়ামীলীগ প্রধান থেকে তিনি হয়ে উঠলেন ৫৫ হাজার বর্গমাইল অধ্যুষিত সমগ্র জনগোষ্ঠীর একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। নির্বাচনের আগে যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন নির্বাচনের পর অনেকেই তাঁকে এবং তার ৬ দফাকে এক বাক্যে সমর্থন জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিপক্ষ ছিলো ৩টি। আর তা হলো পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো, পশ্চিম পকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সেনাবাহিনী। ভুট্টো ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি। সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন ইয়াহিয়া খান এবং তার পরিষদবর্গ। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি যে ব্যবস্থা ও কাঠামোয় চলেছে তার সঙ্গে চূড়ান্ত রফা করতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বললেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে এতোদিনকার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে। এখন সম্পর্কটি হবে সমতার ভিত্তিতে। পাকিস্তানে পূর্ব ও পশ্চিম নামে যে দুটি পক্ষ আছে তারা একত্রে বসে ঠিক করবে যে, একসঙ্গে থাকবে কিনা? অথবা থাকলে কীভাবে থাকবে। সে ব্যাপারে নুতন চুক্তি হতে হবে।' বিষয়টি তখন আর ৬ দফার খুঁটিনাটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রইলো না। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতার এ ভাগাভাগিতে বিশ্বাসী নয়, আগ্রহী ও ছিলো না। তারা ভেবেছিলো নির্বাচনটি কোনো রকম পার হয়ে গেলে পূর্বাঞ্চলের উপর যে-কোনো একটি শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যাবে।

অনেকে অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ৬ দফার ক্ষেত্রে দু একটি বিষয় ছাড় দিতেও তাঁর আপত্তি নেই। পাকিস্তানি শাসক ও পণ্ডিতরা এ বিষয়টি বহুবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভুল

কোথায়? ৬ দফা ছিলো তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। জনগণ সেটি কীভাবে নেয় তার উপরই ৬ দফার ভবিষ্যত নির্ভর করে। ৬ দফা নিয়ে আগে থেকে দরকষাকষির কোনো সুযোগ ছিলো না।

যে পাকিস্তানি নেতারা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনড় মনোভাবকে দায়ী করেছেন তারা তো কোনোভাবে ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বরং ৬ দফার পক্ষে যাতে জনগণ সমর্থন না জানায় সে জন্য নানা ফন্দি-ফিকির এঁটেছেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন দিয়েছেন সত্য। কিন্তু তার গোয়েন্দা বিভাগ ৬ দফার বিরুদ্ধে ডানপন্থী দলগুলোকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দাদের রিপোর্টে বলা হয়েছিলো, আওয়ামীলীগ পূর্ববাংলার ৬০ শতাংশের বেশি আসন পাবে না। অর্থাৎ আওয়ামীলীগকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তারা রুদ্ধ করতে চেয়েছে নানা কৌশলে এবং অপকৌশলে। কিন্তু তারা সফল হয় নি কোনোভাবেই।

১৯৭০-এর নির্বাচন নিছক একটি নির্বাচন ছিলো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষায় এটি ছিলো গণভোট। পাকিস্তানিদের সঙ্গে বসবাস করা যাবে কি যাবে না তার জন্য একটি গণ রায়। যদি সাধারণ নির্বাচন হতো এবং ৬ দফায় নিছক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন জড়িত থাকতো তাহলে পি.পি.পি. নেতা ভুট্টো বা পশ্চিমপাকিস্তানের অন্যান্য নেতার অত্যন্ত খুশি হওয়ারই কথা। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন থাকবে আওয়ামীলীগ। পশ্চিমপাকিস্তানের ৪ প্রদেশেই সরকার গঠন করবে সেখানকার দলগুলো। ৬ দফায় ঘোষিত স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ সুযোগ তারাও ভোগ করবেন। কিন্তু পশ্চিমপাকিস্তানের নেতারা এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। তারা ভেবেছেন, বিগত ২৩ বছর কেন্দ্র যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে সেগুলো এখনো করবে, সেভাবে চলবে। ভুট্টো ঘোষণা করেন, পাঞ্জাব ও সিন্ধুই ক্ষমতার 'মূল ভিত্তি'। সেই ভিত্তি মূলেই আঘাত হেনেছিলো ১৯৭০ নির্বাচন। তাই তারা সহ্য করতে পারে নি।

নির্বাচনের পর জানুয়ারি মাসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় ও প্রাথমিক পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেন,

'৬ দফা এখন জনগণের সম্পত্তি। এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার কোনো শক্তি আমার নেই। এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি পাকিস্তানিদের এ কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এতোদিন তোমাদের শর্তে দেশ চলেছে, এখন জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে। অতএব আমাদের শর্তে চলতে হবে।'

নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা সংবিধানের যে খসড়া প্রণয়ন করেন তাতে শাসন ব্যবস্থায় নতুন চুক্তি বা শর্তের কথাই বলা আছে।

নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনড় মনোভাবই সেনাবাহিনী ও পি.পি.পি. নেতা ভুট্টোকে এক সূত্রে বেঁধে দেয়। এদের মধ্যে কে কার উপর বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছে তার সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এ কথা সত্য যে, তারা দু জনই নিজ নিজ স্বার্থে অপরকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন।

সেনাবাহিনী ভেবেছিলো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এলে তাদের কায়েমি স্বার্থ মারাত্মকভাবে খর্ব হয়ে যাবে। অতএব সেই স্বার্থরক্ষার ভুট্টোর কাছে দ্বারস্থ হওয়া। অন্যদিকে ভুট্টো ভেবেছেন ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হলে তাকে বাঙালির অধীন একজন প্রাদেশিক নেতা হিসেবে থাকতে হবে। এ অবস্থা রোধ করতে পারে সেনাবাহিনী। অতএব তিনি তাদের শরণাপন্ন হলেন। ভুট্টোর দল জাতীয় সংসদে যেহেতু এক-তৃতীয়াংশ আসনের কম পেয়েছে সে জন্য তার ভয় ছিলো পাকিস্তানি অন্য নেতাদের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হয়তো সংবিধান অনুমোদন করিয়ে নেবেন। এ কারণে শুরু থেকে তিনি অতি উগ্র কথা-বার্তা বলে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করতে চাইলেন। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলে ভুট্টো সরাসরি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। তিনি নিজে অধিবেশন বয়কট করলেন, পেশোয়ার থেকে করাচি অচল করে দেখার হুমকি দিলেন, পশ্চিমপাকিস্তানের কোনো সদস্য অধিবেশনে যোগ দিতে এলে তাদের পা ভেঙে দেওয়ার কথাও বললেন। অর্থাৎ লোভের মোহে তিনি মরিয়া এবং অন্ধ হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শুরু থেকে ছিলেন ধীরস্থির। প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত নিতেন হিসাব করে। জনচেতনাকে ধাপে ধাপে নিজের পক্ষে আনলেন। নির্বাচনের আগে দক্ষিণাঞ্চলের উপর বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে চরম দায়িত্বহীনতার অভিযোগ তুলে বলেছিলেন 'এখন থেকে বাংলার মানুষকে তার ভালো-মন্দ নিজেকেই দেখতে হবে?' এ সময় একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর কাছে আগ্রহ ভরে জানতে চাইলেন 'তিনি পশ্চিমপাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন কিনা?'

জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন 'Not yet'। অর্থাৎ 'এখনো ভাবি নি।'

ভুট্টোর চাপে জেনারেল ইয়াহিয়া খান একাত্তরের ১ মার্চ যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন তখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন একেবারে ধীরস্থির। তিনি কঠোর ভাষায় জেনারেল ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন এবং ২ ও ৩ মার্চ হরতাল আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, 'আমরা প্রেসিডেন্টের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করছি।' একজন সাংবাদিক তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনি' একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কিনা।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জবাব ছিলো 'অপেক্ষা করুন।'

একদম সত্য কথা যে, এরপর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিমাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তারা শ্লোগান তুলেছেন 'বীর বাঙালি অস্ত্রধরো, 'বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।' তারা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এখানে এক বিচক্ষণ রাষ্ট্র নেতার মতো তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চললেন। মুখে তিনি বললেন না, 'আমরা পশ্চিমপাকিস্তানিদের থেকে আলাদা হয়ে যাবো।' কাজের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনা শাসকদের কাছ থেকে সমগ্র বাংলাদেশের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে

নিলেন। ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশের সব কিছুই চলেছে তাঁর কথায়, তাঁর নির্দেশে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যারাকের বাইরে বের হতে পারে নি। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ভাষণ দিলেন সে ভাষণের শেষে 'জয়বাংলার' সঙ্গে 'জয় পাকিস্তান' বলেছেন কিনা সেটি বিতর্কের বিষয় নয়, বিষয় নয় তিনি স্বাধীনতার কথা কীভাবে বললেন কিংবা আরো সরাসরি বললেন না কেন? ওখানে সাংবিধানিক কৌশল ছিলো।

আসলে ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ হলো অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি। বলেছেন, এরপর ভেবে দেখবো ইয়াহিয়া খান আহুত সংসদে যোগদান করবো কিনা? এক সপ্তাহ আগেও পরিস্থিতি এতোটা তাঁর অনুকূলে ছিলো না। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন যতো দ্রুত সম্ভব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হোক। আর এবার বলেছেন, পরিষদ আহ্বানই যথেষ্ট নয়, আমাদের শর্তে সে অধিবেশন হতে হবে। ১ মার্চের আগে সংসদ অধিবেশন ও ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ছিলো বাঙালির মূল দাবি। ১ মার্চের পর সে দাবি প্রসারিত হয়ে স্বাধিকার তথা পূর্ণ স্বাধীনতায় রূপ নেয়। ৭ মার্চের ভাষণে ইয়াহিয়া খানের কাছে যে দাবি তুলেছেন তা মানলে তো পাকিস্তান থাকে না, সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকে না, ভুট্টোর গোয়ার্তুমি—কিছুই থাকে না, ভাগ হয়ে যায় পাকিস্তান।

পরবর্তীকালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর প্রতিনিধিদের আলোচনা হয় সেই আলোচনা কিন্তু ৬ দফায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। ৬ দফাকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশের জন্য আরো সুবিধা আদায়, আরো স্বাধিকার নিশ্চিত করাই ছিলো আওয়ামীলীগের সর্বশেষ সাংবিধানিক খসড়া প্রস্তাব। যে প্রস্তাব পাকিস্তানিরা কখনো মেনে নেয় নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে দাবি একাত্তরের মার্চে তুলেছিলেন সেই দাবি আগে তুললে পাকিস্তানিরা বিচ্ছিন্নতার অজুহাত এনে নির্বাচনটাই বানচাল করে দিতো। পাকিস্তানিদের কাছে মুজিবের সর্বশেষ প্রস্তাব পাকিস্তান 'ফেডারেশন' নয়, 'কনফেডারেশন'। আর 'কনফেডারেশন' হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যকার চুক্তি বা সমঝোতা। এ সমঝোতার শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া বা ভুট্টো কেউই একটুও সম্মত হন নি।

এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আলোচনা টিমের অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের ভাষ্য হলো :

'আমার ধারণায় ১৯৭১ সালের পহেলা থেকে ছাব্বিশে মার্চ–এই ছাব্বিশ দিনই বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। যার ফলে কখন স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিলো বা কে তা ঘোষণা করেছিলেন এই প্রশ্নটি অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা অগ্রাহ্য করার যে মূঢ়তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে গ্রাস করেছে এটা তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। গোটা মার্চ মাস জুড়ে বঙ্গবন্ধু যা এবং যতোটা সাধন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো ইতিহাসে

অন্য কোনো নেতাই সে রকমটি করতে পারেন নি। ইডেন বিল্ডিং যেখানে পরিণত হয়েছে এক অপহৃত অসার সমাধিতে সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে প্রশাসন জেগে উঠেছে এক প্রাণ চাঞ্চল্যে।'

নিউ ইয়র্ক টাইম্সের সাংবাদিক পেগি ডার্ডিন্ মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোর বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন,

'কিন্তু এই ভীতি বা বিদ্বেষ আশ্চর্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কড়া হুকুমে অভূতপূর্ব এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একজন রাজনৈতিক নেতার নির্দেশাবলি জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত মেনে নিয়েছে। এই নির্দেশাবলি প্রয়োগের জন্য এই নেতার কোনোই বাহিনী বা প্রশাসন ছিলো না। আওয়ামী লীগের অসংগঠিত কর্মগোষ্ঠী এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কোথাও অনুনয় করছে, আবার কোথাও নেতার হুকুম মানতে বলছে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত এই নির্দেশ মানার পেছনে ছিলো পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বাঙালি জাতির ও নেতার মধ্যে একটি অলিখিত অথচ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার অঙ্গীকার।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদিও মার্চে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর এ আন্দোলন অহিংস অসহযোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অসহযোগে সীমাবদ্ধ থাকে নি। পাকিস্তানি কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো পৃথক প্রশাসন, পৃথক শাসন ব্যবস্থা। ব্যাংক বীমা অফিস আদালত শুধু তাঁর হুকুমে চলেছে তা নয়, রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান কিংবা নূরুল আমিন কেউই ৬ দফার সমর্থক ছিলেন না। মার্চে এসে তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শর্তহীন সমর্থন দিয়েছেন, তাঁর দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এমন কি বামপন্থী সিরাজ সিকদারের পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন কিছুদিন আগেও যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের পতন কামনা করেছিলো ২ মার্চ তারা তাঁকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানালো। কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলো। রেহমান সোবহান যথার্থই বলেছেন যে, *'আর কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা ঘটে নি।'* মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোর আগে বা পরে বাঙালি আর কখনো এমন ঐক্যের নজির স্থাপন করতে পারে নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি। আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেও তারা নানা উপদলে বিভক্ত ছিলো। তরুণ নেতৃত্ব তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলো। আরেক পক্ষ ভারতের সহায়তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলো। খন্দকার মোশতাক-চাষীচক্র যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আপোস-রফারও চেষ্টা করেছিলো। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সংঘটিত রাজনৈতিক সংঘাতের বীজ উপ্ত ছিলো সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ই। অনেক বছর পরও সেই বিভাজন প্রশমন করা যায় নি। এমন কি

পাকিস্তানি কারাগার থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও বিভক্ত জাতিকে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি। একাত্তরে মার্চের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আর আমাদের জাতীয় জীবনে আসে নি, সম্ভবত ভবিষ্যতেও আসবে না।

অনেকে অভিযোগ করেন যে, ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দিয়েছেন। তিনি ধরা দিন আর পাকিস্তানিরা গ্রেফতার করুক, ফলাফলে খুব একটা তারতম্য নেই। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর গ্রেফতার হওয়ার কারণও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানিরা তাকে না পেলে ঢাকা শহর জ্বালিয়ে দিতো। দেশজুড়ে গণহত্যা চালাতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার পরও পাকিস্তানিরা গণহত্যা চালিয়েছে। তাহলে কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন?

প্রথমত তিনি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানে যেতে চেয়েছিলেন। যেমন ১৯৪৭ সালে গান্ধী ও জিন্নাহ করেছিলেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। কিন্তু পাকিস্তানিরা যখন সেই মীমাংসায় এলো না তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশের মুক্তি কামনা করলেন। নিজে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের ঝুঁকি নিলেন না, সহকর্মীদের বললেন যেভাবে পারো ওদের প্রতিরোধ করো। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধ কীভাবে হবে কতোদিন চলবে এ ব্যাপারে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলো কিনা সে বিষয়টি পরবর্তীকালেও তিনি স্পষ্ট করেন নি। শুধু বলেছেন, 'আমি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখকে কী করতে হবে তা বলে গিয়েছিলাম।' যারা মনে করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আত্মরক্ষার জন্যই পকিস্তানিদের হাতে ধরা দিয়েছেন তাদের ধারণা কোনো ক্রমেই সঠিক নয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও পাকিস্তানিদের প্রধান লক্ষ ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ইয়াহিয়া খান তাঁর বিচারের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু তার আশা পূরণ হয় নি।

বঙ্গবন্ধু হয়তো ভেবেছিলেন যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে, কিন্তু বন্দির কোনো পরাজয় নেই। একই সঙ্গে তিনি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ও স্বাধীনতাকামি বাঙালির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো, পাকিস্তানিরা যদি তাঁকে হত্যা করে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তবে যুদ্ধের দায়টি নিতে চান নি। যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানিরাই। পৃথিবীর বহুদেশ আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেছে। যেমন চেক ও শ্লোভাক প্রজাতন্ত্র। যুদ্ধের যেমন জয় পরাজয় আছে, তেমনি আছে গ্লানিও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যই আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু এ যুদ্ধ সমাজদেহে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করেছে আজো তার ক্ষত ঘুচানো সম্ভব হয় নি। এ দোষ অবশ্য কিছুটা আমাদের।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজে যুদ্ধ যান নি ঠিক, কিন্তু তিনি যুদ্ধে গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি তিনি যুদ্ধের জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখেছেন, যুদ্ধের দায়টাও শেষ পর্যন্ত তাঁকেই নিতে হয়েছে। আর তাঁর জয়টাতো বলাই বাহুল্য।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা চেষ্টা ও পাবিস্তানিদের ধ্যান-ধারণা

পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী একাত্তরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রথম হত্যার চেষ্টা করেছে তা নয়। তারা ঊনসত্তরেও দু দুবার তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিলো। প্রথমবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী থাকা অবস্থায়। এ সম্পর্কে 'বঙ্গবন্ধু ও দুটি ঐতিহাসিক মামলার জেরা ও জবানবন্দি' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে,

'আসামীদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অন্য ১৩ জনের সাথে বন্দি রাখা হয়েছিলো ক্যান্টনমেন্ট সিগ্‌ন্যাল্ অফিসার্স মেসে। তাঁকে সেখানেই হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। প্রশাসনের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন অভিযুক্তদের প্রহরাধীন অবস্থায় কিছু সময় হাঁটানো হতো। গুপ্ত ঘাতককে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয় যে, দীর্ঘদেহ গোঁফওয়ালা লোকটি। রুটিন মাফিক হাঁটার সময় এই দীর্ঘদেহি লোকটিকে হত্যা করতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রহরাধীন অবস্থায় পায়চারী করছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের কারণে অবাঙালি পাঠানও তাঁর ভক্ত ছিলো। সেদিন হত্যার এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা একজন পাঠান ক্যাপ্টেন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দ্রুত নিজ কক্ষে চলে যেতে বলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্রুততায় কক্ষে চলে আসেন। কথাটি অতি দ্রুত বন্দিশালায় ছড়িয়ে পড়লে সে রাতে কিছু ঘটে নি। কিন্তু চরম নৃশংসতা ঘটে পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ৬টার দিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এলাকা থেকে একটু দূরে, থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারে বন্দি ছিলেন ২২ জন আসামী। ভোরে গার্ডের অনুমতি নিয়ে ২৭ নম্বর আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ১১ নং আসামী ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক তাদের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে বের হন। সার্জেন্ট জহুরুল হকের ছিলো দীর্ঘ দেহ ও মোটা গোঁফ। দেখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সদৃশ। মাত্র ছয় থেকে আট ফুট দূর থেকে গুপ্ত ঘাতক তাকে গুলি করে। দু জনের মৃত্যু নিশ্চিত করতে বেয়নেট চার্জও করা হয়। পরে সি.এম.এইচ. হাসপাতালে অপারেশনের পর ফজলুল হক বেঁচে গেলেও জহুরুল হককে বাঁচানো যায় নি।'

এ ঘটনার ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায় মমিনুল হক খোকার বইয়ে। তিনি লিখেছেন যে, পাঠান সেনা অফিসার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সরাসরি সতর্ক করেন নি, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর বাসায় গিয়ে বেগম মুজিবকে গিয়ে ষড়যন্ত্রের কথাটি বলেছিলেন। পরে বেগম মুজিব তাঁর সঙ্গে দেখা করে সতর্ক করে দেন।

দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত হয় জেল থেকে বেরিয়ে আইয়ুব আহুত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গেলে। পিন্ডির বিমান বন্দরেই তাঁকে হত্যার জন্য গুপ্তঘাতকরা ওঁৎ পেতেছিলো। নিরাপত্তারক্ষীরা একথা জানতে পেরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে টারমাক থেকে সরাসরি বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

একাত্তরের আগস্টে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহি মামলা সাজানো হয় তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, *'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।*

আমি তাঁকে ছেড়ে দেব না। এ লোকটিই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।'

পরবর্তী সময়ে বিচারের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে আইনজীবী নিয়োগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি একজন বেসামরিক ব্যক্তি। আমাকে মার্শাল ল' কোর্টে গোপন বিচারের উদ্দেশ্য একটাই। আমাকে মেরে ফেলা। সেক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ করলে কোনো লাভ নেই।'

পাকিস্তানি দলিলপত্র থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু পরোয়ানাটি জেনারেল ইয়াহিয়ার টেবিলে ছিলো। এরই মধ্যে ডিসেম্বরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেলে তিনি তাতে সই করে যেতে পারেন নি। পরে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর সেই মৃত্যু পরোয়ানাটি অনুমোদন করেন নি। করাচির জনসভার লাখ লাখ লোকের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তারা উল্লাসিত কণ্ঠে 'হ্যাঁ' বলেন। জনতার অনুমোদন নিয়েই ভুট্টো সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে নাটক করায় অভ্যস্ত ভুট্টোর এটিও হয়তো নাটকের অংশ ছিলো। যেমন তিনি করেছিলেন একাত্তরের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে। একাত্তরে ইয়াহিয়া খান 'দেশদ্রোহী' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'শেষ' করে দিতে চেয়েছিলেন। সামরিক আদালতে বিচারও নাকি সম্পন্ন হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ফাইনাল টাচ দিতে পারেন নি আমেরিকার চাপ এবং ভুট্টোর বিরোধিতার কারণে। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রি কুচক্রী হেন্‌রি কিসিঞ্জার ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলে পশ্চিমপাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।' ভুট্টোর আশঙ্কা ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলে পাকিস্তান ভাঙার দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি তার উপর এসে পড়বে। একই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা, আর তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা। পূর্বপাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ায় ইতোমধ্যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর ক্ষমতায় থাকতে পারছেন না। ভুট্টোই হবেন দেশের কর্ণধার। সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা রফা করার শেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভুট্টো। বাংলাদেশের সঙ্গে আপোস রফা না হলেও তিনি পাকিস্তানকে 'মুজিব হত্যার' দায় থেকে বাঁচিয়েছেন।

ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা' হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছে এবং ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়েছে। যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চল্লিশের দশকে দ্বি-জাতিতাত্ত্বিক পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, মাত্র তিন দশকের ব্যবধানে সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন, অনিবার্য করে তুলেছেন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। মাঝখানের দুটি দশক ঘর আর কারাগারে ভাগাভাগি করে কাটিয়েছেন। নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের বয়স এক বছর না যেতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, আবার সেই পাকিস্তানের ভাঙনের অন্তিম মুহূর্তেও তাঁকে জেলখানায় দুঃসহ বন্দিত্ব

কাটাতে হয়েছে। পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক আমলা পরিচালিত পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি—যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় দুই স্বৈরশাসকের আইয়ুব ও ইয়াহিয়া খানের উক্তিতে। প্রথমজন অস্ত্রের ভাষায় তার ৬ দফার জবাব দিতে গিয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ঠুকেছিলো, দ্বিতীয়জন 'পাকিস্তানের শত্রু' আখ্যায়িত করে ফাঁসির আয়োজন করেছিলো। পাকিস্তানের এ শক্তিধর দুই শাসক কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে নি, তাঁকে হত্যা করেছে তাঁর দেশেরই কতিপয় বিপথগামী সামরিক পোশাকধারী ব্যক্তি।

ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকদের দুটো উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা, দ্বিতীয়ত 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরতরে বিচ্ছিন্ন করা।

তবে একথা সত্য যে, তাদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ দেশের সঙ্গে দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তারা ছিন্ন করতে পারে নি।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও রাজনৈতিক চেতনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এ রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় অনেক আগে থেকেই। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন তা আজো স্মরণীয়। সেদিন তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করে বলেছিলেন,

'ইসলামিক রিপাবলিক না হয়ে পাকিস্তান রিপাবলিক হোক, সেজন্য আমরা ফাইট করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব সমান হবে, সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি আমার বন্ধুদের বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, মাইনরিটি, মেজোরিটি মোহাজের, আনসার, হিন্দু এবং মুসলমান—মানুষ হিসেবে এদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।'

আর এ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতা-বিবৃতিতে। পরিষদ সদস্য থাকাকালে তিনি এমন কোনো বিষয় নেই—যা নিয়ে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি। ষাটের দশকের শুরুতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পশ্চিমাদের সঙ্গে থাকা যাবে না। নীতি ও আদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর মতে বামপন্থীদের টানতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ, খোকা রায় প্রমুখের সঙ্গে আলাপও করেছেন। কমিউনিস্ট নেতারা তাঁকে অপেক্ষা করতে বললে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, *'আপনাদের কথা শুনলাম, তবে মন থেকে মানলাম না।'* এর এক বছর পরই তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিবেশি দেশের সমর্থন লাভের আশায়। সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এ পথে হবে না। আগে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। নীতি ও কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করতে হবে। অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লব নয়, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে

হবে। ৬ দফা কর্মসূচি ছিলো তারই চূড়ান্ত দলিল। এ ৬ দফার প্রতিও সে সময় চরম ডান ও উগ্র বামপন্থীরা অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে। ডানপন্থীরা বলেছে 'এটি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের মন্ত্র' কড়া বামপন্থীরা বলেছে 'সিআইএ-র দলিল।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজ রাজনৈতিক জীবনে হয়তো ভুল-ত্রুটি আছে। কিন্তু তিনি যে কাজটি করেন নি সেটি হলো পশ্চিমপাকিস্তানিদের কাছে নতি স্বীকার করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মানুষ ছিলেন, দেবতা ছিলেন না। তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ যেমন কাম্য নয়, তেমনি ইতিহাসে তাঁর অবদানও অস্বীকার করা এক মহা অন্যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'চির ভাস্বর' হয়ে থাকবেন। তিনি ইতিহাসের সৃষ্টি যেমন তেমনি ইতিহাসের স্রষ্টাও। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিশিষ্টতা, এখানেই অনন্যতা। আমরা যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমালোচনা করি তখন তার পাশাপাশি অন্যান্য জাতীয় নেতাকে বসালেই বোঝা যায় তিনি কোথায়, কেন এবং কীভাবে বড়ো ছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলতে চান যে, একদল জুনিয়র সেনা অফিসার ব্যক্তিগত আক্রোশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই দেশকে এমন অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যেখান থেকে তাঁর ফিরে আসার কোনো উপায় ছিলো না। পরবর্তী আড়াই দশকের বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত 'বাকশাল' পদ্ধতি পুরোপুরি চালু হওয়ার আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ পরবর্তী অবস্থা কাটিয়ে দেশ যখন কিছুটা স্থিতির দিকে যাচ্ছিলো তখনই শত্রুরা চরম আঘাতটি হানে।

আজকেও বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কোনো স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হত্যা করে নি, যারা হত্যা করেছে তারাও মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। হ্যাঁ, এদের কারো কারো নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় ছিলো, কেউ কেউ ১৬ ডিসেম্বরের পরে আত্মরক্ষার জন্যও নাম লিখিয়েছে মুক্তিযোদ্ধার খাতায়। কিন্তু চারিত্রিকভাবে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনারই বিরোধী ছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সাম্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌল আদর্শ ধরে। অর্থাৎ এ দেশের মানুষ একাত্তরে স্বৈরশাসনের যেমন অবসান চেয়েছিলো তেমনি সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলো। বাংলাদেশের সকল ধর্মের, বর্ণের ও গোত্রের মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা। সেই চেতনার পক্ষে যারা একমত হতে পারে নি তাদের কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলেও নিজের চরিত্রকে শোধরাতে পারে নি। মানতে পারে নি ভাষাভিত্তিক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির রাষ্ট্রাদর্শকে। তারা বড় পাকিস্তান ভেঙে ছোট পাকিস্তান কায়েম করতে চেয়েছিলো এবং এক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সরিয়ে দিতেও তারা দ্বিধা করে নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে। অভ্যুত্থানকারীরা প্রথমে বাংলাদেশের নাম পাল্টে দিয়ে 'ইসলামি

প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু সেই ঘোষণা বহির্বিশ্বে স্বীকৃতি পাবে না বুঝতে পেরে গণপ্রজাতন্ত্রের খোলসেই পাকিস্তানি ভাবধারা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। ১৫ আগস্টের পর পাকিস্তান, চীন ও সৌদি আরবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশী মুসলিম ভাইয়ের জন্য সওগাত পাঠান, কয়েক দিনের মধ্যে চীন ও সৌদি আরব মোশতাক সরকারকে বিস্ময়কর স্বীকৃতি দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ যে, তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে সরে এসে একদলীয় 'বাকশাল' কায়েম করেছিলেন। সেটি ভালো হোক, মন্দ হোক সংসদে আইন পাস করে অর্থাৎ জনগণের রায় নিয়েই করেছিলেন। পরবর্তী শাসকরা কোনো কিছুই সংসদের অনুমোদন নিয়ে করে নি। তারা বন্দুকের জোরে ক্ষমতায় এসে যখন যাকে খুশি মন্ত্রি, প্রধানমন্ত্রি বানিয়েছেন। আবার প্রধানমন্ত্রির আসন থেকে তাকে অবমাননাকরভাবে বিদায়ও করেছেন। আর সকল ক্ষমতার উৎস ছিলো এক ব্যক্তি। তার আজ্ঞা অনুগ্রহে দেশ চলতো, সংসদ চলতো, তথাকথিত গণতন্ত্রও চলতো। এ শাসকরা বাহুর জোরে ক্ষমতায় এসে গণভোট নিয়ে প্রথমে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে পরে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নামেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তারা নিজেদের চিন্তায় কিছু করেছেন নাকি অন্যের ক্রীড়াণক হিসেবে কাজ করেছেন, সেই রহস্য আজো অনুদঘাটিত। তবে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এর পেছনে দীর্ঘস্থায়ী ষড়যন্ত্র ছিলো এবং সেই ষড়যন্ত্রকারী কুশীলবরা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সক্রিয় ছিলো।

বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে দু জন বিদেশী সাংবাদিক তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এদের একজন বৃটিশ সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাস ও অপরজন মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুজ। দেশিয় কোনো সাংবাদিকের লেখায় এ ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করা যায় নি। হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান তার নিজের পত্রিকা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় একাধিক লেখায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যা অনিবার্য ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বেঁচে থাকা যাদের জন্য চরম অস্বস্তি ও লজ্জার বিষয় তারা তাঁর হত্যাকে অনিবার্য ঘটনা হিসেবে দেখবেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

এন্থনি মাসকারেনহাস তাঁর 'Legacy of Blood'-এ দেখাতে চেয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার ঘটনাটি ৬ জন জুনিয়র সেনা অফিসারের আক্রোশমূলক অভিযানের পরিণতি। এ প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামীলীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার পুত্রের হাতে মেজর ডালিমের স্ত্রীর লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটিও যুক্ত করেন। তিনি আরো জানাতে চান, আওয়ামীলীগের দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসাররা মিলে এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে। তার বিশ্লেষণে অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনায় খন্দকার মোশতাক আহমদকে নিরাপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা আছে। আসলে এন্থনি মাসকারেনহাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ না করে 'সূর্যসন্তানদের' সম্পর্কে কল্পকাহিনী বিবৃত করেছেন, যাতে অভ্যুত্থানকারীদের আসল উদ্দেশ্য এবং তাদের নেপথ্যের কুশীলবরা আড়ালে থেকে

যায়। বইটিতে আসলে তিনি কৌশলে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রহমানের চরিত্র হনন করেছেন। স্বৈরাচার এরশাদ আমলে সরকারি উদ্যোগে এ বইটি হাজার হাজার কপি বিতরণ করা হয়েছিলো।

লরেন্স লিফ্সুজ্ তাঁর 'আনফিনিসিড্ রেভুলিউশন' বইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সাফল্য ও ব্যর্থতার দুটো দিকই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার চেয়েও জরুরি যে কাজটি তিনি করেছেন তা হলো বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত দেশি-বিদেশি চক্রের স্বরূপ উদঘাটনের প্রয়াস। লিফ্সুজের সেই প্রয়াস এখনো অব্যাহত রয়েছে। তথ্য ও বিশ্লেষণ সহযোগে লিফসুজ দেখাতে চেয়েছেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডটি নিছক ৬ মেজরের ক্রুদ্ধ ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফল নয়। এর পেছনে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা যেমন কাজ করেছে তেমনি মঞ্চের বাইরেও রয়েছেন অনেক ঝানু কুশীলব। তারা কখনোই সামনে আসেন নি, তবে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন। কেউ কেউ সুফলও পেয়েছেন। লরেন্স লিফ্সুজ্ স্পষ্ট না করে বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যারা খুশি হয় নি ১৫ আগস্টের ঘটনায় তাদের সরাসরি অনুমোদন ছিলো। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার বিষয়টি এখনো প্রমাণিত হয় নি। যদিও ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীর কয়েকজনের ফাঁসি হয়েছে, তারাও স্পষ্ট করে কিছু বলে যান নি। আদালতও বলে নি। লরেন্স লিফ্সুজ্ তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন,

'একটি কট্টর দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী মুজিবের দলের একাংশের সহযোগিতায় ১৯৭৫ সালে অবশেষে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলে এবং ক্ষমতায় নিজেদের পুনর্বহাল করে। এই দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটি পাকিস্তান আমলে গুরুত্ব পেলেও '৭১-এর স্বাধীনতার পর মুজিব এদের একঘরে করে ফেলেন। আসলে ১৯৭৫-এর আগস্টে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিকে এতোদিন যতো সহজ সরল বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা আদতেই ততো সহজ বা সরল ছিলো না।'

তবে লরেন্স লিফসুজ যা বলেন নি তা হলো শুধু দক্ষিণপন্থী নয়, অতি বামপন্থী একটি চক্রও ১৯৭২ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। এক্ষেত্রে তারা সাম্প্রদায়িকতা তথা ভারতবিরোধিতার মোক্ষম অস্ত্রটি ব্যবহার করে। এমন কি পঁচাত্তরে তথাকথিত সিপাহী বিপ্লবেও এ শ্লোগান ব্যবহার করে তারা জয়ী হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরোধিতার নামে সেদিন অতি বিপ্লবী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একজোট হয়ে গিয়েছিলো। এ জন্যই ১৫ আগস্টের পর তাদের বিপ্লব প্রয়াসও স্তিমিত হয়ে যায়।

১৫ আগষ্টের এ ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে? তা অবশ্যই নয়। ঘাতকরাও জানতো বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণেই মৃত্যুর পরেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার বন্ধ হয় নি। একসময়ে তো তাঁর নাম উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ ছিলো। এ নিষেধাজ্ঞার দেওয়াল পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজো বাঙালির চিন্তা ও মননে দীপ্ত। আর সেদিন যারা তাঁকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

করেছিলো তারাই ইতিহাসের পাতায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে যদি আমাদের 'শ্রেষ্ঠ অর্জন' বলে আখ্যায়িত করি তাহলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে 'প্রধান বিয়োগান্ত ঘটনা' বলেই বিবেচনা করতে হবে। পঁচাত্তরের আগস্টে কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেহকেই বুলেটবিদ্ধ করা হয় নি, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে চরম আঘাত করা হয়েছে। পরবর্তী শাসকরা জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করেছেন। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন। বাকি থাকে গণতন্ত্র। সেই গণতন্ত্রের গায়ে পরিয়ে দেওয়া হলো ১৫ বছর মেয়াদি সামরিক পোশাক। বাংলাদেশের স্থপতি ও তাঁর আদর্শ হত্যার ঘৃণ্য তৎপরতার বিরুদ্ধে সেদিন রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের যেভাবে প্রতিবাদ করার কথা ছিলো, সেভাবে তারা কোনো প্রতিবাদ করেন নি, বরং অনেকে চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই আজকেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য দেশব্যাপী মাতমের মহড়ায় আমাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে। পঁচাত্তরে মুজিব হত্যার ঘটনাকে অনেকেই হালকা করে দেখেন। অনেক বাঘা বিপ্লবী একে *'বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব'* বলেও চালাতে চান। যেমন একাত্তরে তারা মুক্তিযুদ্ধকে বলেছিলেন *'দুই কুকুরের কামড়া-কামড়ি'*। বাংলাদেশটা তো এখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রই আছে। তাহলে এ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যাপারে বিপ্লবীদের কি কোনোই দায়িত্ব নেই? একটি সামরিক সরকার আসে আর তারা 'বিপ্লবী তত্ত্ব' বাক্সবন্দি করে তার পদসেবায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন। আওয়ামী-বাকশালীদের ঠেকাতে এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা আর কি আছে? এ বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ হালে আমেরিকার সঙ্গে 'সোফা' 'হানা' চুক্তি করতেও কুণ্ঠিত নন। তাতে তাদের বিপ্লবিয়ানায় সামান্য ঘাটতি পড়ে না! আসলে স্বার্থে লাগলেই তারা চরিত্র পাল্টে ফেলেন তাৎক্ষণিকভাবে। নিজেদের স্বার্থে দেশকে বিকিয়ে দিতেও কার্পণ্য করেন না।

ভুট্টো ও বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। রেডিওতে খন্দকার মোশতাক আহমদ নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করলেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো তার ভ্রাতৃপ্রতীম মোশতাক সরকারকে আকস্মিকভাবে স্বীকৃতি দেন। একই সঙ্গে তিনি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সকল সদস্য এবং তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশের প্রতি অনুরূপ আহ্বান জানান। ভুট্টো এখানেই থামলেন না। তিনি 'বাংলাদেশী ভাই'দের জন্য ৫০ হাজার টন চাল ও ১৫ মিলিয়ন গজ কাপড় পাঠানোরও নির্দেশ দিলেন।

বাংলাদেশে খন্দকার মোশতাকের শাসনকাল ৮৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয় নি। এরই মধ্যে ভুট্টো বাংলাদেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করার জোর তৎপরতা চালাতে থাকেন। তার বিশেষ উপদেষ্টা মাহমুদ আলীকে লন্ডনে পাঠানো হলো। উদ্দেশ্য সাবেক পাকিস্তানের দুই অংশকে এক করা। মাহমুদ আলী ভেবেছিলেন লন্ডন থেকে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমর্থন আদায় করবেন। কিন্তু

সে উদ্দেশ্য সফল হলো না। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো 'নাশকতামূলক কাজ' সহ্য করা হবে না। নভেম্বরের শুরুতে যে অভ্যুত্থান ঘটে তাতে 'মুজিববাদ' পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ দেখা যায়। যদিও এ অভ্যুত্থান সফল হয় নি। ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান তার 'নিজস্ব' সিপাহীদের হাতে পাল্টা অভ্যুত্থানে মুক্ত হন এবং নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্ধদশকেরও বেশি সময় তিনি দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

বাংলাদেশে যখন খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাসীন, ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর বেগম আখতার (বেবী) সোলায়মান (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির কন্যা) ভুট্টোকে এক চিঠিতে লিখেছেন :

'আমি সব সময় আপনাকে একজন অসীম সাহসী, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ব্যতিক্রমী দূরদর্শী মানুষ হিসেবেই জানি।' 'বাংলাদেশ' বিষয়ে আপনি সকল প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে গেছেন। আপনি মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়ে অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।'

ভুট্টো সম্পর্কে আখতার সোলায়মান একাই এ মনোভাব পোষণ করেন নি। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে যখন কালো মেঘের ঘনঘটা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজও যখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে তখন ইসলামি বিশ্বে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। তিনি তখন পাকিস্তানের মাল্যবর।

১৫ আগস্ট ভোররাতে কয়েকজন জুনিয়র সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেই অভ্যুত্থানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন—তিন বছর আগে দেশবাসী যাকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর পরই তাঁর এককালীন সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরে বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রি খন্দকার মোশতাক আহমদও এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজে প্রেসিডেন্টর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৫ আগস্টের সেই রাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) ঘাতকদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। ঘাতকদের একজন তাকে নরম সুরে বললেন, "স্যার আপনি (আমাদের সঙ্গে) আসুন।"

'তোমরা কী চাও'—চড়া গলায় জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'তোমরা ভুলে গেছো পাকিস্তানি আর্মিও আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। পারে নি। তোমরা কি ভাবো, তোমরা পারবে?'

প্রথমজন কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও দ্বিতীয়জন মুজিবকে কোনো সময় দেয় নি। সে তাঁকে লক্ষ্য করে স্টেনগান থেকে ব্রাস ফায়ার করলো। অসংখ্য বুলেটে মুজিবের শরীরের ডানদিক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো।

এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর কি সায় বা সংশ্লিষ্টতা ছিলো? সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া কঠিন। তবে দেশের ভেতরে মুজিববিরোধী যে চক্রান্ত চলছিলো তাকে ইন্ধন যুগিয়েছেন কুচক্রী ভুট্টো।

এরপর বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত নাজুক হয়ে পড়ে। সমাজের সর্বস্তরে হতাশা দেখা দেয়। এ হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরেও। পঁচাত্তরের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অধিকতর একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন কায়েম করেন। তিনি সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন (সংবিধানের কোনো কোনো ধারা)। নিজ দল আওয়ামীলীগকে জাতীয় দলে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামলীগ' রূপান্তরিত করেন। বর্তমান অজনপ্রিয় প্রশাসন টিকিয়ে রাখতে সোভিয়েত সমর্থন কামনা করেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও ভুট্টো কুণ্ঠিত হন নি। বিগত দু বছর ধরেই তিনি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের জন্য গোপন তহবিলের যোগান দিয়ে আসছিলেন এবং পঁচাত্তরের আগস্ট শেষ হওয়ার আগেই তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে। বাংলাদেশের গোড়াপন্থী ইসলামি সংগঠন থেকে শুরু করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো জোরালোভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরোধিতা করে আসছিলো।

বাংলাদেশের মার্কসবাদী লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (নিষিদ্ধ ঘোষিত)-এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল হক ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে 'আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রি' সম্বোধন করে এক চিঠি লেখেন। চিঠিটির সারমর্ম নিম্নরূপ :

আমার প্রিয় প্রধানমন্ত্রি,

'পুতুল মুজিবচক্র এখন জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও ওয়ারলেস সরঞ্জাম প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।'

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ চিঠিকে *'অত্যন্ত গোপনীয়/অত্যন্ত জরুরি'* বলে উল্লেখ করে। ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আবদুল হক লিখিত চিঠিটি ভুট্টোর কাছে পৌঁছে ১৯৭৫ সালের ১৬ জানুয়ারি। চিঠিটি পাওয়ার পর পাকিস্তানি নেতা ভুট্টো *'অত্যন্ত জরুরি* বলে মন্তব্য করেন এবং এ সৎ লোকটিকে (আবদুল হক) কার্যকর সাহায্য দেওয়ার জোর সুপারিশ করেন।

কথিত মার্কসবাদী নেতা আবদুল হক ভুট্টোকে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন সিলেটের মাহমুদ আলীর মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাহমুদ আলী দখলদার পাকিস্তানিদের পক্ষ নেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে ভুট্টো তাকে বাংলাদেশ (তাদের ভাষায় পূর্বপাকিস্তান) সংক্রান্ত বিশেষ উপদেষ্টার পদে বসান।

ভুট্টোর আরেকজন এজেন্টের নাম আবদুল মালেক। বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে তিনিও সৌদি আরব যান। সেখান থেকে ১৯৭৫ সালের ২২ জানুয়ারি ভুট্টোকে চিঠি লেখেন 'আমার প্রিয় নেতা' সম্বোধন করে।

এই আবদুল মালেক লিখেছেন, *'বাংলাদেশের ৬৫ মিলিয়ন মুসলমান তাদের মুক্তির জন্য আপনার দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে।'*

এ চিঠির জবাবে ভুট্টো ধর্মমন্ত্রি মওলানা কায়সার নিয়াজীকে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত পাঠান। উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট দেশের কূটনৈতিক, আর্থিক সাহায্য তথা অস্ত্রের

যোগান নিশ্চিত করা। ভুট্টো ভেবেছিলেন এদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে 'ইসলামি রিপাবলিক' নামকরণের জন্য মুজিব সরকার কিংবা তাঁর উত্তরসূরির প্রতি (তখনই তারা উত্তরসূরি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল!) চাপ সৃষ্টি করা। একইভাবে ভুট্টো চেয়েছেন, পাকিস্তানি স্টাইলে বাংলাদেশের ইসলামি মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে।

১৯৭৩ সালের ৬ জুলাই ওয়াশিংটন যাওয়ার আগে ভুট্টো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ভাষণ দেন এবং পরিষদের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বানুমতি চান। ওয়াশিংটন সফরের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্দি বিনিময়ের ব্যাপারে যে আলোচনা চলছে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান। ভুট্টো পাকিস্তানে আটক সকলকে ফেরত দেওয়ার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠারও অঙ্গীকার করেন। একই সঙ্গে ভুট্টো আলোচনার দীর্ঘসূত্রতার জন্য দিল্লি ও ঢাকাকে অভিযুক্ত করেন। এ বছর আগস্টের শেষদিকে ভুট্টো প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রি আজিজ আহমদকে দিল্লি পাঠান।

২৮ আগস্ট জনাব আহমদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ প্রতিনিধি পি.এন. হাকসারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ভিত্তিতেই ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির প্রত্যাবাসন কাজ শুরু হয়। চুক্তিতে পাকিস্তানে আটক বাঙালি এবং বাংলাদেশে আটক অবাঙালিদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের দায়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি বন্দির বিচারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ভারত বলেছে, আপাতত এ যুদ্ধাপরাধীরা তাদের হেফাজতে থাকুক। পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ঢাকা ও ইসলামাবাদ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৮তম অধিবেশনে ভাষণ দিতে দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ১৯৫ জন পাকিস্তানি বন্দিকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন বা কমনওয়েলথ গঠন করাতে পারবেন সে আশা ভুট্টো ছেড়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি একাত্তরের অন্ধকার দিনের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য দু দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ককে পুনরুদ্ধারের বাসনা ব্যক্ত করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভুট্টোর ভাষণ একই ভাষণে তিনি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়নের কথাও বলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। লাহোর ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। ৩৮টি মুসলিম দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেছেন। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের বৈঠক। ২২ ফেব্রুয়ারি আহূত শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগদানের বিষয়টি তখনো অনিশ্চিত। আকস্মিকভাবে ভুট্টো টিভি ক্যামেরা ও রেডিও মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। মুজিবকে সম্মেলনে আনার জন্য কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা ছুটে আসেন ঢাকায়। তখনো পর্যন্ত তিনি ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিষয়টি বাতিল করে দেন নি।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। ৩৯টি দেশের রাষ্ট্র নেতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন। প্রথম সম্মেলনে যোগ দেয় মাত্র ২৯টি দেশ। এ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান কেবল ভুট্টোর কূটনৈতিক বিজয়ই নিশ্চিত করে নি; তা ছিলো সাম্প্রতিক ইতিহাসে লাহোরের সবচেয়ে আনন্দমুখর ঘটনাও। এ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে শালিমার গার্ডেনে মুসলিম নেতারা সমবেত হলে হর্ষোৎফুল্ল জনতা 'ভুট্টো-মুজিব ভাই ভাই' 'ভুট্টো জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান। কোনো কোনো পাকিস্তানির তখনো শঙ্কা ছিলো, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে হয়তো বাংলাদেশ বা ভারতের আদালতে বিচার করা হবে।' এ ব্যাপারে সাংবাদিকরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'আশা করি শিগগিরই বাকি যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টিও ফয়সালা হবে।' উপস্থিত সবাই দেখলো, সম্মেলনে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। শিগগিরই ত্রিপক্ষীয় মুজিব, ভুট্টো ও ইন্দিরা শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। এরপর ৫ এপ্রিল ভুট্টোর প্রতিমন্ত্রি আজিজ আহমদ বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রিদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যান এবং ১৯৫ জন বন্দির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চাপ দেন।

অত্যন্ত শীতল পরিবেশ ও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু মাত্র দু দিনের মধ্যে আলোচনায় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এদিকে ফ্রান্স সফররত ভুট্টো একটি ফরাসি বার্তা সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সতর্ক করে দেন, পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত ছেড়ে না দেওয়া হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের সমস্ত প্রক্রিয়া নস্যাৎ হয়ে যাবে। ৮ এপ্রিল দিল্লিতে তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রিরা ১৯৫ জন পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন দিল্লিতে যান তখন ভুট্টো বেইজিংএ। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দৃশ্যত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। কিন্তু ফারাক্কাসহ বহু অমীমাংসিত বিষয়ে মুজিব-ইন্দিরা বৈঠক মতৈক্য ছাড়াই শেষ হয়। ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রবল আপত্তি ছিলো।

জুলফিকার আলী ভুট্টো জুনে তার প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফর স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফারাক্কা প্রশ্নে বাংলাদেশ-ভারত বিরোধের খবর জানতে পেরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ সুযোগে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে আগ্রহী হন। ভুট্টোর ঢাকা সফর কূটনৈতিক দৃষ্টিতে সফলই বলা যায়। 'ইয়াহিয়ার চেয়েও খারাপ' লোক বলে তার সম্পর্কে বাঙালিদের কাছে যে ধারণা ছিলো এ সফরের মাধ্যমে তিনি তা পাল্টে দিতে সক্ষম হন। আপাতত তিনি জয়ী হন।

মুজিব-ভুট্টো কথোপকথন

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একদিন। তখন সূর্য ডুবে গেছে। খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তাহ পর ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডির সামরিক বিমানবন্দরের কাছে সুরক্ষিত বাংলোয় নিজেই গাড়ি চালিয়ে যান। সেদিনই জেলখানার সেল থেকে হেলিকপ্টারযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। একাত্তরের মার্চের শেষ দিকে ঢাকায় গ্রেফতারের পর

থেকে তিনি এ সেলে অন্তরীণ ছিলেন। সেখানে তাঁকে কোনো সংবাদপত্র পড়তে দেওয়া হতো না। কোনো রেডিও শুনতে পেতেন না।

সশস্ত্র রক্ষীদের প্রহরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখনো নিশ্চিত ছিলেন না—কী হতে যাচ্ছে। ভুট্টোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যখন রক্ষীরা আমাকে এখানে নিয়ে আসে আমি ভেবেছিলোাম আমার জন্য আরেকটি বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।' বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুখে ম্লান হাসি।

জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে জানান, 'পিন্ডিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেছে।'

'আমি খুশি'। মুজিবের সংক্ষিপ্ত জবাব। 'বিশ্বাস করো, আমি খুশি। কিন্তু তুমি বলো, বাংলার অবস্থা কী? আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন।'



চিত্র : ১১। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বারের রাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

জবাবে ভুট্টো তাঁকে বললেন, 'সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ ও জঙ্গীবিমানের ছত্রছায়ায় বন্দুক ও ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকা 'দখল' করে নিয়েছে।'

'এর অর্থ তারা আমাদের হত্যা করেছে?' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিৎকার করে উঠলেন। তিনি আরো যোগ করলেন, 'ভুট্টো, তারা আমাদের হত্যা করেছে? তুমি আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দাও। তুমি আমাকে কথা দাও, ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি আমাকে জেলে পাঠায় আমি তোমার সাহায্য পাবো। আমার জন্য তোমাকে লড়াই করতে হবে।'

'মুজিব, আমরা দু জনই এক সঙ্গে লড়াই করবো।' ভুট্টো প্রতিশ্রুতি দেন।

'না'। 'না'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্রুত জবাব দিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাকে ভালোভাবেই জানেন। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন, তার প্রতিটি কথাই কাঁটাতার ঘেরা বৈঠকখানা থেকে টেপ করা হচ্ছে।

মুজিব আরো বললেন, সেখানেই আমাকে বিষয়টি ফয়সালা করতে হবে। আমি নিশ্চিত 'দখলদার' সেনাবাহিনী সেখানে আছে। আমি এও নিশ্চিত যে, আওয়ামী লীগ তাদের সরাতে পারবে না। বিশ্বও ঘটনা অনুধাবন করবে ... আমি তোমার

সাহায্য চাই ... বিশ্বাস করো। আমি কখনো ভারতীয়দের দখলদারিত্ব চাই নি।'
'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছো না?' মুজিবের প্রশ্ন।
ভুট্টো জবাব দিলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। না হলে আমি কি সত্বর এ ব্যবস্থা নিতাম? প্রথমত আমি তোমাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছি এবং এখানে নিয়ে আসতে বলেছি।' মুজিব পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তুমি দায়িত্ব নিয়েছো, তাতে আমি খুশি।'
কিন্তু তার কণ্ঠ কিংবা চেহারায় কোনো প্রতিফলন দেখা গেলো না। তার বাঁকা চাহনি 'নিরাপদ কক্ষে'র চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মুজিব কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, যদি তিনি ফের তার প্রিয় ঢাকা অথবা পরিবার কিংবা বন্ধুদের দেখার সুযোগ পান তাহলে কী হবে? তিনি ভুট্টোর কাছে জানতে চাইলেন।
'তুমি আমার অবস্থা জানো।...' প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই আলোচনা করছেন একথা তার আওয়ামীলীগের সাথীরা কীভাবে নেবে, কী হবে? অন্যদিকে তাঁর সামনে বসা মানুষটির হাতেই তাঁর জীবন। তাঁর সঙ্গে যদি তিনি নরম ভাষায় কথা না বলেন তাহলে কী হতে পারে? কীভাবে তিনি রক্ষা পেতে পারেন? কখন তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশে ফিরে যাবেন?
জুলফিকার আলী ভুট্টো এ বাঙালি বন্দিকে নিয়ে আরো ১১ দিন খেলেছেন।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বললেন 'না' 'না'। কোনো শর্ত নয়। ভুট্টোর রক্তমাখা চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি আরো খারাপ কিছুর শঙ্কা করছিলেন। শেষে বললেন, 'আমার দেশের অবস্থা কী? আমাকে বলো।'
এবারে ভুট্টোর জবাব, 'মুজিব ভাই' আমাদের একসঙ্গে থাকার কি কোনো সম্ভাবনা নেই?
মুজিব বললেন, 'আমি ঢাকায় জনসমাবেশ করবো। আমি আমার জনগণের সঙ্গে দেখা করবো। তাদের সঙ্গে আলাপ করবো এবং তোমাকে জানাবো। এ আমার অঙ্গীকার ... আমি প্রতিটি কথা বলবো ... তারা আমাকে বিশ্বাস করবে। ইনশাল্লাহ আমরা কিছু একটা করবো। আমি সরাসরি তোমাকে কিছু বলতে পারছি না।'
ভুট্টো এ বন্দিকে ব্যবহার করে অতীতের ভুল-ত্রুটি মুছে ফেলে ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসছে চাইছেন। তিনি ভাঙাচোরা পাকিস্তানকে আবার জোড়া লাগাতে চাইছেন। কেন নয়। তিনি কি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক নন? কেন এ গরিব বাঙালিকে কি তিনি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারবেন না?
যদিও এখনো ভুট্টো মুজিবকে অবিশ্বাস করেন এবং মুজিবও তাকে অবিশ্বাস করেন। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই বাংলোতে একাই ছিলেন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভেতর। লারাকানায় জন্মদিনের উৎসব শেষ করে সেদিন রাতে ভুট্টো দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিন ভুট্টোকে মুজিবের প্রতি আরো বেশি আন্তরিক মনে হলো। তিনি সত্যি সত্যি পশ্চিমপাকিস্তানে আটক মুজিব ও কয়েক মিলিয়ন বাঙালিকে ফেরত পাঠাতে চান। কি নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে সেখানে? জেনারেল আইয়ুব ও জেনারেল ইয়াহিয়া যা হারিয়েছেন ভুট্টো তাই পুনরুদ্ধার করবেন। 'কায়দে আওয়াম, শহীদ ও রক্ষাকর্তা ভুট্টো।'

সাক্ষাতের শুরুতেই ভুট্টো মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, '২৭ তারিখে তুমি বলেছো দুটি কিংবা তিনটি বিষয়ে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা।'
মুজিব কিন্তু নার্ভাস কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তার আগে তুমি আমাকে যেতে দাও।'
কিন্তু যতো ঢিলেঢালাই হোক না কেন আমি কনফেডারেশনের প্রস্তাবেও কিছু মনে করবো না। ভুট্টো তাকে চাপ দিতে থাকেন ন্যূনতম কোনো অঙ্গীকার আদায়ের জন্য।
'না' 'না' ... আমি ইতোমধ্যে তোমাকে বলেছি।
কোনো রকম সমঝোতার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি ...।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রতিবাদ করে উঠলেন।
ভুট্টো যোগ করলেন, 'আমি তোমাকে বলছি, এটি হবে কনফেডারেশন। শুধু তোমার ও আমার মধ্যেই কথা হয়েছে। আমার বিশ্বাস তুমি এ কথা আর কাউকে বলো নি।'
'আমিও তা গোপন রাখবো। কেন 'আমি তোমাকে বলছি। আমি এটি একান্তই গোপন রাখবো।' 'মুজিব বললেন, 'তা আমার কাছে ছেড়ে দাও। একান্তই আমার কাছে। আমাকে বিশ্বাস করো।'
জবাবে ভুট্টো বললেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'
মুজিবের স্পষ্ট জবাব, 'আমি যখন দেশে ফিরে যাবো তখন বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে তোমার এ কথা বলবো ... তুমি জানো। তোমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ইয়াহিয়া আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। আমি সেখানে গিয়ে ইয়াহিয়ার ফাঁসি দাবি করবো। তুমি বুঝতে পারছো। বিচার, বিচার। আমি বলবো। আগে এ লোকটির (ইয়াহিয়া) বিচার করো, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমার জনগণকে আস্থায় আনতে হবে। তারা দারুণভাবে আঘাত পেয়েছে।'
ভুট্টো প্রশ্ন করলেন, 'ইয়াহিয়া ও পীরজাদা—এ দু জনের মধ্যে তোমার কাকে সবচেয়ে বড় ভিলেন মনে হয়।'
'দু জনকেই।' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন।
'আমি জানি'।
মুজিবের জবাবে ভুট্টো সায় দিলেন। তারা তিনজনই তার হাতে বন্দি। বিগত রক্তপাত আর সন্ত্রাসী বছরের দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি শুধু রেহাইই পান নি বরং পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনটিও অধিকার করে আছেন। এখন ফের বাংলাদেশকে জয় করার জন্য তার আগ্রহের কথাই জানালেন বঙ্গবন্ধুকে।
ভুট্টো বললেন, 'শোনো, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রি যে পদ তুমি চাও সেটাই নিতে পারো। আমি অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। আমি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে বলছি, আমি অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছি।'
মুজিব জবাব দিলেন, 'আমি তোমাকে বলছি, এ ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমারও ধারণা ছিলো, আমরা এক সঙ্গেই দেশ চালাবো। কিন্তু এ হারামজাদা (ইয়াহিয়া) তোমায় কথা দিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে এবং ... আমার কথা

উল্টোভাবে তোমাকে বলেছে। এরপরই বাংলায় বিপর্যয় শুরু হয়।'
ভুট্টো তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'কিন্তু এখন আমরা সঠিক পথেই এগুচ্ছি।'
'আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।' মুজিব স্বীকার করলেন। 'কিন্তু তুমি জানো তার পথ কী। আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমাকে লড়তে হবে। (তুমি) জানো দখলদার আর্মি সেখানে অবস্থান নিয়েছে। ... আমাদের সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে ... ইন্দোনেশিয়ার মতো ... এখানে আরো একটি বিষয় আছে, আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছি ... পশ্চিম বাংলার মানুষ ... বাংলা থেকে তাদেরও বের করে নিতে হবে ... আমার অসুবিধাটি তুমি বোঝো!'
'হ্যাঁ, এটি কঠিন সমস্যা'। ভুট্টো স্বীকার করলেন। তাকেও এখন দুর্মুখ বিরোধীদের বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে যারা পাকিস্তানের গরিষ্ঠ অংশ হারানোর জন্য তাকে বিশেষভাবে দায়ী করছে।
'আমি ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত'। ভুট্টোর মন্তব্য ছিলো।
'না না'-মুজিব জোর দিয়ে বললেন। বেদনার সঙ্গে তিনি মাথা নাড়ালেন। মুজিব আরো জানালেন, 'আমি আমার জনগণের সঙ্গে দেখা করবো। ... আমি সময় চাই ...। আমি সেখানে গিয়েই তোমাকে জানাবো ... তুমি বীর বনে গেছো এবং সারাজীবন তাই-ই থাকবে।'
'না, আমি তা চাই না'—ভুট্টোর জবাব।
'তুমিই আমাদের প্রেসিডেন্ট হবে এবং ৫০ হাজার ডলার।' তিনি ঘুষের প্রস্তাব দিতেও দ্বিধা করলেন না।
এবার মুজিব ভীষণ ভড়কে গেলেন। তিনি ভুট্টোর কাছ থেকে কোনো অর্থ নিতে রাজি হলেন না। বললেন, 'বরং টাকাটা দিয়ে তুমি আমার জন্য একটি বিমান ভাড়া করে দাও।'
'৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মধ্যরাতের কিছুক্ষণের মধ্যে মুজিব পিন্ডি থেকে লন্ডনে রওনা হলেন। তখন পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে কোনো সরাসরি বিমান যোগাযোগ ছিলো না। মুজিব লন্ডন থেকে তেহরান বা আঙ্কারা রুটই বেছে নিলেন। ভুট্টোর অবশ্য অন্য প্রস্তাবও ছিলো।
পি.আই.এ'র জেট বিমান ভোর সাড়ে ছটায় ঘন কুয়াশার মধ্যে হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিদাতা বীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহামুক্তির আস্বাদ পেলেন। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে রোলস লিমুজিনে করে মে-ফেয়ারের কেন্দ্রস্থল ক্লারিজ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তির প্রথম দিন মধ্যাহ্নের আগেই তিনি তাঁর স্যুট থেকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধী, ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। হিথ পরদিন সহযোগী একটি কমনওয়েলথ দেশের প্রধানমন্ত্রিকে দেশে পৌঁছানোর জন্য রয়েল এয়ার ফোর্স বিমান পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মুজিব প্রথমে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুরো মন্ত্রিসভা তাকে বীরোচিত এক সংবর্ধনা প্রদান করে।

এদিকে ঢাকায় বাংলার জনসমুদ্র তার জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নবীন জাতি অধীর আগ্রহে বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় করছে—তিনিই তাদের সকল বেদনার উপশম ঘটাবেন এবং চাহিদা মেটাবেন। মুজিব যা চিন্তা করেছিলেন সমস্যার পরিমাণ তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোও মাত্রাতিরিক্ত সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। তার প্রত্যাশায় চেয়েও বেশি। সে সময়ে 'বালটি মোর সান'—এর প্রতিনিধির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমেরিকান জনগণ যদি রুজভেল্টের শাসন আমলের প্রথম ১০০ দিনের কথা চিন্তা করে তাহলেই আমাদের সমস্যা বুঝতে পারবেন।

আরো অনেকের মতো এ আমেরিকান সাংবাদিককেও ভুট্টো চৌকস কথামালা দিয়ে মুগ্ধ করেন। ভুট্টো সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেন, 'কঠিন পরিশ্রমী প্রেসিডেন্ট, প্রতি রাতে মাত্র তিন–চার ঘণ্টা ঘুমান। তার বেশির ভাগ রাতই কাটে করাচি ও পিন্ডির মধ্যে ভাগাভাগি করে।'

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যাকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়শই পূর্বসূরিকে দায়ী করেন।

করাচির এক জনসভায় তার মাতৃভাষা সিন্ধিতে ভাষণ দিতে গিয়ে ভুট্টো বলেন,

'আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমি আপনাদেরই একজন। আপনাদের মধ্য থেকেই আমি এসেছি। নিউ ইয়র্ক থেকে যখন আমাকে তলব করে আনা হয় তখন দেশ ছিলো গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি। ... আমার দেশবাসী এবং আমার মাতৃভূমি আমাকে চেয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম না পরিস্থিতি এতোটা খারাপ। কখনোই আপনাদেরকে সত্য কথা বলা হতো না। আমাকেও অসত্য খবর দেওয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া খান আমাকে ক্ষমতা নেওয়ার জন্য বললেন। ... আমি তাকে বললাম, দেশ এখন জ্বলছে। আমি এবং আমার দল গত এপ্রিলের জনগণের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলাম। ইয়াহিয়া এবং তার সহযোগীরা তখন বলেছিলেন, 'যারা ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলে তারা বিশ্বাসঘাতক।' এখন করাচির জনগণ রায় দেবেন—কে বিশ্বাসঘাতক? বিশ্বাসঘাতক তারা না আমরা? এই লোকগুলো কী করেছে? তারা শ্রমিকদের পিটিয়েছে ... কৃষকদের বুকে লাথি মেরেছে। তারা দেশকে ধ্বংস করেছে—এজন্যই আজ দেশের এই দুরবস্থা।'

ভুট্টো এখন ইয়াহিয়াকে টার্গেট করেছেন। অতীতে যেভাবে আইয়ুবকে করেছিলেন। জনগণের উদ্দেশ্যে ভুট্টো আরো বললেন,

'এই লোকটি (ইয়াহিয়া) রাজনীতিকদের শেষ করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন মিথ্যাবাদী, মদখোর ও বেঈমান। সব সময়ই জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। এই সেই ইয়াহিয়া খান, যিনি একদিন বলেছিলেন, 'আমার লাশের উপর দিয়ে ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।'

(২ ও ৩ জানুয়ারি, করাচির জনসভায় দেওয়া ভুট্টোর ভাষণ।)

৬ দফা এবং পাকিস্তানিদের চিন্তাধারা

বাঙালি এবং তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে ভুট্টোর ধারণা কখনোই ভালো ছিলো না। দু জনের রাজনৈতিক ঐতিহ্যও ছিলো একেবারে ভিন্ন। ছাত্রাবস্থায় মুজিব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিমলীগের তিনি ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, মুসলিমলীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অপরদিকে ব্রিটিশশাসিত সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রি শাহ নেওয়াজ আলী ভুট্টোর পুত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো এক কঠিন সময়ে রাজনীতিতে আসেন। অক্সফোর্ডে স্নাতক করা ভুট্টো ১৯৫৭ সালে প্রথম পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে জাতিসংঘে যান। ফিরে এসে তিনি এক চিঠিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার আলী মির্জাকে 'কায়েদে আজমে'র চেয়েও অনেক বড়ো নেতা বলে সম্বোধন করেন।

এরপর দীর্ঘ সাত বছর জেনারেল আইয়ুবের অধীনে মন্ত্রিত্ব করেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এ সুযোগে ভুট্টোও নিজেকে বিরোধী দলের কাতারে শামিল করেন। কিন্তু এ সিন্ধি ভদ্রলোক কখনো বাঙালির দাবি দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব 'পূর্বপাকিস্তানের বাঁচার দাবি' ৬ দফা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব মুজিবকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আখ্যায়িত করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং দলের সদর দপ্তরে অভিযান চালায়। ঘটনাটি গোটা পূর্বপাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক বছরের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহরগুলোতে আন্দোলন আরো বিস্তার লাভ করে। ১৯৬৬ সালের শেষ নাগাদ কয়েকশো লোক হতাহত হয়। দেশ প্রায় গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি। পিণ্ডির সামরিক সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যেও সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দেখা যায়। যদিও তখন আইয়ুব সূচিত বিপ্লবের মনুমেন্ট হিসেবে গড়ে উঠেছিলো বিশালকায় নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ। জুলফিকার আলী ভুট্টো দেখলেন পশ্চিমপাকিস্তানে তার সমকক্ষ কোনো নেতা নেই। পূর্বপাকিস্তানে মুজিব জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অতএব তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। নিজেকে পূর্বপাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ফেঁদে বসলেন। ১৯৬৭ সালের ১২ জানুয়ারি 'মাই ডিবাইট ইন জার্নালিজম' প্রবন্ধে ভুট্টো লিখেছেন :

'জন্মসূত্রে আমি একজন কৃষক এবং শিক্ষাগতভাবে আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিই হচ্ছে আমার সকল অনুপ্রেরণার উৎস এবং এক্ষেত্রেই স্থায়ী শিহরণ অনুভব করি। রাজনীতি একটি অত্যাধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্প ... রাজনীতিকে অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে। এটি কখনোই নেতিবাচক মনোভাব, স্লোগাননির্ভর এবং দস্যুতার শিহরণ-নির্ভর হতে পারে না।'

ভুট্টো এ নিবন্ধে কারো নাম উল্লেখ না করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। জেনারেল গুলহাসান—যিনি দু জনকেই চিনতেন, পরে বলেছেন, আমরা এমন দু জন জনপ্রিয় নেতাকেই পেয়েছি এবং এদের কেউই সত্য কথা বলতেন না।'

ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনীতিকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলে অভিহিত করলেও জেনারেল আইয়ুবের দমন-পীড়নকেও সমর্থন করেন নি। অন্যত্র তিনি লিখেছেন,

'সন্ত্রাস অথবা নির্যাতন কোনোটিই রাজনৈতিক সমাধান নয়। সমালোচনা অবশ্যই সঠিক এবং সমাধান ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবমুখী হতে হবে। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিহিংসা ও নিপীড়নের সম্পর্ক থাকতে পারে না। দু পক্ষের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।'

তবে (পরবর্তীকালে শাসনক্ষমতায় এসে ভুট্টো তাঁর নিজের কথারই বরখেলাপ করেছেন, বিরোধীদের ওপর চালিয়েছেন অত্যাচারের স্টিম রোলার।)

ভুট্টো জেনারেল আইয়ুবকে উদ্দেশ্য করে ব্যক্তিগত শত্রুতা ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আইয়ুব তা কখনো ভুলে যান নি। তিনি শিয়া ধর্মাবলম্বী জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে নতুন সেনাবাহিনী প্রধান এবং এস.জি.এম. পীরজাদাকে এডজুট্যান্ট নিযুক্ত করেন। তারা দু জনেই উপলব্ধি করেছেন জুলফিকার আলী ভুট্টো সহজ মনের মানুষ নন। তার সঙ্গে এঁটে ওঠা আসলেই অত্যন্ত কঠিন।

বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য যতো বড়ো হোক না কেন তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব ভালো ছিলো। অন্তত তারা বাইরে তাই দেখাতেন। ভুট্টো ঢাকায় হুসনা শেখের বাসায় বহুবার মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছেন। তারা একে অপরকে বিশ্বাস না করলেও ঘরোয়া বৈঠক দু জনই হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠতেন। সেখানে ভূট্টোর ভেজা ও ঈষৎ গোলাকার চোখে ক্ষমতার এক মোহ লক্ষ্য করা যেতো। অধিকাংশ পশ্চিমপাকিস্তানি যেমন বাঙালিদের ভুল বুঝতো তেমনি বাঙালিরাও তাদের প্রতি অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতো। নিজের আকাঙ্ক্ষার আয়নায় অন্যকে দেখতো অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। তারা দু জনই অনুভব করতেন যে-কোনো দেশ কিংবা জঙ্গলে এক সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ নেতা বা একজন রাজার অভ্যুদয় ঘটতে পারে। কিন্তু কখনোই দু জন নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে আইয়ুব ও ভুট্টোর ধারণায় খুব একটা পার্থক্য ছিলো না। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে পূর্বপাকিস্তান সফরকালে আইয়ুব প্রায় অপহৃত হচ্ছিলেন, তাকে হত্যারও হুমকি দেওয়া হয়। ভুট্টো এ ঘটনাকে ভারতের চক্রান্ত বলে পরারাষ্ট্র সচিবকে সতর্ক করে দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। আইয়ুবের ধারণা ছিলো মুজিব ভারতের সবচেয়ে বড়ো গুপ্তচর এবং আওয়ামীলীগ ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের পূর্ববাংলা শাখা মাত্র। ১৯৬৭ সালে মুজিব সমর্থক নেতা-কর্মীরা প্রায় সকলেই গ্রেফতার হন। এ সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দলের ৩২ জনের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করা হয় (যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত)।

১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ লাহোরে জুলফিকার আলী ভুট্টো তার 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' গঠনের ঘোষণা দেন। দলের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, *'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি এবং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।'* মুজিবের আওয়ামী লীগ এবং ওয়ালি খানের ন্যাপও নীতির দিক থেকে অনেকটা এর কাছাকাছি। তা সত্ত্বেও ভুট্টো পাকিস্তানি আদর্শ প্রচারের চেয়ে ভারতবিরোধী দর্শনের ওপরই বেশি জোর দেন।

এর আগের একটি বিশেষ ঘটনা।

ভুট্টো সবেমাত্র বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। তার ৭০ ক্লিফটনস্থ বাসভবনের সামনে মেহতা প্রাসাদ। মিসেস ফাতেমা জিন্নাহর বাড়ি। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আপন বোন তিনি। ফাতেমা জিন্নাহর কাছ থেকে ভুট্টো একটি চিরকুট পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। রোগক্লিষ্ট ৭৩ বছরের বৃদ্ধা উঠে তাকে স্বাগত জানালেন।

এরপর তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হয়। ফাতেমা জিন্নাহ শুরু করলেন, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম তাকে (আইয়ুব) ত্যাগ করো। এসব তোমারই ব্যর্থতা।'

এরপর তিনি ভুট্টোর বাবা স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করলেন। বোম্বেতে তারা কাছাকাছি থাকতেন। ড. প্যাটেলের সঙ্গে প্রায়ই 'টি পার্টিতে' দেখা হতো। সে পার্টিতে লিয়াকত আলী ও বেগম লিয়াকত আলী আসতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর ফাতেমা জিন্নাহ আসল কথায় এলেন। 'তুমি জানো আমার প্রেসিডেন্ট পদ ডাকাতি হয়ে গেছে।' পাঞ্জাবে এ ডাকাতি হয়েছে জঘন্যভাবে। তিনি আরো যোগ করলেন, 'আমি এখন বৃদ্ধ ও নিঃসঙ্গ। আমাকে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হবে। আমি আইয়ুবকে চরম এবং ঘৃণা ভরে ভর্ৎসনা করি।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ফাতেমা জিন্নাহ সম্মিলিত বিরোধী দলে যোগ দেওয়ার জন্য ভুট্টোকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো সে অনুরোধ রাখেন নি। একজন মহিলার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে রাজনীতি করার মানসিকতা তার ছিলো না। দ্বিতীয়ত হুসনা শেখের বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে রাজনীতি করাটাও তিনি মন থেকে মেনে নিতে পাঁরেন নি।

পশ্চিমপাকিস্তানে ভুট্টোর আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং পূর্বপাকিস্তানে ৬ দফার সংগ্রাম প্রায় একসঙ্গে চলতে থাকে। ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তির জন্য আইয়ুবকে দায়ী করেন। পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করে জেতা যাবে তার পরামর্শ দেন। বিশ্ব ইতিহাসের পাশাপাশি সমরাস্ত্র সম্পর্কে ভুট্টোর জ্ঞান পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষাটের দশকে ভুট্টোই প্রথম পাকিস্তানে পরমাণু অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা নেন। অপরদিকে পূর্বাংশের আন্দোলন প্রবাহিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে। এখানে প্রতিপক্ষ কেবল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নন, পাঞ্জাব তথা পশ্চিমপাকিস্তানের সমগ্র শোষক গোষ্ঠী। বাংলার মানুষ তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ৬ দফা আন্দোলন দ্রুত আওয়ামীলীগকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। জনগণের মধ্যে

এমন ধারণাও পরিলক্ষিত ছিলো যে, পাঞ্জাবি ও পাঠান শাসনের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির স্বাধীনতার পথেই এগুচ্ছেন।

মুজিবের ৬ দফায় প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত 'ফেডারেল সরকার' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, দেশের প্রতিটি অংশ কার্যত স্বায়ত্তশাসিত হবে এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়েই কর্তৃত্ব করতে পারবে। প্রদেশগুলো এককভাবে 'করারোপের অধিকার ভোগ করবে, তারা পৃথক অথবা সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য সবাই ন্যায্য অংশ কেন্দ্রের কাছে পাঠাবে। পূর্বপাকিস্তানের পাট দেশের বেশিরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে বিধায় আওয়ামীলীগ বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখারও পক্ষে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্বপাকিস্তানে (তারা অবশ্য 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণের পক্ষপাতী) নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনেরও প্রস্তাব দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারি, '৬৭ সালে পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ভুট্টো ব্যাপক সাংবিধানিক সফর শুরু করেন। করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত। সমাজতন্ত্র ও ইসলামকে দলের মুখ্য স্লোগান করায় গোড়াপন্থী কর্মীরাও দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। অপরদিকে মানুষকে মোহিত করার বিস্ময়কর বাকচাতুর্য ছিলো পুরোপুরি তার আয়ত্তে। ইংরেজি, সিন্ধি ও উর্দুতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। অতীতের ব্যর্থতার অনুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি তিনি মানুষের মনে আশাবাদ জাগ্রত করতে পারতেন।

পাকিস্তানের দুরবস্থা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি Starting with a clean state প্রবন্ধে লিখেছেন :

'আধা-গণতন্ত্রী, আধা স্বৈরতন্ত্রী। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাও আধা-আধি। চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব খণ্ডিত এবং আমেরিকার বিরোধিতাও আধা-আধি ... আমরা চাই বলিষ্ঠ, সাহসী একাগ্র ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব এবং আমাদের প্রয়োজন আদর্শের কর্মসূচি ... বিগত ২০ বছর ধরে পাকিস্তান ... মৌলিক গণতন্ত্রীরা এদেশের ব্রাহ্মণ ... দুর্নীতি দেশের প্রধান শিল্পে পরিণত হয়েছে ... কোথায় নিরাপত্তা? আপনারা পশ্চাৎপদ এলাকা থেকে এসেছেন, আমিও পশ্চাৎপদ এলাকা থেকে এসেছি। প্রশাসন কার্যত ভেঙে পড়েছে। আইন-শৃঙ্খলারও অবনতি ঘটছে ... মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে ... অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপের দিকে। অথচ আমাদেরই দ্বিতীয় জাপান হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আমি দেখছি না সেই স্বপ্নের দ্বিতীয় জাপান কোথায়?

ভুট্টো যখন আইয়ুববিরোধী বক্তৃতা-ভাষণে পশ্চিমপাকিস্তান তোলপাড় করে তুলেছেন তখন স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল রোগশয্যায় শায়িত। বিছানা থেকে ওঠারও তার ক্ষমতা নেই। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল মহিউদ্দিন দিনরাত তার পাশে থাকেন। আইয়ুব নিজেকেও তখন 'বিগত লোক' ভাবতে শুরু করেছেন। পারিবারিক সদস্যদের বাইরে মুখ্য সচিব এম.এম. ইউসুফ, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান, সাবেক সশস্ত্র বাহিনী প্রধান মোহাম্মদ মুসা, তথ্য ও বেতার সচিব আলতাফ গওহর এবং আই.এস.আই-এর মহাপরিচালক জেনারেল আকবরই কেবল তার সাক্ষাতের

অনুমতি পেতেন। আইয়ুব দেড়মাস হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির শেষদিকে জানা গেলো তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। জনগণের একাংশের ধারণা হলো, পাকিস্তানের প্রথম ফিল্ড মার্শাল এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

আইয়ুব যখন পিন্ডির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন মুজিব তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মাসের পর মাস দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আগেই নিরাপত্তা আইনে তাঁকে আটক করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার চার্জ গঠন করা হয়। আনীত অভিযোগে বলা হয়,

'তিনি ভারতীয় অস্ত্রের সাহায্যে পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আলাদা করার বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঢাকাস্থ ভারতীয় মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি.এন. হাকসারের মাধ্যমে ভারতের সীমান্তবর্তী প্রাদেশিক রাজধানী আগরতলায় (ত্রিপুরার রাজধানী) এ ষড়যন্ত্র আঁটা হয়। মুজিবের সহযোগীরা নিয়মিত পি.এন. হাকসারের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তারা পুনরায় গিয়ে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে বৈঠকের ফলাফল তাঁকে জানাতেন।'

প্রায় এক বছর ধরে এ মামলা সাজানো হয়। আইয়ুব ভাবলেন, মুজিবের ৬ দফার বিরুদ্ধে আইনগত লড়াইয়ের মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তা খর্ব করাই উত্তম পথ। এ মামলা দীর্ঘসময় ধরে চলতে থাকে এবং মামলা লড়ার পক্ষে 'প্রমাণাদি' যথেষ্ট ছিলো না। ১৯৬৮ সালের শেষদিকে চূড়ান্তভাবে মামলাটি পরিত্যাজ্য হয়।

১৯৬৮ সালে আইয়ুব যখন রোগশয্যায়, মুজিব জেলখানায় আর ভুট্টো তখন উচ্চকণ্ঠ রাজনীতিক হিসেবে আবির্ভূত হন। বার্কলে ও অক্সফোর্ডে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা'র ওপর যে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন সেটিই এখন নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চান। তিনি সব সময় মনে করতেন, রাজনীতি একটি বস্তুবাদী বিজ্ঞান এবং গণিতের মতো।

এ সময়ে তিনি সমগ্র পাকিস্তানের নেতা হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। বক্তৃতা-ভাষণেও তিনি পূর্বপাকিস্তানের জনগণের পক্ষে কথা বলেন। সিন্ধুর নওয়াবশাহ আইনজীবী সমিতির সমাবেশে ভুট্টো বলেন,

'অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হতে চায়। আমি বিশ্বাস করি না, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হতে চায়। পূর্বপাকিস্তানের মানুষ প্রভু নয়, বন্ধু চায়।'

এ নামে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একটি বই লিখেছেন। যদিও সে বইতে ভুট্টো কিংবা তাসখন্দ চুক্তির কোনো উল্লেখ ছিলো না। এবারে ভুট্টো সরাসরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি এবং তাঁর ও আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেওয়ার দাবি জানান।

ইতোমধ্যে পশ্চিমপাকিস্তানে ভুট্টোর দলের নেতা-কর্মীদেরও ব্যাপকভাবে ধর্‌পাকড় শুরু হয়। পুলিশ পি.পি.পি আয়োজিত সভা ভেঙে তছনছ দেয়, কর্মীদের হয়রান করে। দেশের উভয় অংশে বিরোধী দলের আন্দোলন-সংগ্রাম ঠেকাতে সরকারি দমন পীড়ন শুরু হয়।

ভুট্টো কঠোরতম ভাষায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সমালোচনা করেন। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব বিপ্লবের দশক উদযাপন করেন। ২৯ অক্টোবর এক সভায় ভুট্টো জনগণের উদ্দেশ্য বলেন,

'এই সরকার ক্ষমতার জন্য পাগল।...ভাইয়েরা আমি জীবনে ভুল করেছি। প্রত্যেক মানুষেই ভুল করে...কিন্তু আমার ভুলের জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি—প্রেসিডেন্টের কাছে যাই নি। আমার সবচেয়ে বড় ভুল, আমি এই সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তারা সমগ্র দেশের রক্ত চুষে খেয়েছে। তারা দেশের সকল সম্পদ আত্মসাৎ করেছে।'

পেশোয়ারের এক জনসভায় তিনি বলেন,

'এই সরকার রক্তখেকো। এরা খাজা নাজিমুদ্দিনকে খেয়েছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে খেয়েছে। আমি মাদারে মিল্লাতের নাম নিতে চাই না (ফাতেমা জিন্নাহ)। এই সরকার এবং সরকার এখনো ক্ষুধার্ত। কিন্তু এরা আমাকে খাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।'

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুবের পতন ও ইয়াহিয়ার আগমন

আটষট্টির ডিসেম্বর ও উনসত্তরের জানুয়ারিতে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নভেম্বরের শেষ দিকে পিন্ডিতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হলে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। সেনাবাহিনী এ সংঘাতে না জড়িয়ে নিজেদের ব্যারাকে আবদ্ধ রাখে।

এর মাত্র সপ্তাহখানেক পর ৭ ডিসেম্বর আরেকটি হরতালে ঢাকা একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে। এ সময়েও পুলিশের গুলিতে একাধিক বাঙালি তরুণ মারা যায়, অসংখ্য আহত হয়। হত্যার প্রতিবাদে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা ভাসানী মধ্য ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতালের ডাক দেন। মুজিবের আওয়ামীলীগও এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। ক্ষুদে দোকান থেকে শুরু করে সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। রাজপথ জনতার দখলে চলে যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেখলেন, তার দিন শেষ হয়ে আসছে। গোলাগুলি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া তিনি কোনো জনসভা করতে পারছেন না। কিংবা তার ভগ্নস্বাস্থ্যও পুরোপুরি পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নি। তবে এখনো তার হাতে একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আছে। তারা ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে সমর্থ না হলেও নিজ দেশে রাজপথের বিশৃঙ্খলা ও বিরোধীদের পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান, নৌবাহিনী প্রধান এস.এম. আহসান (১৯১০-৮৯) বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান—এদের কেউই বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গুলি চালানোর জন্য জওয়ানদের নির্দেশ দিতে আগ্রহী নন। বরং তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে জন্য আইয়ুবকে পরামর্শ দেন। সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান কিছুদিন আগে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৬৮ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি দল গঠনের ঘোষণা দিয়ে জনগণের অধিকারের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। প্রদেশব্যাপী আইনজীবী সমিতিসমূহের সমাবেশে আসগর খান গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের পক্ষে প্রচার চালান। তার ভদ্র ও মার্জিত কণ্ঠও জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভুট্টো কারাগার থেকে ছাড়া পেলেও তাকে লারাকানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 'আল মুর্তজা' কম্পাউন্ডে অন্তরীণ রাখা হয়। ইতোমধ্যে দেশের উভয় অংশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো অবনতি ঘটে। প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়। সর্বত্র আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। কার্যত দেশ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি এসে পৌঁছায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তিন বাহিনী প্রধানের পরামর্শ মেনে নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল সম্মেলন আহ্বানে রাজি হন।

'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' বা DAC প্রায় একই সময়ে গঠিত হয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রক্ষণশীল জামাতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামীলীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) যোগ দেয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আইয়ুবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে সম্মত হয়। কিন্তু এর পূর্বশর্ত হচ্ছে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন বাতিল করতে হবে। গত জানুয়ারি থেকে ঢাকা, করাচি, লাহোর ও পিণ্ডির রাজপথ ছিলো রণক্ষেত্র। পুলিশ ও ধর্মঘটী ছাত্র-শ্রমিকদের মধ্যে অব্যাহত সংঘাত দেশকে পুরোপুরি নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়।

ছাত্রদের নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা চেয়ে রেডিওতে ভাষণ দেন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখারও আহ্বান জানান। কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভ তখনো চলতে থাকে। তাদের একদফা, এক আওয়াজ আইয়ুবকে চলে যেতে হবে। তারা পুলিশী হামলার জবাব দেয় ইট-পাটকেল ও বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে।

১৪ ফেব্রুয়ারি 'আল মুর্তজা'য় অন্তরীণ ভুট্টো, মোস্তফা খান ও মোবাশ্বের হাসানসহ পি.পি.পি-র নেতারা ঘোষণা করেন, আইয়ুবের 'বর্বর মার্শল ল' প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তারা আমৃত্যু অনশন করবেন। ভুট্টোর এ ঘোষণা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মতো মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। দেশবাসী ও পাকিস্তানের জন্য তার এ আত্মোৎসর্গীত ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ভুট্টো তখন কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা নন, মুসলিম সুফীর মর্যাদা লাভ করেন।

এর মাত্র তিনদিন পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা তুলে নেন। অন্তরীণ অবস্থা থেকে ভুট্টো ও তার সহযোগীদের মুক্তি দেন। ফলে লারকানা তথা সিন্ধুতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। একই দিন উত্তম-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কারাগার থেকে খান আবদুল ওয়ালী খান মুক্তি পান। সিন্ধুর আকাশে বাতাসে 'জয় ভুট্টো' স্লোগান ধ্বনিত হয়। রাতারাতি তিনি 'কায়েদে আওয়াম' ও 'শহীদ নেতা'র মর্যাদা পান। একদা শক্তিধর এবং দীর্ঘস্থায়ী একনায়কের পতন ঘটাতে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার করেন।

জেনারেল আইয়ুবের প্রত্যাশা ছিলো, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। তিনি পূর্বপাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও মুক্তি দেন। অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের দু জনকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান। তার ইচ্ছে, আরো কিছুদিন ক্ষমতায় টিকে থাকবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয় নি। ভুট্টো আইয়ুবের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মতি জানান। তিনি আইয়ুব শাহীর পতনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। মুক্তির কয়েক দিন পর ভুট্টো করাচির এক সভায় হাজার হাজার মানুষের মুহূর্মুহু করতালি এবং উল্লাস ধ্বনির মাঝে ঘোষণা করেন,

'আমরা আমাদের বুকে বুলেট বরণ করে হলেও বিপ্লবকে সফল করবো। আমাদের রুটি ও কাপড় দাও, না হয় গদি ছেড়ে দাও।'

২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব ঘোষণা দেন যে, তিনি আগামি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এর পরদিন সরকারিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। একই দিন মুজিব জেলখানা থেকে ছাড়া পেলে ঢাকায় লাখো লাখো মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। সিন্ধিদের মধ্যে ভুট্টোর যে জনপ্রিয়তা বাঙালিদের মধ্যে মুজিবের জনপ্রিয়তা তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি। ছাড়া পাওয়ার পর তিনি পিন্ডিতে ১০ থেকে ১২ মার্চ আহূত আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন।

পূর্বাঞ্চল থেকে মওলানা ভাসানী এবং পশ্চিমপাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেন। মুজিব, ওয়ালী খানসহ অন্যান্য নেতা এতে যোগ দিলেও কোনো সাফল্য অর্জিত হয় নি। ধর্মঘট ও ছাত্র বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নগরীসমূহের জনজীবন হয়ে ওঠে নিরাপত্তাহীন। রাজনৈতিক হত্যাও স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। মার্চের শেষ দিকে পশ্চিমপাকিস্তানের রক্ষণশীল রাজনীতিকরা মওলানা ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, 'তারা দেশকে নৈরাজ্যের পথে নিয়ে গেছেন।'

২৫ মার্চ ১৯৬৯ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এক ঘোষণায় বলেন, 'আমার দেশের চরম বিপর্যয়ের মুখে আমি দেশ চালাতে পারি না।' তিনি চলে গেলেন চোখের পানি নিয়ে। বিদায় জেনারেল আইয়ুব শাহীর শাসন আমল।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মদের আসর এবং হুসনা শেখ

ফিল্ড মার্শাল দৃশ্যপট থেকে সরে গেলেন। কিন্তু তিনি বেসামরিক বা অন্তর্বর্তী কোনো সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি। তার শূন্য আসনে বসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। একাই তিনি প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী প্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান 'প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'ক্ষমতায় থাকার তার কোনো ইচ্ছে নেই।' সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান ইয়াহিয়ার এ ঘোষণায় আশ্বস্ত হতে পারেন নি। তিনি এ ক্ষুদে জেনারেলকে ভালোভাবে চেনেন এবং তার উচ্চাশার কথাও জানেন। এ কারণে অন্যান্য রাজনীতিকের মতো আসগর খানও সেনাবাহিনী প্রধানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে সহজে মানতে পারেন নি। আসগর খান সরাসরি গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টোও ইয়াহিয়াকে চিনতেন। তাকে নিয়ে ভুট্টো লারকানায় শিকারে বের হতেন এবং প্রত্যেক শিকারের আগে ও পরে দু জনে আকণ্ঠ মদপান করতেন। তাদের এ মদপানের আসরের অপর সহযোগী ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এম.জি.এম. পীরজাদা। ১৯৬৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি মদপান থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

লে. জেনারেল পীরজাদা ছিলেন আইয়ুবের সামরিক সচিব এটি পাকিস্তানি প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতার পদ। তিনি প্রেসিডেন্টের দৈনিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতেন, প্রেসিডেন্ট কখন কার সঙ্গে কতোটা সময় সাক্ষাৎ করবেন তাও ঠিক করে দিতেন। এসব বৈঠকে বেশিরভাগ সময়ই নিজে উপস্থিত থাকতেন। যে-কোনো মন্ত্রি বা পদস্থ কর্মকর্তার চেয়ে সামরিক সচিবই প্রেসিডেন্টের মেজাজ-মর্জি ভালো জানতেন। একজন চতুর সামরিক সচিব হিসেবে তিনি কার্যত প্রেসিডেন্টের সমান ক্ষমতা রাখেন।

পীরজাদা ছিলেন অত্যন্ত চৌকস সামরিক অফিসার এবং রাজনৈতিকভাবে উচ্চাভিলাষী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং ধৈর্যশীল। কিন্তু শেষদিকে আইয়ুব খান তাকেও পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে দিতে হয়। পীরজাদা এ অপমান কখনো ভুলতে পারেন নি। অন্যদিকে আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদ থেকে ভুট্টোও বাদ পড়েন ১৯৬৬ সালে। অভিন্ন শত্রুকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে দু জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে জি. ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন,

'ভুট্টো ও পীরজাদা একে অপরের চোখে আইয়ুব বিরোধিতাই অবলোকন করতেন এবং প্রথমজন সামরিক ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে প্রবেশের লক্ষ্যে দ্বিতীয়জনকে ব্যবহার করতে চাইতেন। এর অবশ্য ভিন্ন কারণও ছিলো। ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে বেশকিছু মামলা ঝুলন্ত ছিলো। আইয়ুবের পতন সত্ত্বেও সিন্ধুর প্রশাসক এবং লারকানা ও নোয়াদারো জেলা পুলিশ প্রধান মামলাগুলো পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৯৬৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ভুট্টো লারকানার পুলিশ সুপার এবং খায়েরপুর বিভাগীয় সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন আইয়ুব আমাকে নাজেহাল করার জন্য যাদের মুখ্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন তারা এখনো আমাকে নানাভাবে হয়রানি করছে। আমি জানি এটি বর্তমান শাসকদের নীতি নয়। কিন্তু উল্লিখিত কর্মকর্তারা বিভাজনের পথ বেছে নিয়েছে।'

এ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়ার একান্ত সহযোগী পীরজাদা তাকে আশ্বস্ত করেন এবং তখন পীরজাদার কথাই ছিলো আইন।

বিপরীত দিকে শিষ্ট ও সংযত রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পূর্বপাকিস্তান জুড়ে, ঘৃণার অগ্নিবাক্য রাশিতে, সবাইকে মোহিত করতে সক্ষম হন। মুজিবের আওয়ামলীগ ও তাঁর ৬ দফা কর্মসূচির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ভুট্টোকে শঙ্কিত করে তোলে। ৬ দফা পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' অংশের কার্যত স্বায়ত্তশাসন হলেও ভুট্টো এটাকে দেখেছেন 'বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হুমকি এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি চ্যালেঞ্জ' হিসেবে। একইভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া ও পীরজাদার চোখে 'মুজিব ও তাঁর পার্টি বাঙালির বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছেন—যে শক্তি জাতীয় ঐক্যের মূলে আঘাত হানবে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তার রাজনীতির বিভিন্নতা সম্পর্কে ভুট্টো একাধিকবার পীরজাদার মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়াকে বোঝাতে চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ৬ দফা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন, নিজেকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক প্রমাণের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

লারকানার ডেপুটি কমিশনার মাসুদ মুফতিকে লেখা চিঠিতে ভুট্টো বলেন,

'স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের মৌল নীতিমালা অর্জনই হচ্ছে আমার সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ও দলের প্রধান লক্ষ্য। আমি এমন কোনো অপ্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করি নি—যা দেশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলবে। তিনি এটাও স্মরণ করিয়ে দেন—এটি ভাবার কারণ নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাই সবকিছু করতে পারেন, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম এবং এককভাবে জনতার কাছে বিপুলভাবে নন্দিত। আর এ কারণেই তাঁর প্রতি ব্যতিক্রমী আচরণ করা হবে।'

জুলফিকার আলী ভুট্টো আরো বলেছেন,

'পাকিস্তানে অখণ্ডতা বিনাশকারী মুজিবের ৬ দফা সিন্ধুতেও সমর্থন লাভ করছে এবং এটি নিশ্চয়ই অশুভ ইঙ্গিত। এর ফলে পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতার ছায়া পড়তে পারে...দেশের ভেতরে ও বাইরে শত্রুতা পাকিস্তানের ক্ষতি করতে তৎপর....জামাআতে ইসলামি আমাদের প্রিয় ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইছে...কিন্তু তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সঙ্কট কাটাতে সক্ষম নয় ... এই ধরনের ধর্মীয় দলই অতীতে আহমদিয়াদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। ১৯৫৩ সালে সামরিক আইন জারির জন্যও তারা দায়ী। জামাআত তাদের ছুরি শাণিত করছে এবং আহমদিয়াদের সংখ্যালঘু ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে। তারা শিয়াদেরও বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এর মাধ্যমে দলটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেলিয়ে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। দেশের কল্যাণে কিংবা কোনো সরকারের পক্ষে এই চক্র ভালো কিছু করবে তা কখনো ভাবা যায় না।'

এখানে ভুট্টোর বিশ্লেষণ হয়তো যথার্থই মনে হবে। কিন্তু তিনিই ক্ষমতায় থাকাকালে পূর্বতন প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসেন এবং সাংবিধানিকভাবে আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করেন। পাকিস্তানকে আজ তার দায়ভার ভোগ করতে হচ্ছে। একইভাবে ভুট্টো পশ্চিমপাকিস্তানের অন্য সকল পার্টিকে 'দুর্বল' অথবা 'দোদুল্যমান' বলে বাতিল করে দেন। পি.ডি.পি.-কে 'নির্জীব ফসিলের সমাহার' বলে অভিহিত করেন। পূর্বাঞ্চলের পার্টিসমূহ সম্পর্কেও তার ধারণা উঁচু ছিলো না। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে বিবেচনা করতেন 'মস্কো অথবা পিকিংপন্থী হিসেবে' এবং ভুট্টোর চোখে মুজিবের আওয়ামীলীগ 'পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়।' স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার পিপলস পার্টিকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় এবং জনগণের পার্টি মনে করতেন।

ভুট্টো সম্পর্কে তার বান্ধবী হুসনা শেখের মন্তব্য,

'তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাই বলতেন। তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় আবেগপ্রবণ। তিনি যদি কিছু বলতেন, তা বিশ্বাস করেই বলতেন। হতে পারে শুরুতে এ ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ বা আস্থা ছিলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই বিশ্বাস করতেন। ... তিনি ছিলেন এ রকমই। ভীষণ একরোখা, অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং সম্পূর্ণ ও সবকিছু মিলিয়ে তিনি রক্তে মাংসের মানুষ ছিলেন। অতএব ভুল-ভ্রান্তিও করেছেন এবং সে ভুলের কথা আমার কাছে স্বীকারও করতেন। তিনি সবসময় হাসতেন এবং বলতেন, 'তুমি কখনো এর বাইরে আমাকে পাবে না। সব সময় আমি বিবেকের তাড়না বোধ করি ... তুমি জানো, জানো, এটি নির্জলা সত্য।'

১৯৬১ সালে ঢাকায় এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে ভুট্টোর পরিচয় হয়। মহিলার নাম হুসনা শেখ। ভুট্টোর চোখে 'ব্লাক বিউটি'। তখন তারা দু জনই বিবাহিত। হুসনার স্বামী আবদুল আহাদ ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। হুসনা শেখের জন্ম কলকাতায়। যদিও তিনি বাঙালি নন। তার বাবা ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোক। ব্যবসার উদ্দেশ্যেই কলকাতা আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হুসনার শৈশব-কৈশোরও কাটে কলকাতায়। আবদুল আহাদের সঙ্গে বিয়ের পর ঢাকায় আসেন।

প্রথম সাক্ষাতেই ভুট্টো হুসনার প্রেমে পড়ে যান। সে শুধু তার সৌন্দর্যের কারণে নয়, তার বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কথা বলার ভঙ্গিও ভুট্টোকে মোহিত করে। পাকিস্তানি মেয়েরা সাধারণত রাজনীতিক পুরুষদের বিষয় হিসেবে এড়িয়ে যেতে চান। এ ক্ষেত্রে হুসনা ছিলেন ব্যতিক্রম এবং ভুট্টোর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, বেনজিরও (ভুট্টোর জ্যেষ্ঠ কন্যা, পাকিস্তানের প্রয়াত ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি)।

প্রথমবার তাদের সাক্ষাৎ হয় এক বড় পার্টিতে। সেখানে তারা পাশাপাশি চেয়ারে বসে আলাপের সুযোগ পান। সেই সঙ্গে চলে আহার ও মদপান। আলোচনার বিষয় ছিলো মূলত রাজনীতি। ভোর চারটা পর্যন্ত এ পার্টি চলে।

পরবর্তী সময়ে হুসনা শেখ স্বীকার করেছেন,

'তিনি একজন প্রতিভাবান মানুষ। তিনি অনেক কিছুই করতে চাইতেন এবং অনেক কিছু ভাবতেন—যা বাস্তবায়নের যথেষ্ট সময় তার হাতে ছিলো না।' হুসনা আরো বলেছেন, 'বেশিরভাগ সময়ই আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতাম।'

ভুট্টোর জীবনে বহু নারী এসেছেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি আমীর বেগম নামে তার চেয়ে বয়স্ক চাচাতো বোনকে বিয়ে করেন। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ইরানি বংশোদ্ভূত নুসরাতকে। বোম্বে স্কুলে পড়া অবস্থায়ই তিনি একাধিক বান্ধবীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। এরপর বার্কলে, ইউএসসি, অক্সফোর্ডে অসংখ্য দেশি-বিদেশি মহিলার সান্নিধ্যে আসেন। অক্সফোর্ড পড়ুয়া বন্ধু পিলো মোদি তাকে নিয়ে বই লিখেছেন 'মাই ফ্রেন্ড জুলফি ভুট্টো।' কিন্তু হুসনা শেখের মতো অন্য কোনো নারী তার জীবনকে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি।

এরপর থেকে ভুট্টো সুযোগ পেলেই করাচি থেকে ঢাকা আসতেন। বছর শেষ হওয়ার আগেই নুসরাত বিষয়টি আঁচ করতে পারেন। তিনি ভুট্টোকে চ্যালেঞ্জ করলেন। ভুট্টো তার নতুন প্রণয়ের কথা শুধু স্বীকারই করলেন না, নতুন প্রেমিকার জন্য গর্ববোধ করলেন এবং তার উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। চার সন্তানের জননী নুসরাত এখনো সুন্দরী হিসেবে অপাংক্তেয়া নন। অতএব তিনি ভুট্টোর নতুন প্রণয়কে লারকানায় পরিত্যক্ত আমীর বেগমের মতো নীরবে সহ্য করলেন না। কিন্তু তার কোনো প্রতিবাদ ও চিৎকার কাজে লাগে নি। হুসনা শেখ কেবল রূপেই ভুট্টোকে মুগ্ধ করেন নি, গুণেও আবিষ্ট করেছেন এবং ভুট্টোর মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।

অপরদিকে ভুট্টো সম্পর্কে হুসনার ধারণাও ছিলো উঁচু। তিনি তাকে কেবল জেদি মানুষ হিসেবেই দেখেন নি। রাজনীতিতে জেদ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ক্ষমতার রাজনীতি হয়তো এরকমই। হুসনাও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। তিনি ভুট্টোকে তোষামোদ করতেন কিন্তু বুঝতে দিতেন না। সাজগোজ ছাড়াই তার পাশে বসতেন। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন।

ঢাকা এখন করাচির মতো। ভুট্টো লারকানা থেকে করাচিতে এসে যখন প্রথম নুসরাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে নাচের আসরে যোগ দেন। কিংবা বার্কলেতে ক্যারোলিনের সঙ্গে যেভাবে প্রেমাভিসারে যেতেন তখন নুসরাতও আজকের হুসনার মতো চালাকি করেছেন, তার জেদকে উস্কে দিয়েছেন, তার রোমান্টিক অনুভূতি বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কল্পনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন।

পরে এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নুসরাত কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছেন, 'একবারই তিনি প্রেমে পড়েছেন। ... সঙ্গে তার প্রণয় ছিলো। ... সে নাম উচ্চারণ করা তার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক।' নুসরাত আরো যোগ করলেন, 'ভুট্টো ফের আমার কাছে ফিরে এলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। তিনি জানালেন, আমার জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছিলো আমি তা জানতাম না।...আমি তাকে বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছুক নই।'

পার্সী নাম 'নুসরাত' শব্দের অর্থ বিজয়। শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। যে ঢাকায় ভুট্টো শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলেন সেখান থেকে ভুট্টো নিজেকে গুটিয়ে নেন। ফিরে যান তার নিজের সংসারে।

ভুট্টো সম্পর্কে হুসনার মন্তব্য হচ্ছে, 'তার সব কিছুই উত্তম। তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো প্রেমিক এবং উত্তম রাজনীতিক এবং তিনি ছিলেন...।' ১৯৬২ সালে এ 'কৃষ্ণ সুন্দরী'র প্রেমে আচ্ছন্ন ভুট্টো বলতে গেলে নুসরাতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

নুসরাত ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পাকিস্তানে পার্সি শিপিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আরদেশির কাওজজি ও তার স্ত্রী ন্যান্সী বলেছেন, 'আমরা তখন পিন্ডির ফ্লাসম্যান হোটেলে থাকি। একদিন নুসরাত ডেভিস্ হোটেল থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন, 'জুলফি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

নুসরাত এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অথবা তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য তাদের সাহায্য চাইলেন। ন্যান্সী ছিলেন আইয়ুবের মেয়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ন্যান্সী আরো জানান, 'সেদিন তার অবিশ্বস্ত স্বামী নুসরাতকে তল্পিতল্পাসহ বের করে দিয়েছিলেন।' দিন শেষ হওয়ার আগেই আইয়ুব ভুট্টোকে ডেকে বললেন, 'হয় স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নাও, অন্যথায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দাও।' ভুট্টো তার আদেশ মেনে নিলেন। কিন্তু পরদিনই ভুট্টো আরদেশির বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিলেন। তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আমি কখনো তোমাদের ক্ষমা করবো না।' এমনকি তিনি আইয়ুবকেও ক্ষমা করেন নি। দীর্ঘদিন ভুট্টো তার অপমানের কথা মনে রেখেছেন।

একজন জেনারেল হিসেবে আইয়ুব দ্রুত ভুট্টোকে ক্ষমা করেছিলেন। তার ধারণা, যে অধীনস্থ তার নির্দেশ মেনে নেয় তাকে বিশ্বাস করা যায়। তিনি আগেই ভুট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নুসরাতের ঘটনায় তা হয় নি। ইতোমধ্যে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রি মঞ্জুর কাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং খুব ক্লান্ত। আইয়ুব পরে সিদ্ধান্ত নেন মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে এ পদে বসাবেন। তিনি তখন সরকারি দায়িত্বে নিউ ইয়র্কে ছিলেন। হঠাৎ করে মোহাম্মদ আলীও হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। অতএব পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদে ভুট্টোর নিযুক্তিই চূড়ান্ত হলো। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ভুট্টো পররাষ্ট্রমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ পদ গ্রহণের যথেষ্ট পরিপক্বতাও তাঁর ছিলো। পরবর্তী তিনি তার প্রমাণও দেখাতে সক্ষম হলেন।

নুসরাতের বিয়ে ও হুসনা-ভুট্টো প্রেম পর্ব

১৯৬৩ সালটি ভুট্টোর কাছে সৌভাগ্য হিসেবে দেখা দিলো। সব কিছু তার পছন্দমতো হতে থাকলো। জানুয়ারিতে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রির দায়িত্ব নিলেন। এরপর 'ঢাকার হুসনা' স্বামীকে ছেড়ে করাচি চলে এলেন। সেখানে আগে থেকেই তার জন্যে বাড়ি ঠিক করা ছিলো। ভুট্টোর ৭০ ক্লিফটন-এর কাছেই। হুসনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখন আর তাকে ঢাকায় যেতে হয় না। বিকেলে দু জনে পাশাপাশি বসে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেন। মধ্যরাত পর্যন্ত ভিডিও দেখেন।

এদিকে ৭০ ক্লিফটন-এ চার সন্তানের জননী নুসরাত নিঃসঙ্গ, একাকী। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে আসে। বেনজিরের বয়স ১০। সোনম-এর ৭। তারা পড়ে মারির ইংলিশ বোর্ডিং স্কুলে। ৯ বছরের মুর্তজা করাচির অপর একটি বোর্ডিং স্কুলে। সবচেয়ে ছোট শাহ্নেওয়াজ থাকে মায়ের সঙ্গে।

নুসরাত তার স্বামীকে ভালো করে জানেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এখানে আর থাকবেন না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাবধান বাণীও ভুট্টোর মন ও আচরণে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি।

পরে নুসরাত বলেছেন, 'আমি তাকে বললাম, আমি আর এখানে থাকবো না। আমি দু সন্তানকে নিয়ে যাবো এবং দু জনকে এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি চলে যেতে চাই।' সত্যি সত্যি নুসরাত ৭০ ক্লিফটন ত্যাগ করলেন। মানসিক শান্তির জন্য ইরানে মা-বাবার কাছে ফিরে গেলেন। তিনি এমন পুরুষকে নিয়ে ঘর করতে পারেন না যিনি যখন যা খুশি করবেন। তিনি ৬ বছরের শাহনেওয়াজকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ভুট্টোর কঠোর নির্দেশ তার কোনো সন্তানকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রথমে তিনি জোরপূর্বক নুসরাতের যাওয়া বন্ধ করলেন। পরে নুসরাত তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ভুট্টোও তার অনড় মনোভাবের কথা জানতেন। শেষ পর্যন্ত তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তবে সন্তানদের যেতে দিলেন না। এমন কি নুসরাত ইরানে থাকতে মাকে চিঠিপত্রও লিখতে পারতো না।

দীর্ঘ ৬ মাস ইরানে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে কাটানোর সময় নুসরাত সন্তানদের কোনো

খোঁজ-খবর পান নি। যে-কোনো মায়ের জন্য এটি মেনে নেওয়া কঠিন। ৬ মাস পর তিনি সন্তানদের জন্য আবার করাচি ফিরে আসেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল পার্সী কন্যা নুসরাত নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করেন। তিনি ভুট্টোর 'রাতের অভিসার'কে পাত্তা দিতেন না। ন্যান্সী কাওয়াজজি এ সম্পর্কে বলেছেন, 'নুসরাত হৃদয়-সমুদ্রে কল্লোলিত বেদনার ঢেউ ও কান্নার স্রোত চেপে রাখতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান পার্টিতে ব্যস্ত থেকে। তিনি ছিলেন ভালো হোস্ট।'

ঘুমের বড়ি খেয়ে নুসরাত একবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। ভুট্টোর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ড. নাসির শেখ করাচির পার্কি হাসপাতালে এ যাত্রা তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে অতীতের কথা।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভুট্টো বার্কলে থেকে দেশে ফিরে আসেন তার বোন মান্নার বিয়ে উপলক্ষে। এ বিয়ের আসরেই প্রথম নুসরাতের সঙ্গে পরিচয়। পরে প্রেম ও বিয়ে। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন নুসরাত এভাবে,

'বিয়ে উপলক্ষে কিছু অলঙ্কার পরবো বলে ব্যাংকে যাই। ব্যাংকের স্ট্রং রুমে আমাদের অলঙ্কারগুলো জমা ছিলো। সেখানে গিয়ে দেখি মান্নার মা, এক ভদ্রলোক এবং একটি ছেলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তারাও এসেছে অলঙ্কার নিতে। আমাকে দেখেই মান্নার মা বলে উঠলেন, 'ওহ, নুসরাত তুমি কেমন আছো? এরপর তিনি ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই হচ্ছে মান্নার বন্ধু, নুসরাত। একইভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালেন, 'এ আমার পুত্র জুলফি ...'

নুসরাত ইস্পাহানি তখন করাচির সেরা সুন্দরীদের একজন। তার কুর্দি ইরানি বাবা-মা অনেক আগেই বোম্বে মাইগ্রেট করেছিলেন। ১৯২৯ সালে সেখানেই নুসরাতের জন্ম। তার বাবা ছিলেন বোম্বের ইস্পাহানি সাবান ফ্যাক্টরির মালিক। ১৯৪৮ সালে বোম্বেতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে তিনি করাচিতে পাড়ি জমান। নুসরাতের বাসাও ছিলো শহরের প্রাণকেন্দ্র ২৩ ক্লিফটনে।

নুসরাত ছিলেন স্বাধীনচেতা মেয়ে। তিনি পাকিস্তান ন্যাশনাল মহিলা গার্ডে যোগ দেন। পরে তিনি ট্রাক ও এ্যাম্বুলেন্স চালনা শেখেন। ন্যাশনাল গার্ডের ক্যাপ্টেন্ নির্বাচিত হন। একদিন ম্যারি আবদুল্লাহ নামে এক বান্ধবী এসে নুসরাতকে বললেন, 'মান্নার ভাইটি খুব হ্যান্ডসাম।' কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে ভুট্টোকে নুসরাতের কাছে তেমন হ্যান্ডসাম মনে হয় নি।

সে কি হ্যান্ডসাম নয়!

অবশ্য পরে মনে হয়েছে হ্যাঁ, সত্যিই সে হ্যান্ডসাম। এবং 'আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি'—পুরনো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নুসরাত বললেন, 'মান্নার বিয়ের দিন ভুট্টো-নুসরাতের আবার দেখা হয়। ভুট্টো তাকে 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে নাচেও আমন্ত্রণ জানান। নুসরাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হন। ভুট্টো যখন আরো নিবিড়ভাবে তাকে কাছে টানতে চান তখন তিনি বাঁধা দিয়ে বললেন, 'এটি আমেরিকা নয়, পাকিস্তান।' জবাবে ভুট্টো হাসতে থাকেন। সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় সেন্ট্রাল হোটেলে। খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই ভুট্টো তাকে গাড়িতে বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

নুসরাত বললেন, 'তার নিজের গাড়ি আছে এবং নিচে ড্রাইভার অপেক্ষা করছে।'
ভুট্টো কিছুটা হতাশ হলেন। পরে প্রস্তাব দিলেন, 'তিনি আইসক্রিম খাবেন কি না?'
এবারেও নুসরাত অসম্মতি জানালেন।
'তুমি কি জানো না আমি কে—ভুট্টো কিছুটা চড়া সুরে বললেন। আমি ছুটি কাটাতে এসেছি।'
নুসরাত ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলে নিলেন। তার সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলেন। এ সময়েই তিনি আবিষ্কার করলেন 'ভুট্টো সত্যিই হ্যান্ডসাম।'
মান্নার বিয়ের দু দিন পর ভুট্টো বন্ধুদের উদ্দেশে একটি পার্টির আয়োজন করেন। সেখানে নুসরাতও আমন্ত্রিত। সেই পার্টিতেই ভুট্টো তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।
প্রথমে এটাকে নুসরাত ঠাট্টা হিসেবে নেন। কেননা এক-দুই সপ্তাহ পরই ভুট্টো স্নাতক পর্বের পাঠ শেষ করতে বার্কলে ফিরে যাবেন। পথ বা সময়ের দূরত্ব ভুট্টোকে দমাতে পারে নি। বরং প্রেমের দাবিকে আরো সুদৃঢ় করেছে। শেষ পর্যন্ত এ পার্সী কন্যা তার দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে আসেন।
বার্কলেতে ভুট্টোর একাধিক বান্ধবী ছিলেন। কেউ স্থায়ী, আবার কেউ ক্ষণস্থায়ী। উইকএন্ড-ডে-তে তিনি লিলি নামে এক মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। লস এঞ্জেলস থেকে ভুট্টো যখন অক্সফোর্ডে পাড়ি জমান তখন ক্যারোলিন নামে এক মেয়ের প্রেমে পড়েন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এ মেয়ে তাকে চিঠিপত্র লিখতেন। তার শেষ চিঠি ছিলো বেদনা আর আর্তিতে ভরা :

'তোমার শেষ চিঠিরও বহু পূর্বে আমার ভেতরে ধারণা জন্মেছে যে, একদা তুমি আমার ছিলে ... সেই সুখস্মৃতি আজ মৃত ... এক সময় যে জুলফি আমার আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় যারপরনাই উদ্বিগ্ন ছিলো সে কীভাবে তার মন পরিবর্তন করেছে? বিষয়টি আমাকে ভীষণ আঘাত দিয়েছে ... যখন তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং অন্যকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা হারাবে ... তখন স্মরণ করো ... কীভাবে এক আমেরিকান মেয়ের হৃদয় তুমি হরণ করেছিলে।

(১৯৫১ সালের ১৩ অক্টোবর ভুট্টোকে লেখা ক্যারোলিনের চিঠি থেকে)

ভুট্টো-নুসরাতের বিয়ে হয় আরো দু বছর পর। ১৯৫১ সালে। ভুট্টো তখন বার্কলে ছেড়ে অক্সফোর্ডে আইন বিষয়ে পড়ছিলেন। করাচি ফিরে এসেই নুসরাতকে জানালেন, 'আমি গত দু বছর ধরে তোমার কথা ভাবছি। এখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'
ভুট্টোর প্রস্তাবে নুসরাত আনন্দিত হলেও বাইরে তা প্রকাশ করেন নি। নুসরাত তার বোনকে জানালেন। তিনি বললেন, 'তুমি কীভাবে তাকে বিয়ে করবে? তারা সিন্ধি, আমরা ইরানি!'
শেষ পর্যন্ত তারা বিয়েতে সম্মত হন। কিন্তু ভুট্টোর বাবা স্যার শাহনেওয়াজ এ বিয়েকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ভীষণ দুঃখ পান। যদিও মা আগে থেকেই নুসরাতকে জানতেন এবং পছন্দ করতেন।
বিয়ের পর তারা দু জনেই অক্সফোর্ডে চলে আসেন। প্রথমে তারা ক্রাইস্ট চার্চের কাছে একটি ছোট হোটেলে ওঠেন। প্রতি রাতে ১১টার মধ্যে ভুট্টোকে হোস্টেলে

ফিরে যেতে হতো। একদিন রাতে ভুট্টো ও নুসরাত ক্লাবে যান এবং ফিরতে দো৷র করে ফেললেন। ফলে ভুট্টোর আর হোস্টেলে যাওয়া হয় নি। পরদিন ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের কাউন্সিলর ট্রাভার রোপার না ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করলে, ভুট্টো তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তখন কাউন্সিলর বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারি না তুমি বিবাহিত।' এরপর থেকে নুসরাতও ভুট্টোর সঙ্গে হোস্টেলে থাকার অনুমতি পান। সে যাত্রায় তিনি সেখানে ছিলেন তিন মাসের মতো।

ভুট্টোর বাবা স্যার শাহনেওয়াজ ছিলেন বোম্বের মন্ত্রি। অভিজাত আবাসিক এলাকা মালাবার হিলে ছিলো তাদের বাসা। লর্ড ব্রাবর্ন, আগা খান, স্যার হোমি মোদিও ছিলেন একই এলাকার বাসিন্দা। জওয়াহের লাল নেহরুর বোন কৃষ্ণা নেহেরুও সেখানে থাকতেন। প্রায় প্রতিদিনই তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো। এক সঙ্গে পার্টি-অনুষ্ঠানে যেতেন। বিকেলে চায়ের আসর জমাতেন। ১৯৩৭ সালে ৯ বছর বয়সে ভুট্টো ভর্তি হন বোম্বের ক্যাথেড্রাল হাইস্কুলে। অপরদিকে হোমি মোদির পুত্র পিলো মোদি পড়তেন দেরাদুনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ভন স্কুলে। পিলোর চাচাতো ভাই সিলো ও জাহাঙ্গীর জাল মুগাশেঠ ছিলেন ভুট্টোর বন্ধু-সহপাঠী। কৈশোরে পড়াশুনার প্রতি তার তেমন মনোযোগ ছিলো না। ১৯৪৫ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ পরীক্ষায় ফেল করেন।

এর আগেই ভুট্টোর বিয়ে হয় তার চেয়ে বয়সি এক চাচাতো বোনের সঙ্গে। নাম শিরিন। বিয়ের পর নতুন নাম রাখা হয় আমীর বেগম। আমীর বেগমের বাবা খান বাহাদুর আহমেদ খান ভুট্টো ছিলেন অঢেল ভূ-সম্পত্তির মালিক। তার মৃত্যুর পর এ ভূ-সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশের মালিক হন ভুট্টো।

সে সময়েরই একটি ঘটনা। ভুট্টো তার চেয়ে বেশি বয়সের স্ত্রীকে নিয়ে কাশ্মিরের শ্রীনগরে যান মধুচন্দ্রিমা কাটাতে। ফিরে এসে ভ্রমণের সমস্ত ব্যয়ের বিল জমা দেন শ্বশুরের কাছে। শ্বশুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বিল পরিশোধ করেন।

পরে ভুট্টো নুসরাতের কাছে স্বীকার করেছেন, তার প্রথম বিয়েটা ছিলো প্রকৃতভাবেই সম্পত্তির জন্য। তিনি আরো জানান, আমীর বেগমের প্রতি তার কোনো শারীরিক আকর্ষণ নেই। প্রথম থেকেই আমীর বেগম লারকানায় আছেন। মাঝে মধ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানে করাচি আসেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরেও ভুট্টোর এক কন্যা আছে। যদিও সে বেনজিরের চেয়ে ছোট।

পিলো মোদির সঙ্গে ভুট্টোর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে শৈশব থেকেই। তারা পাশাপাশি বাসায় থাকতেন। পিলো দেরাদুন থেকে যখন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছেন ভুট্টো তখনো স্কুলে পড়েন। ১৯৪৫ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ভুট্টো পিলোকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যান মহিশুর হোটেলে। সেখান থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা জিন্নাহকে চিঠি লিখে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্কুল ফাঁকি দিয়ে ভুট্টো সুস্বাদু খাবার ও বলরুমে নাচ শিখতে যেতেন। তার এ নেশা ছিলো প্রবল।

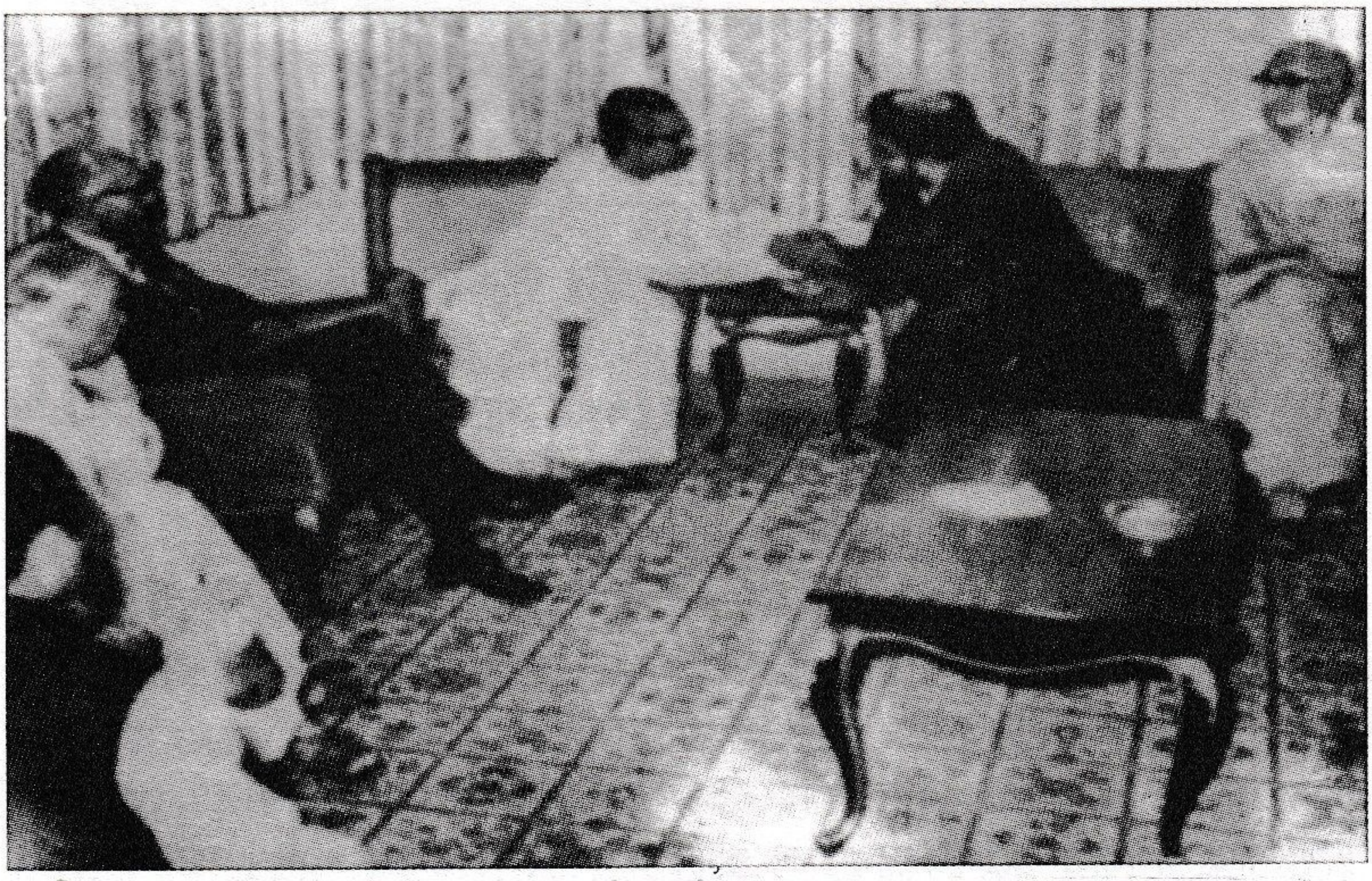
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টো বোম্বে ছেড়ে করাচিতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ভুট্টো একাই বোম্বে থেকে যান। কারমাইকেল

রোডের বাড়িতে তখন থাকতেন। তার সামনেই ভুট্টো পরিবারের বিশাল সাম্রাজ্য। ১৯৪৬-৪৭ সালেই যার ভাড়া ছিলো ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। ১৮ বছরের যুবক ভুট্টো দু হাতে টাকা খরচ করছেন। অনুষ্ঠান পার্টিতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়বার তিনি সিনিয়র ক্যামব্রিজ পরীক্ষা দিলেন। ভুট্টো ঠিক করলেন, করাচিতে ফিরে যাবেন না। দেশের বাইরেই পড়াশুনা করবেন। অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজে। কিন্তু তার আগে কোনো ভালো স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাঠ শেষ করতে হবে।

দেশ বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে উপমহাদেশব্যাপী যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো তখন ভুট্টো, পিলো এবং বোম্বের অন্যান্য ধনাঢ্য বন্ধু উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমালেন। পিলো সিদ্ধান্ত নিলেন, স্থাপত্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষা নেবেন এবং ব্রিটেনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়াকেই উত্তম মনে করলেন। তিনি হাভার্ড, বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএসসি) আবেদন করলেন। শেষমেশ এ তিনটি মধ্যে বেছে নিলেন ইউএসসি-কে। ভুট্টোও একই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। পাকিস্তানের বয়স তখন এক মাসেরও কম।

পাকিস্তান, জিন্নাহর মৃত্যু ও ক্ষমতার লড়াই

দেশে ফিরে ভুট্টো করাচি হাইকোর্টে যোগ দেন এবং অভিজাত সিন্ধু ক্লাবের সদস্য হন। যেখানে তিনি প্রায়শ পুরনো বন্ধুদের নিয়ে পানাহারে মিলিত হতেন। ভুট্টোর ইচ্ছে ভবিষ্যতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়া। এ কারণেই তিনি সাংবিধানিক আইনের ওপর বিশেষজ্ঞ হতে চান। তিনি মাঝে মধ্যে সিন্ধু মুসলিম আইন কলেজে বক্তৃতা দিতেন। বিভিন্ন সাংবিধানিক বিষয়ে নিবন্ধ লিখতেন—যা সিন্ধু ক্লাব, পার্লামেন্টে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতো।



চিত্র : ১২। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজ বাসায় বসে পশ্চিমপাকিস্তানের কয়েকজন নেতার সাথে আলাপ করছেন।

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত 'গণপরিষদ' নতুন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে নি। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের চেষ্টাও সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের দুই অংশের সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। পূর্ববাংলার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী তখন আইনমন্ত্রি। এরপর প্রধানমন্ত্রি হন। সংখ্যা সাম্যের এ মীমাংসা পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগণ মনেপ্রাণে মানতে পারে নি। কেননা মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগই ছিলো পূর্ববাংলায়। অন্যদিকে ২৮ ভাগ জনঅধ্যুষিত পাঞ্জাব নানাভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। সামরিক-বেসামরিক সরকারি চাকরি শতকরা ৮৫ ভাগ ছিলো পাঞ্জাবিদের দখলে। এ ক্ষেত্রে বাঙালিদের মতো সিন্ধি, বালুচ ও পাঠানরাও বঞ্চিত। পশ্চাৎপদ প্রদেশগুলো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি জানায়। এদের বিদ্যমান বিরোধের মীমাংসায় ৭ বছর খুব বেশি নয়। কিংবা ১৯৪০ সালের মার্চে গৃহীত যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার দিক-নির্দেশনাও পুরোপুরি অনুসরণ হয় নি।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ করাচিতে ফিরে নিজে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আসছিলেন। তার আগে দেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি যা বলছিলেন তাহলো,

'দেশটি হবে গণতান্ত্রিক, সামাজিক ন্যায়বিচার তথা ইসলামি মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমতা ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব কায়েম করতে হবে।'

জন্মভূমি করাচিতে ফেরার দু দিন পর নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ করাচি ক্লাবে আয়োজিত এক সভায় সহযোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

'আসুন, এখন একে অপরের প্রতি আস্থাবান হই। ... এখানে আগত সকল শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে যাবো, যদি আমরা স্বাধীন পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে একটি সুখী, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পেতে চাই তাহলে আমাদের ... দুই শিফ্টে কাজ করতে হবে।' ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট নতুন গণপরিষদের সভায় জিন্নাহ ঘোষণা করেন, *'সরকারের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, দ্বিতীয় দায়িত্ব ঘুষ এবং দুর্নীতি বন্ধ করা। দুর্নীতি সব কিছু কলুষিত করে ফেলেছে। অবশ্যই শক্ত হাতে তা দমন করতে হবে। কালোবাজারি আরেকটি ব্যাধি ...। সকল অনাচার নির্মমভাবে উচ্ছেদ করতে হবে।'*

জিন্নাহ আরো বলেন,

'যদি আমরা পাকিস্তানকে সুখ ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, আমাদের সর্বাত্মকভাবে জনগণের কল্যাণ, বিশেষ করে গরিব জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট থাকতে হবে।...যদি আপনারা অতীতকে ভুলে যান এবং সবাই মিলে একত্রে কাজ করেন...কে কোন্ সম্প্রদায়ের, অতীতে কার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক ছিলো, তাতে কিছু আসে যায় না। কিংবা তার কী বর্ণ, গোত্র অথবা জন্ম তাও বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রথম, দ্বিতীয় এবং শেষ কথা হচ্ছে এই দেশের প্রতিটি নাগরিক সমানাধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তার

দায়িত্বও সমান হবে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধারণাকে ... নির্মূল করতে হবে। আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক এবং সমান নাগরিক।'

তারপরে বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ মারা যান অসুখে।

অক্সফোর্ডের স্নাতক ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান আন্দোলনে ছিলেন জিন্নাহর প্রধান সহযোগী। ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা একসঙ্গে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু জিন্নাহর মতো জনসম্মোহনী ক্ষমতা তার ছিলো না। বহু প্রাণসংহারি ও লাখো উদ্বাস্তু জীবনের দুঃস্বপ্নবাহী দেশ বিভাগের ভার বহনের ক্ষমতাও তার ছিলো না। অপরদিকে বহু বছরের গোত্রীয়, আঞ্চলিক, ধর্মীয়, বর্ণবাদী ও ভাষাগত বিরোধ প্রত্যহ দেশের দুর্দশাকে বাড়িয়ে তুলছিলো। লিয়াকত আলীর উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ধারণী যে প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয় তাও চরম বিতর্কের সৃষ্টি করে। যদিও পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয়েছিলো।

লিয়াকত আলী খান উত্থাপিত প্রস্তাবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা, ইসলামের আলোকে সামাজিক, ন্যায় বিচারকে রাষ্ট্রের মৌলনীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। মৌলবাদী মুসলমানরা এর মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্র আবিষ্কার করে, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় যুক্তি দেখায়, 'এটি খুব বেশি ইসলামি হয়ে গেছে।' কাশ্মির প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে নমনীয় নীতি গ্রহণ করায় লিয়াকত আলী খান পাঞ্জাবি ও পাঠানদের সমর্থন হারান। তিনি কাশ্মিরে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা মেনে নেন। অন্যদিকে কট্টরপন্থী মুসলমানরা চাইছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে।

আশ্চর্য বিষয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা এবং তার প্রধান সহযোগী কেউই পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন না। জিন্নাহর জন্ম করাচিতে হলেও স্থায়ীভাবে তিনি বোম্বেতে বসবাস করতেন। লিয়াকত আলী খান ছিলেন উত্তর প্রদেশের আদি বাসিন্দা।

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক সমাবেশে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে এক ভাড়াটে আততায়ীর হাতে নিহত হন। সমাবেশে উপস্থিত লোকজন তাকেও মেরে ফেলে। এ প্রকাশ্য হত্যার সঙ্গে জড়িত কোনো ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেফতার বা অভিযুক্তও করা হয় নি। ঘটনাটি রহস্যজনকই থেকে যায়। আজো এটি রহস্যময় হয়ে আছে।

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রির পদটি ছিলো অধিকতর ক্ষমতাশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। খাজা নাজিমুদ্দিন একজন 'খাঁটি পাকিস্তানি' হওয়া সত্ত্বেও জন্মগত সূত্রে বাঙালি হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি নেতারা তাকে তেমন বিশ্বাস করতেন না। দুই পাকিস্তানের মধ্যে ছিলো হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব। মাঝখানে বিরাট দেশ ভারত। দুই

প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত কোনো মিল ছিলো না। একে অপরকে ঘৃণা না করলেও অবিশ্বাস করতো। ভুল বুঝতো। একই দেশের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে নোংরা, দুর্নীতিবাজ, অসৎ এবং নিষ্কর্মা বলে গাল-মন্দ করতো।

নাজিমুদ্দিন জানতেন, পাকিস্তানের পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক আমলারা তাকে যথাযথ সম্মান দেবেন না। ছায়া রাষ্ট্রপ্রধানের বেশি মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে নেই। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রি হিসেবে ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে। নাজিমুদ্দিন ব্রিটিশ সংসদীয় সরকার, আইনের শাসন ও জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রির পদ ছেড়ে গভর্নর জেনারেল পদে আসীন গোলাম মোহাম্মদ 'পাঞ্জাবি ক্ষমতার সার্বভৌমত্বে' বিশ্বাস করতেন। মন্ত্রি হওয়ার আগে তিনি নিজেও ছিলেন একজন আমলা এবং অবশ্যই পাঞ্জাবি।

জিন্নাহর 'একরাষ্ট্র তত্ত্ব' এবং পাঞ্জাবি ষড়যন্ত্র

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সামরিক সচিব ছিলেন কর্নেল নওয়াবজাদা সৈয়দ ইসকান্দার আলী মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯)। অভিজাত এ পার্সী ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ বাংলার নবাব পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ভুট্টোর বাবা শাহনেওয়াজের বন্ধু। ১৯৫৩ সালের শুরুতে লাহোরে মুসলিম মৌলবাদীদের উস্কানিতে দাঙ্গা শুরু হলে ইসকান্দার মির্জাই সেখানে সামরিক শাসন জারি করার জন্য গভর্নর জেনারেলকে উদ্বুদ্ধ করেন। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জামাআতে ইসলামি পরিচালিত এ নৃশংস দাঙ্গায় কয়েকশো লোক নিহত হয়। আহমদিয়ারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে এবং তারা বিশ্বাস করে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৫৬-১৯০৮) নতুন নবুয়ত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। খুব দ্রুত সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। গভর্নর জেনারেল নিজের কৃতিত্বে নিজেই আনন্দে আটখানা হন।

আকস্মিকভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রি পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে দেন। নাজিমুদ্দিন এ অপমান সহজে মেনে নেন নি। তিনি আদালতের শরণাপন্ন হলেন এবং বিদেশী বন্ধুদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানালেন। কিন্তু আদালতের কিছু করার ছিলো না। সুযোগ পেলেই পাকিস্তানি রাজনীতিকরা 'অভ্যুত্থান' ঘটাতেন। সেটি সামরিক অথবা বেসামরিক যাই-ই হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর সমর্থন ব্যতীত পাকিস্তানে কোনো সরকার একদিনও টিকে থাকতে পারে নি। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে গোলাম মোহাম্মদ যে 'বেসামরিক অভ্যুত্থান' ঘটিয়েছেন তাই এখন ক্ষমতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রি বানানোর জন্য গোলাম মোহাম্মদ আরেক বাঙালি নেতা মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে ওয়াশিংটন থেকে করাচিতে তলব করেন। তিনি ছিলেন নাজিমুদ্দিনের চেয়ে বয়সে তরুণ এবং দুর্বল চরিত্রের লোক। গোলাম মোহাম্মদ সে সময়কার স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তার ব্যাপক মার্কিন যোগাযোগও কাজে লাগাতে সক্ষম হন।

এ সময়েই পাকিস্তান 'মিডলইস্ট ট্রিটি অরগানাইজেশন' (METO) বা বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পরবর্তী সময়ে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় CENTO / এ ছাড়া পাকিস্তান 'সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশন' (SEATO) তেও যোগ দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র দেশে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রিসভায় ইসকান্দার মির্জা (যিনি ইতোমধ্যে নিজেকে মেজর জেনারেল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন) স্বরাষ্ট্র এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান (১৯০৭-৭৪) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। মোহাম্মদ আলী বগুড়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণকে বাঙালি তাদের প্রতি বড়ো ধরনের প্রতারণা হিসেবেই বিবেচনা করেছে। মূলত করাচির ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যেই নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে তাকে বসানো হয়েছিলো। এটিও ছিলো এক ধরনের 'অভ্যুত্থান।'

এদিকে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিমলীগের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। পশ্চিমপাকিস্তানি আমলাচক্র যা ভাবতো পূর্ববাংলার জনমত ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি উদার ও পরিপক্ক। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটি প্রতিফলিত হয়েছে যে, পশ্চিমা শাসকদের দ্বারা পূর্ববাংলার মানুষ প্রতারিত। তাদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রি মোহাম্মদ আলী বগুড়া সমগ্র পাকিস্তানকে একক কাঠামোয় নিয়ে আসার যে প্রয়াস নেন তাও সফল হয় নি। এমনকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে সালে মূল লাহোর প্রস্তাবে 'দুই জাতি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থেকে সরে গিয়ে এক জাতি রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা নেন। তারও পরিণাম শুভ হয় নি। লাহোর প্রস্তাব প্রণয়ন সাব-কমিটির সভাপতি ছিলেন বাঙালি নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। ফজলুল হক নিজে এবং সাব-কমিটির অধিকাংশ সদস্য প্রস্তাবে দুই জাতি রাষ্ট্রের কথা বুঝিয়েছেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে—যার অধিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম হবে।

লাহোরের সংবাদপত্রগুলো পরদিন 'পাকিস্তান প্রস্তাব' ব্যানার হেডিংয়ে খবরটি ছেপেছে। সাংবাদিকরা যখন জিন্নাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রস্তাবে এক না দুই রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এক'।

জিন্নাহর কাছে ভারতের মুসলিম জাতিকে নিয়ে দুই রাষ্ট্রের ধারণা ছিলো অবিশ্বাস্য। দুই রাষ্ট্র মানে দু জন কায়েদে আজম। এমন কি ব্রিটিশ শাসকদের মাথায়ও তৃতীয় রাষ্ট্রের চিন্তা ছিলো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা চেয়েছে যতো দ্রুত ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। তারা এককভাবে বাংলা ও পাঞ্জাব কোনো রাষ্ট্রের অধিভুক্ত করার বিপক্ষে ছিলো না। শিখরা চেয়েছিলো পাঞ্জাব অখণ্ড থাকুক। আবার সোহরাওয়ার্দি অবিভক্ত বাংলা শাসন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৫৫ সালের জুলাইয়ে মারিতে আহূত গণপরিষদ অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী বগুড়ার ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে অধিবেশনে পূর্ববাংলার নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ দেন—যার বেশির ভাগই বিরোধী আওয়ামীলীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্য। অন্যদিকে তিনি মুসলিমলীগ সদস্যদের সমর্থন আদায়েও তিনি ব্যর্থ হন। গোলাম মোহাম্মদ আলীর স্থলে সাবেক পাঞ্জাবি আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে বেছে নেন। আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আলী বগুড়া প্রধানমন্ত্রি পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এদিকে গভর্নর জেনারেল বয়োবৃদ্ধ গোলাম মোহাম্মদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি ধুরন্ধর আমলা-জেনারেল ইসকান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তার আস্থা অর্জনে সক্ষম হন এবং প্রধানমন্ত্রি পদে বহাল থাকেন। মোহাম্মদ আলী বগুড়া রাষ্ট্রদূতের চাকরি নিয়ে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ফিরে যান। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদও এক বছরের বেশি ছিলো না। তার পূর্বসূরি বাঙালি কূটনীতিক যদিও দু বছরের কিছু বেশি সময় এ পদে আসীন ছিলেন। কূটনীতিতে তিনি খুব ঝানু ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পরও কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি। শাসনতন্ত্রের মৌলনীতি কী হবে, প্রদেশগুলো কতোখানি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে এ নিয়ে দু অঞ্চলের এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের মধ্যে মতভেদ ছিলো অনেক। সাংবিধানিক অচলাবস্থা নিরসন এবং প্রদেশগুলোর অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন ফর্মুলা পেশ করা হলো। অর্থাৎ এক ইউনিট গঠন। পশ্চিমপাকিস্তানের সকল প্রদেশ নিয়ে একটি ইউনিট এবং পূর্বপাকিস্তান নিয়ে আরেকটি ইউনিট। এটি ছিলো চালাকিপূর্ণ ধারণামাত্র। এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলাকে যেমন বঞ্চিত করা হয়েছে তেমনি পশ্চিমপাকিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশগুলোর অধিকার খর্ব করা হয়েছে। একক ছাতার নিচে আসার নামে মূলত পাঞ্জাবি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সংহত করাই ছিলো এ ফর্মুলার উদ্দেশ্য। নবগঠিত পশ্চিমপাকিস্তান ইউনিটের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন সীমান্তগান্ধী খান আব্দুল গাফফার খানের বড়ো ভাই ড. খান সাহেব (১৮৮২-১৯৫৮)।

১৯৫৪ সালে প্রথম 'এক ইউনিট' পরিকল্পনা উত্থাপিত হলে ভুট্টো এর জোরালো প্রতিবাদ করেন। সে সময়ে তিনি এক প্রবন্ধে যুক্তি দেখান যে, 'এ সন্ত্রাসী প্রস্তাব বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোকে নিঃশেষ করে দেওয়া...এর মাধ্যমে প্রাচীন মহেঞ্জোদারো সভ্যতার গৌরববাহী সিন্ধু হবে পাঞ্জাবের জিম্মি।' তিনি অভিযোগ করেন, 'খুররো চক্র ভুট্টো পরিবারের রাজনৈতিক পতনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন।' সিন্ধুতে এ দুই পারিবারিক রাজনৈতিক বিরোধ ভুট্টোর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে খুররোর কন্যা হামিদা ভুট্টোর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনেন। তার মতে, 'ভুট্টো-খুররো পরিবার তথা তার প্রতিপক্ষকে চিরতরে নির্মূল করতে চায়।' এক ইউনিট' পদ্ধতির বিরোধিতার মাধ্যমে ভুট্টো প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য এক ইউনিট প্রথার বিরোধিতা করেন।

তখন মুখ্যমন্ত্রি ছিলেন পীরজাদা আবদুস সাত্তার। কয়েক সপ্তাহ পর গভর্নর জেনারেল তাকে সরিয়ে এম.এ. খুররোকে নতুন মুখ্যমন্ত্রি নিয়োগ দেন। এর এক মাসের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদে ১০০-৪ ভোটে এক ইউনিট প্রথা অনুমোদিত হয়। ২৭ বছর বয়স্ক ভুট্টো এখন পুরোপুরি রাজনৈতিক জীবনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে পা ফেলেন, দ্রুত এগুতে গিয়ে যাতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হন। তার ভাই ইমদাদ আলী লিভারের অসুখে ভুগছেন, বাবা শাহনেওয়াজ হাঁটা-চলায় অক্ষম। লারকানার বিরাট ভূসম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার হবেন তিনি। একই সঙ্গে ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হাতের মুঠোয় আনার স্বপ্ন দেখেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে অসুস্থ গোলাম মোহাম্মদের স্থলে গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন ইসকান্দার মির্জা। ফলে ভুট্টো ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আরো কাছাকাছি আসেন। তার বাবা ছিলেন ইসকান্দারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বোম্বেতে শাহনেওয়াজ মন্ত্রি থাকাকালে ইসকান্দার মির্জা তার অধীনে কাজ করেছেন। মাঝে মধ্যে বাসায় আসতেন। তিনি লারকানায় শিকারেও যেতেন ভুট্টো পরিবারের সম্মানিত অতিথি হয়ে।

ইসকান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর ভুট্টো আরেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেন। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। তিনি তখন দ্বিতীয় পাঁচ বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন। ইসকান্দার মির্জা ও আইয়ুবের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিলো। প্রথমজন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তার দহরম-মহরম বেশি ছিলো বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে। তিনি নিজেকে সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবেই গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, জেনারেল হিসেবে নয়। অপরদিকে আইয়ুব তাকে ভাবতেন 'আউট সাইডার'। উভয় জেনারেলই ভুট্টো পরিবারে যথেষ্ট সমাদর পেতেন। ভুট্টো দম্পতি প্রায়ই জৌলুসপূর্ণ পার্টির আয়োজন করতেন যাতে সকল পানাসক্তদের ভিড় জমতো। এসব পার্টিতে বিদেশী কূটনীতিক ও রাজনীতিকরাও যোগ দিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভুট্টো ও নুসরাত 'ভালো হোস্ট' হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষত আইয়ুব ও ইসকান্দার মির্জার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ন থাকে।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নতুন সংবিধান অনুমোদন করে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ১৬তম বার্ষিকতে 'ইসলামি ফেডারেল রিপাবলিক অব্ পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়। এ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানকে 'অবশ্যই একজন খাঁটি মুসলমান এবং তার বয়স ন্যূনতম চল্লিশ বছর হতে হবে।'

১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে ইসকান্দার মির্জা ছিলেন প্রথম ও একমাত্র প্রেসিডেন্ট। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এ মেয়াদকালে চারজন প্রধানমন্ত্রি ক্রমবর্ধমান সামরিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের লড়াই করে পরাস্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে দ্বিতীয়জন ছিলেন পূর্ববাংলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। তিনি ছিলেন রাজনৈতিকভাবে দূরদর্শী ও প্রতিভাবান। তার দল ছিলো আওয়ামীলীগ। সোহরাওয়ার্দীর পরে তার ভাবশিষ্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোহরাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রি নির্বাচিত হন। তিনিও সত্বর ভুট্টোর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করেন এবং তাকে আওয়ামীলীগে টানতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কোনো বাঙালি নেতার পেছনে কাজ করার মানসিকতা তার ছিলো না। একই সঙ্গে ভুট্টো মুসলিমলীগে যোগ দিতেও আগ্রহী নন। কেননা ততো দিনে দল হিসেবে মুসলিমলীগ জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মুসলিমলীগ সম্পর্কে ভুট্টোর মন্তব্য ছিলো,

'জিন্নাহ ও লিয়াকত এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান বয়স্ক নেতারা এর ভার বহনে অক্ষম। বলিষ্ঠতা ও দূরদর্শিতার বদলে পার্টি আত্মবিবরেই আশ্রয় নিয়েছে। মুসলিমলীগের শরীরে আত্মা নেই, তার ধড়টাই পড়ে আছে।'

ক্ষমতার লড়াইয়ে মির্জা বনাম আইয়ুব, নেপথ্যে ভুট্টো

এর আগে গভর্নর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা ড. খান সাহেবকে নতুন দল 'রিপাবলিকান পার্টি' গঠনে খুব উৎসাহিত করেন। খান সাহেবের সহযোগীরা ইতোমধ্যে আওয়ামীলীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে। মির্জা ভুট্টোকেও রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ভুট্টো তৃণমূল পর্যন্ত পার্টির জনসমর্থন না থাকায় সে অনুরোধ নাকচ করে দেন।

সে সময় ভুট্টো মুসলিমলীগের পক্ষে ওকালতি করতেও কার্পণ্য করেন নি। তিনি এক নিবন্ধে লিখেছেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে মুসলিমলীগ পুনরুজ্জীবিত করার কোনো বিকল্প আর নেই। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও জার্মানিতে হিটলারের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (নাজি) সপ্রশংস উদাহরণ টেনে বলেন, *'একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ এবং যখন একটি দল সে সাফল্য অর্জন করে তখন তার সম্ভাবনা কখনোই বাতিল করে দেওয়া যায় না।'* ভুট্টো 'বৃদ্ধ পাঠান ভদ্রলোক' খান সাহেব সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য ইসকান্দার মির্জার প্রতি আহ্বান জানান। ভুট্টো তার প্রতি কখনোই আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি তার চেয়েও বেশি অপছন্দ ও ভয় করতেন বাঙালি সোহরাওয়ার্দিকে। প্রধানমন্ত্রি পদে সোহরাওয়ার্দির নাম প্রস্তাব করায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ভুট্টোর আশঙ্কা ছিলো পাঞ্জাবি, বাঙালি, পাঠান কোয়ালিশন সরকার টিকে গেলে তা যেমন পাকিস্তানের উভয় অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হবে তেমনি অপাংক্তেয় থেকে যাবেন তিনি।

সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন ভুট্টোর 'চিরশত্রু' এম.এ. খুররো। তিনি ইসকান্দার মির্জাকে আরো স্মরণ করিয়ে দেন যে, রিপাবলিকান পার্টির চেয়ে আওয়ামীলীগ অধিকতর সংগঠিত। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের ব্যাপারে ভুট্টো ইসকান্দার মির্জাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। এ সময়ে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা তাকে করাচির মেয়র হওয়ার প্রস্তাব দেন। এ পদের প্রতি ভুট্টোর কোনো আগ্রহ ছিলো না। তার মতে, 'বৃদ্ধ বা যুবক কারো পক্ষেই পৌর করপোরেশনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়।'

এর আগে ইসকান্দার মির্জা তাকে জাতিসংঘ মিশন প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ প্রস্তাব ভুট্টোর জন্য নিঃসন্দেহে লোভনীয় ছিলো। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি মোহাম্মদ আলী বগুড়া তাতে ভেটো দেন। ইতোমধ্যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও পদচ্যুত হয়েছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি তরুণ ভুট্টোর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি দিলেন এবং সেপ্টেম্বরে ফিরাজ খান নুনের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন।

অক্টোবরে সোহরাওয়ার্দির সরকারের পতন ঘটে ভুট্টোর করাচি ত্যাগের মাত্র একমাস পর। নতুন প্রধানমন্ত্রি হয়ে আসেন মুসলিমলীগের নেতা আই.আই. চুন্দ্রীগড়। তার সরকার মাত্র দু মাস স্থায়ী ছিলো। পৃথক নির্বাচন বিল প্রশ্নে চুন্দ্রীগড়ের প্রতি রিপাবলিকানরা সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপের নেতা হিসেবে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রি নির্বাচিত হন ফিরোজ খান নুন।



চিত্র : ১৩। বাম থেকে জিল্লুর রহমান, বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।

পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্যার ফিরোজ খান নুন ইস্কান্দার মির্জা সম্পর্কে বলেছেন,

'নতুন সংবিধানের আওতায় তিনি নিজেই সরকারের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনো তার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলো না বলে তার সে প্রয়াস সফল হয় নি। নুন কখনোই তার প্রেসিডেন্টকে বিশ্বাস করতেন না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'ইসকান্দার মির্জার বড়ো গুণ ছিলো, তিনি সকল মতের লোকদের কাছে সহজে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। যখন তিনি আওয়ামীলীগ অথবা রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কাজ করতেন তখনো বিরোধী মুসলিমলীগ নেতার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতেন। ...পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অথবা অন্য ধরনের সরকারও অনেক বেশি স্থিতিশীল থাকা অবস্থায় ইসকান্দার মির্জা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যখন তিনি সংবিধান বাতিল করার ব্যাপারে মন স্থির করেন তখন

আর এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলাপ করেন নি। তিনি পুরোপুরি আমাকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। সোহরাওয়ার্দি জানতেন, 'আমার সরকারের পতন হলে ইসকান্দার মির্জা মার্শাল ল' ঘোষণা এবং একনায়কতন্ত্র কায়েম করবেন।'

জুলফিকার আলী ভুট্টোর ধারণা, রাজনৈতিক টানাপড়েন থেকে বেরিয়ে আসার সকল সম্ভাবনা তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে এক দশক পরে নিউ ইয়র্ক এসে ভুট্টো ভীষণ খুশি। তখন তার বয়স ৩০ বছরেরও কম। এ সময়েই তিনি একটি জাতিসংঘ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পান। নিউ ইয়র্কেই জাতিসংঘের উপমহাসচিব ইউসুফ বাচ্চির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাচ্চি এক সময়ে 'ফার অ্যান্ড্ নিয়ার ইস্টার্ন রিভিউ'র সম্পাদক এবং মুক্ত কাশ্মির পরিষদের প্রধান ছিলেন।

১৯৫৭ সালে ভুট্টো-নুসরাত দম্পতি গর্বিত তিন সন্তানের জনক-জননী। জ্যেষ্ঠ কন্যা বেনজিরের জন্ম ১৯৫৩, পুত্র মর্তুজার ১৯৫৪ এবং ছোট মেয়ে সোনমের ১৯৫৭-এ। সর্বকনিষ্ঠ ছেলে শাহনেওয়াজের জন্ম হয় পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে। ভুট্টো বরাবরই ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ে চিন্তিত এবং সতর্ক ছিলেন।

এর এক মাস পরই ভুট্টোর বাবা শাহনেওয়াজ খান লারকানায় মারা যান। ভুট্টো পিতার মরদেহ সমাহিত করার জন্য সেখানে যান। আল মুর্তজা ভবনে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া হাজার হাজার মানুষ আসেন ভুট্টোকে দেখতে। ত্রিশতম জন্মবার্ষিকীতে ভুট্টো বিরাট পারিবারিক ভূ-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি শুধু লারকানারই মালিক হন নি, পরবর্তীকালে সমগ্র পাকিস্তানেরও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। পরবর্তী দু দশক ভুট্টো বিরামহীন ও ক্লান্তিহীনভাবে শান্তির অন্বেষায় ছিলেন—যে শান্তি তিনি কখনো পান নি। পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর ভুট্টো ১৯৫৮ সালের মার্চে জেনেভা যাত্রা করেন। এবারে প্রতিনিধিদলের সদস্য নয়, নেতা হিসেবে। জেনেভায় তখন সমুদ্র আইনের ওপর চলছিলো জাতিসংঘ সম্মেলন। প্রেসিডেন্ট ও লারকানার শিকার-সহযোগী ইসকান্দার মির্জা ব্যক্তিগতভাবে তার নাম প্রস্তাব করেন। এ গুরু দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ড থেকে ভুট্টো তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিলেন,

'আমি মনে করি পাকিস্তানের জন্য আপনার সেবা অতুলনীয়। যখন বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকরা আমাদের দেশের ইতিহাস লিখবেন তখন তারা জিন্নাহ'রও আগে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবেন। আমি অনুভব করি বলেই একথা বলছি, আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট—সে কারণে নয়। একই চিঠিতে তিনি এটাও উল্লেখ করেন, আপনাকে তোষামোদ করছি না—অতএব এ কারণে আমার লজ্জিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই।'

ইসকান্দার মির্জা এখনো নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন এবং ফিরোজ খান নুনও প্রধানমন্ত্রি পদে আসীন রয়েছেন। কিন্তু এদের কেউই পাকিস্তানের মৌলিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন নি। দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে হতাশা ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার খুব দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

সেনাবাহিনী প্রধান দেশব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য প্রেসিডেন্টকে অভিযুক্ত করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের সুবিধানের বিরোধিতা করে বলেন, 'সকল সর্বনাশেরর মূলে হচ্ছে এ সংবিধান।'

(ফ্রেন্ডস, নট মাস্টার্স, জেনারেল আইয়ুব খান)

জেনারেল আইয়ুব তাঁর আত্মজীবনীতে আরো লিখেছেন, *'চতুর লোক হিসেবে (ইসকান্দার মির্জা) তার দেখা উচিত কীভাবে এ সংবিধান রাজনৈতিক চক্রান্ত ও দরকষাকষি কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গেছে...গতকালের দেশদ্রোহী আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রি হচ্ছেন...দেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার আসল চেহারা প্রকাশিত হয়েছে এবং যথেষ্ট বদনামও কুড়িয়েছে...।'* আইয়ুবও স্বীকার করেছেন ইসকান্দার মির্জা কখনোই নির্বাচন দিতে চান নি এবং সংবিধান বাতিল করার যুৎসই সুযোগ খুঁজতে ছিলেন। এ কথাও সত্য, প্রেসিডেন্ট যদি এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন তাহলে সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুবেরই তা সবার আগে জানার কথা।

খান সাহেব, শাহেদ আলী হত্যা ও দুই খলনায়ক

১৯৫৮ সালে ভুট্টোর কনিষ্ঠ ছেলে শাহনেওয়াজের জন্ম হয়। এ সম্পর্কে নুসরাত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি তখন গগল পড়তাম। এ কারণেই তার নাম রাখি গগল।' তিনি আরো জানান, আমার শাশুড়ি বললেন, 'তুমি ওকে শাহনেওয়াজ নামে ডাকতে পারবে না। তাতে তোমার শ্বশুরের প্রতি অসম্মান করা হবে। অতএব সে গগল নামেই পরিচিত হলো। সংক্ষেপে গোগি।'বেনজির সবেমাত্র লেডি জেনিংস নার্সারি স্কুল শেষ করে করাচির কনভেন্ট অফ জেসাস অ্যান্ড্ মেরি প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হন। মীর মুর্তজা বাড়িতেই থাকে।

এ সময়ই ভুট্টো পরিবার ৭০ ক্লিফটনের নতুন প্রাসাদোপম বাড়িতে চলে আসে। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তরুণী মা নুসরাতও খুব খুশি। তাদের নিয়েই ব্যস্ততা আর আনন্দের মধ্যে দিন কাটে। এটিই ছিলো ভুট্টো দম্পতির সবচেয়ে সুখের সময়।

পুরনো প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে নুসরাত বলেন, 'সে আমাকে ডাকতো 'নুসারাতাম' (আমার নুসরাত) বলে।

আমি ডাকতাম 'জুলফি'। মাঝে মধ্যে আমরা শব্দের ধাঁধা নিয়ে বসতাম। প্রায়শ সে জয়ী হতো। সে ছেলে-মেয়েদের যথেষ্ট আদর করতো। তাদের সঙ্গে খেলতো। কিন্তু যখন ওদের বয়স সাত, আট ও নয়-এ এসে দাঁড়ালো ভুট্টো ছেলেদের প্রতি সচেতন হয়ে উঠলো, তাদের কঠোর শাসনের মধ্যে রাখতে চাইলো—যাতে তারা সব ব্যাপারে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

বেনজির ভুট্টো—যিনি দু দু বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান, 'বাবা বার বার বলতেন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ই বলতে চাই তা হলো পড়াশুনায় ভালো করো।' বেনজির তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমরা যখন বড়ো হলাম, তিনি অঙ্ক ও ইংরেজির জন্য গৃহশিক্ষক রেখে দেন। স্কুলের ক্লাসের পর বিকেলে আমরা তার কাছে পড়তাম। পৃথিবীর যেখানেই

থাকতেন না কেন তিনি টেলিফোনে আমাদের স্কুল রিপোর্ট জেনে নিতেন। সৌভাগ্যত আমি ভালো ছাত্রী ছিলাম এবং এ কারণেই তিনি আমাকে দেশের বাইরে পড়ানোর পরিকল্পনা নেন।'

বাবা বলতেন, 'পিংকি (বেনজিরের ডাক নাম) দেশের বাইরে যাবে ছোট্ট শিশু হিসেবে এবং ফিরে আসবে শাড়ি পরিহিতা এক সুন্দরী মহিলা হিসেবে।' শাহনেওয়াজ তার সুটকেসে বহু কাপড়-চোপড় নিয়ে যাবে, কিন্তু ও সুটকেস কখনো বন্ধ হবে না।

নুসরাতের ভাষায়, 'সে জানতো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতে হয়। ছেলে-মেয়েরা তার সঙ্গে তর্ক করতে পারতো, কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমতও পোষণ করতো। তবে পিংকির 'চরিত্র ছিলো অবিকল বাবার মতো।'

জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনেভা থেকে ফিরে দেখতে পান পাকিস্তানের জীবন অতিশয় নিরানন্দ। কাজেরও তেমন ব্যস্ততা নেই। অথচ নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে তিনি পারিবারিক ও সাংগঠনিক কাজে খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। আবাদগড় সমিতি, পশ্চিমপাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ, পাকিস্তান সুতা কমিটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু এসব কর্মকাণ্ড তাকে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারতো না। তিনি দেশিয় রাজাদের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছেন, রানীদের সঙ্গে নাচে যোগ দিয়েছেন। লন্ডনের সেই বিলাসী জীবন এবং যুক্তরাষ্ট্রের উজ্জ্বল ও আলোকিত দিনগুলো কেবল তার স্মৃতিতে ভাসছে।

প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা যখন ভুট্টোকে পরবর্তী কেবিনেটে বাণিজ্যমন্ত্রি হওয়ার আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে পশ্চিমপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রি ড. খান সাহেব মে মাসে আততায়ীর হাতে নিহত হন। সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা হাউজের ভেতরেই চেয়ার ছুঁড়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে মেরে ফেলেন। প্রত্যেক দলের নিজস্ব মিলিশিয়া বাহিনী ছিলো। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রি ফিরোজ খান নুন সকল বেসরকারি মিলিশিয়া বাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সে সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল আইয়ুব খান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

'একজন সৈনিকের অবস্থান থেকে আমার স্পষ্ট ধারণা হলো, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আবার অব্যাহত যুদ্ধে রূপ নেবে।'

এরপর তিনি উপসংহার টানলেন,

'সেনাবাহিনী পছন্দ করুক আর নাই করুক শেষ পর্যন্ত তাদের পদক্ষেপ নিতে হলো। কেননা তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি জরুরি হয়ে দেখা দিলো।'

যে-কোনো সেনাবাহিনী অভ্যুত্থানের কারণ হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরই অজুহাত দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে দুই সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও একই অজুহাত দেখিয়েছেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কথা বলেও কেউ ফিরে যান নি। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা তার প্রধানমন্ত্রিকে লিখলেন, 'আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমি পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ না

করা পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালিত হতে পারে না। 'এভাবে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ১৯৫৬ সালের সংবিধান পরিত্যাজ্য হলো।

'প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা আরো যোগ করলেন, 'এ চিঠি আপনার হাতে পৌঁছার মধ্যেই দেশে সামরিক আইন বলবৎ হবে এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুবকে আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করলাম।'

(ফ্রম মেমোরি, ফিরোজ খান নুন)

চূড়ান্ত ঘণ্টা বেজে উঠলো। দৃশ্যপটে এলেন জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি ১৯৫৮ সালের ৫ অক্টোবর করাচি এসে পৌঁছে সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

'স্যার, আপনি কি মন স্থির করে ফেলেছেন?'—আইয়ুবের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ'—জবাব দিলেন ইসকান্দার মির্জা।

এর দু দিন পর ৭ অক্টোবর রাত ৮ টায় পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারের পতন ঘটে।প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা তখনই সামরিক আইন জারি করলেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান একে ঘোষণা দিলেন 'বিপ্লব'। এরা দু জনই ষড়যন্ত্রকারী অথবা পাকিস্তানের এ নাটকীয় পরিবর্তনের যুগ্ম সৃষ্টা। কিন্তু এ পরিবর্তন সুখের হয় নি কখনো।

আইয়ুব খান ইসকান্দার মির্জাকে বিশ্বাস করতেন না। তার বড়ো অভিযোগ ছিলো ইসকান্দার মির্জার সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী পার্সী স্ত্রী বেগম নাহিদের বিরুদ্ধে। তিনি ভেবেছিলেন, তার 'বিপ্লবে' ইসকান্দার মির্জাও সমান অংশীদার হবেন। কিন্তু পার্সী সুন্দরী তাতে বাঁধ সাধেন। ফলে তাকেই 'মির্জা'র কর্তব্য পালন করতে হয়। সামরিক বাহিনী পুরোপুরি আইয়ুবের অধীন। সরকার তথা নামকওয়াস্তে মন্ত্রিসভা ব্যতীত ইসকান্দার মির্জা তখন পোশাকি প্রেসিডেন্ট মাত্র। এ পদ আঁকড়ে থাকার তার কোনো নৈতিক জোরও নেই। হতভাগ্য অক্টোবরের দিনগুলোতে আইয়ুব ধীরে ধীরে সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে থাকেন। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে ইসকান্দার মির্জা শেষ চেষ্টা নেন। ২৭ অক্টোবর তিনি জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রি করে ১২ সদ্যসের এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

এ মন্ত্রিসভার তিনজনই ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য। জেনারেল আজম খান, বারকি ও শেখ। প্রকৃত অর্থে তারা আইয়ুবের একান্ত অনুগত। প্রধানমন্ত্রি পদকে জেনারেল আইয়ুব পদাবনতি হিসেবেই বিবেচনায় নিলেন। কেননা তাকে ইসকান্দার মির্জার অধীনস্থ হিসেবে কাজ করতে হবে। ওইদিনই বিকেলে তিনি তিনজন পদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠালেন মির্জা ইসকান্দারের কাছে। সরাসরি জানালেন, অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। তাহলে পেনশন ও জীবন দুটোই রক্ষা পাবে। প্রেসিডেন্ট বুদ্ধিমানের মতো পদত্যাগের প্রস্তাব মেনে নিলেন। জেনারেল আইয়ুব নিজের বিশ্বাসঘাতকতার দায় থেকে বাঁচার জন্য আত্মীজীবনীতে লিখেছেন,

'প্রেসিডেন্টর অফিস তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমি তাকে বললাম, আপনি আমার জন্য আর নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবেন না। কেন আমাকে বিরক্ত করছেন?

আমি আশা করেছিলাম, ইসকান্দার মির্জা নতুন পরিস্থিতিতে নিজ থেকে সরে যাবেন। আমরা এক সময়ে পরস্পর ভালো বন্ধু ছিলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি বড়ো ধরনের কোনো ভুল না করা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কিছু করা আমার পক্ষে অবাধ্যতা হবে। ... কিন্তু সামরিক সদর দপ্তর ও সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তারা সবাই জানিয়ে দিলো আপনি যাই-ই করুন না কেন এ লোকটাকে শেষমেশ চলে যেতে হবে। তাদের শঙ্কা ছিলো, আমাদের নীতির প্রতি জনগণের হয়তো আস্থা নেই ...। সবশেষে আমি বললাম, তোমরা যদি তাই চাও, আমি যাবো এবং তাকে বলবো। তারা জবাব দিলো 'না আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। আপনার পক্ষে আমরাই যাবো।'

(ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স, জেনারেল আইয়ুব খান)

তিন সপ্তাহের মধ্যে এটি ছিলো আইয়ুবের 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। পরদিন তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। তিনি ভুট্টোসহ মির্জার কেবিনেটের সবাইকে বহাল রাখলেন। আইয়ুবের দীর্ঘ আত্মজীবনীতে ভুট্টোর নাম উল্লেখ নেই। ১৯৬৭ সালে 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স' প্রকাশিত হয়। তার এক বছর আগে ভুট্টো আইয়ুবের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েন। পরে ভুট্টো আইয়ুবের আত্মজীবনী সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি মিথ্যায় ভরা। কালো মিথ্যা, সাদা মিথ্যা—সকল ধরনের মিথ্যা দিয়ে পূর্ণ ছিলো এ বই।'

ইসকান্দার মির্জা তার পার্সী স্ত্রী বেগম নাহিদসহ লন্ডনের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেন এবং ১৯৬৯ সালের ১৩ নভেম্বর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। সত্তর বছর আগে যে দেশে জন্মেছিলেন—সেই ইরানেই তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। ইসকান্দার মির্জার পুত্র হুমায়ুন তার বাবার আত্মজীবনী লেখেন এবং তার একটি কপি ভুট্টোকে পাঠিয়েও দেন। মির্জা সম্পর্কে একদা ভুট্টো ভূয়সী প্রশংসা করলেও তার বন্ধু পিলো মোদিকে লিখেছেন, 'এ ভদ্রলোক রাজনীতির কিছু জানেন না। তিনি ভাবতেন সদিচ্ছা, তামাশা ও চাতুর্য দিয়েই রাষ্ট্র চালানো সম্ভব।'

জেনারেল আইয়ুব বিপ্লবের অংশীদারের চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি স্থায়ী প্রমাণ করেছেন। পাঠান এ সামরিক কর্মকর্তা যে-কোনো জওয়ানের মতো সব সময় অস্ত্র বহন করতেন। নিজেকে 'সাধারণ মানুষ' হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। অথচ বিপ্লবের আগে থেকেই তিনি পাকিস্তানের যে-কোনো লোকের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন। পাকিস্তানে আরেকজন 'সাধারণ মানুষ' অধিককাল ইসলামাবাদ-পিণ্ডির ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। তিনি হলেন জেনারেল জিয়াউল হক।

ভুট্টোর মন্ত্রিত্বের শুরুতে আইয়ুব খানের সঙ্গে তার অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। আইয়ুবও এম.এ. খুররোর চেয়ে সিন্ধুর এ চৌকস রাজনীতিবিদকে পছন্দ করতেন প্রথম সুযোগেই আইয়ুব কালোবাজারের অভিযোগে এম.এ. খুররোকে গ্রেফতার করেন। করাচিতে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নতুন নয়। ভুট্টোর সুবিধা ছিলো, তিনি এর আগে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তিনি মন্ত্রিসভার বয়স্ক সহকর্মীদের চেয়ে বেশি জানতেন, আইয়ুবকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। আইয়ুবও তাকে পছন্দ করতেন। তিনি কোয়েটা বা লাহোর গেলে ভুট্টোকে সঙ্গে নিতেন। কোয়েটায়ই জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে ভুট্টোর প্রথম পরিচয়। পরবর্তী

সময়ে পানশালায় দুই ঝানু মদখোরের প্রায় দেখা হতো। গুল হাসান প্রথম পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে,

'জুলফির প্রথম বাক্যই ছিলো- দুঃখিত, আমি দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু আমি বৃদ্ধকে (আইয়ুব) বিছানায় রেখে তারপর এখানে এসেছি। আমি এখন মুক্ত।'

গুল হাসান আরো বলেছেন, *'ভুট্টো সত্যিই আমুদে মানুষ, হাসি-ঠাট্টা করতেন এবং নিজেকে উপস্থাপন করতে জানতেন।'*

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ুব ও ভুট্টো লাহোরে যান এবং কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেন। তারা নতুন সরকারের পক্ষে যুক্তি দেখান, গৃহীত নীতিমালা ব্যাখ্যা করেন। ব্যবসায়ীদের এক সমাবেশ আইয়ুব তাদের মুনাফা অর্জনের প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, পেছনে নয় সামনে তাকান, সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র উপায় হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম, সৎ পরিশ্রম এবং সাধু পরিশ্রম। ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র সমাবেশে ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানের জন্য এককেন্দ্রিক সরকারই হচ্ছে সর্বোত্তম।' অথচ কয়েক বছর আগেও তিনি ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন। নিজের পূর্ব অবস্থান থেকে ভুট্টো এভাবেই সরে যান।

ভুট্টো জেনারেল আইয়ুবকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব পালন করা আইয়ুবের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিলো না। তিনি মোহাম্মদ মুসাকে জেনারেল করে সি-ইন-সি পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৫১ সাল থেকে আইয়ুব এ পদে ছিলেন। মুসার পদ এখন তার সমকক্ষ। তিনি শঙ্কাবোধ করলেন।

ইতোমধ্যে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে তারা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে একটি লিখিত কাগজ পেশ করেন। এতে বলা হয়েছে, 'দেশ ভুল পথে চালানো হচ্ছে। যা কিছু ঘটছে সবই ভুল। আইয়ুব জেনারেল মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে কথা এখানে বলা হয়েছে তা কি তোমারও মত?'

মুসা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সবারই মত এ রকম।'

এরপর আইয়ুব ক্রুদ্ধস্বরে জানিয়ে দিলেন, *'এর সঙ্গে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। অতএব এ নীতি অব্যাহত থাকবে এবং কেউ প্রগতির পথকে বানচাল করতে পারবে না। এরপরও আইয়ুবের মনের অস্বস্তি কাটে নি।'* তিনি ভুট্টোর পরামর্শ চেয়ে বললেন, *'কীভাবে নিজের অবস্থানকে সংহত ও তাদের ওপরে রাখা যায়?'*

ভুট্টো তাকে বললেন, 'এ ক্ষেত্রে একটিই পথ আছে—সেটি হলো জেনারেল থেকে আপনার নিজেকে ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করা।'

এ জবাবে আইয়ুব চমৎকৃত হলেন। বললেন, 'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া।'

অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতেই তিনি নিজেকে 'ফিল্ড মার্শাল' হিসেবে ঘোষণা করলেন। তখন ভুট্টো নিউ ইয়র্ক গেছেন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে। জেনারেল আইয়ুবের সামরিক সচিব টেলিফোন করে এ পরামর্শের জন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

একইভাবে ভুট্টো আইয়ুবের নতুন সংবিধান রচনায় ও নতুন নির্বাচনের ব্যাপারেও সাহায্য করেন। তিনি ফিল্ড মার্শাল সূচিত বিপ্লবের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু কর্মসূচিও তৈরি করে দেন। আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রি ও পাঞ্জাবি বিচারক মঞ্জুর কাদের জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। এ ব্যুরো সরকারের কাছে জনগণ কী চায় যেমন তা নির্ধারণ করবে তেমনি সরকার পরিচালনার জন্য সৎ মানুষও খুঁজে বের করবে। এ ধারণা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মনোপুত হলো এবং তিনি ভুট্টোকেই 'জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো' প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিলেন। ভুট্টো তখন তথ্য বেতার, গ্রামীণ সাহায্য, মৌলিক গণতন্ত্র, পর্যটক ও সংখ্যালঘু বিভাগের মন্ত্রি। ভুট্টোর নিজের লোভ মঞ্জুর কাদেরের দপ্তরের প্রতি। কিন্তু তার জন্য তাকে আরো দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র, ভুট্টো ও কাশ্মির

১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব 'মৌলিক গণতন্ত্র' Basic Democracy চালু করলেন। তার মতে 'এটি গোটা কাঠামোটি নিচ থেকে উপরে বিনির্মাণের এক পদ্ধতি। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে সমগ্র জনগণকে নিয়ে আসার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।' পরবর্তীকালে পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একে 'মৌলিক ফ্যাসিবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি ছিলেন জেনারেল আইয়ুবের অনুগত এবং অবশ্যই তার ব্যবস্থারও। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রী মন্ত্রি হয়ে ভুট্টো নিজ প্রদেশ সিন্ধুর বিভিন্ন স্থানে এর পক্ষে জনসভা করেন। জনগণকে চার স্তরবিশিষ্ট গণতন্ত্র বোঝান। মৌলিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো দেশের সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতিকে মোট ৮০ হাজার ভোটারের মধ্যে নিয়ে আসা। স্বাভাবিক কারণেই তাদের আনুগত্য এবং সমর্থন লাভও সহজতর।

এ সময়ই ভুট্টোর সঙ্গে সিন্ধুর অপর প্রভাবশালী নেতা গোলাম মোস্তফা জাতোই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। জাতোই তার সম্মানে একটি পার্টিরও আয়োজন করেন। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভুট্টো যেমন প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তেমনি বৈদেশিক নীতিনির্ধারণেও তার ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রি ছিলেন মঞ্জুর কাদের। জাতিসংঘসহ বিদেশে বেশির ভাগ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন ভুট্টো। আঙ্কারা, প্যারিস, ডান্ডি, লন্ডন, টরেন্টো, তাসখন্দ, মস্কো, নিউইয়র্কে, এবং ওয়াশিংটনে ঝটিকা সফর করতেন। ১৯৫৯ সালের জাতিসংঘ রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকে ভুট্টো ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আলজেরীয় জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানান। পাকিস্তানের পক্ষে তিনি আলজেরিয়ায় স্বাধীনতাকামী অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। এটি ছিলো ভুট্টোর প্যান ইসলামি কূটনীতির প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী সময়েও তিনি মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ভাব রেখে চলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার 'শত্রুতার' প্রধান কারণ কাশ্মির নিয়ে বিরোধ। কাশ্মির নিয়ে দু দেশের মধ্যে ইতোপূর্বে একবার যুদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীর 'ভূ-স্বর্গ' নামে

খ্যাত কাশ্মিরের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মুসলিম। কিন্তু তার শাসক মহারাজ হরি সিংহ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তিনি প্রথমে দুই বৃহৎ প্রতিবেশীর কারো সঙ্গে না গিয়ে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চলতে চাইলেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে পাঠান উপজাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কাশ্মিরে অভিযান চালায় এবং শ্রীনগর দখল করে। মহারাজ হরি সিংহ তখন শ্রীনগর থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান। তিনি তার রাজ্য উদ্ধারের জন্য ভারতের সাহায্যও কামনা করেন। এরপর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মিরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অঘোষিত যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সেখানে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এ ঘটনা ভবিষ্যতে মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

এর আগে গর্ভনর জেনারেল জিন্নাহ শ্রীনগর থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য বিতাড়িত করার জন্য সেখানে সামরিক অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। মাউন্ট ব্যাটেন তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। ভারত ও পাকিস্তানের উভয় অংশের সামরিক বাহিনীর কমান্ডও তার হাতে। রাজকীয় ব্রিটিশ অফিসাররা মাউন্ট ব্যাটেনের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে শ্রীনগরে ভারতীয় সেনাদের দখল পাকাপোক্ত হয়ে যায়। জিন্নাহ একে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে নেন এবং তিনি পাঠান স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। এ স্বেচ্ছাসেবকরা ভারতীয় বাহিনীর সামনে টিকতে পারে নি। মাউন্ট ব্যাটেন এবং নেহেরু দু জনই অঙ্গীকার করলেন গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মিরের জনগণই কাশ্মিরের ভাগ্য নির্ধারণ করবে এবং সকল আগ্রাসী বাহিনীকে সেখানে থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

কাশ্মিরে আদৌ কোনো গণভোট নেওয়া হয় নি। পাকিস্তান সেখানে ভারতীয় সেনা থাকতে একতরফা তাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রত্যাহারে অসম্মতি জানায়। এর ফলে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি সীমানা বরাবর কাশ্মির ভূখণ্ড বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের দখলে চলে আসে। রাজধানী শ্রীনগরসহ বাকি অংশ ভারতের অধীনে। জাতিসংঘ এরপর একাধিকবার গণভোটের উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয় নি। যুদ্ধবিরতি সীমান্ত বরাবর নামেমাত্র জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনী রয়েছে। তা সত্ত্বেও সেখানে দিনরাত গুলির শব্দ শোনা যায় এবং এ নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। অবস্থা আরো অবনতির দিকে চলে যায়।

১৯৫৯ সালে চীন লাদাখের আকচির মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে চীনের নতুন রাস্তা নির্মাণ করে। ভারত দাবি করে লাদাখ্ কাশ্মিরের অংশ। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয় নি। প্রধানমন্ত্রি জওয়াহের লাল নেহরু চীনের প্রেসডেন্ট চৌ এন্ লাইকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তারা যেনো ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন না করে। চীনসহ যে-কোনো দেশের আগ্রাসন মোকাবিলা করতে ভারত প্রস্তুত বলেও তিনি জানিয়ে দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রি একদা 'পঞ্চশীলা' নীতির ভিত্তিতে তৃতীয় বিশ্ব এশীয় জোট গঠনের উদ্যোগ নেন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারত-চীন বিরোধের দ্রুত সুযোগ নিতে সচেষ্ট হন। তিনি সব সময় মনে করতেন, 'শত্রুর শত্রু' খুবই কার্যকর বন্ধু।' এ কারণেই ভুট্টো শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন বা পশ্চিম আফ্রিকারই বন্ধুত্ব কামনা করেন না, মনেপ্রাণে চীনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। প্রেসিডেন্ট আইউবের কাছে লাদাখ্ নিয়ে ভারত ও চীনের বিরোধ সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি জানান, এটি ভারতের সমস্যা। পরদিনই ভুট্টো পত্রিকায় বিবতি দিয়ে বলেন, আইউব যে এ কথাই বলেছেন তা তিনি নিশ্চিত নন অথবা সাংবাদিকরা ভুল রিপোর্ট করেছেন। ভুট্টোর আশঙ্কা পরবর্তী সময়ে ভারত আইয়ুবের বক্তব্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। তিনি আরো বললেন, লাদাখে যদি চীন হস্তক্ষেপ করে থাকে তার আগে ভারত সেখানে হস্তক্ষেপ করেছে। জম্মু ও কাশ্মির কখনো ভারতের অংশ নয়। কাশ্মির নিয়ে ভুট্টো যে সূক্ষ্ম প্রশ্নটি তুলেছেন সে বিষয়টি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রি মঞ্জুর কাদের কেউই ভাবেন নি। আইয়ুব তখন ভারত-পাকিস্তান যৌথ নদী সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তার মতে, কাশ্মিরের চেয়ে পানি বণ্টন সমস্যাটি পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য জরুরি। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বেশির ভাগ নদীর উৎস ভারতে। বিশ্বব্যাংক ও নেহেরুর সঙ্গে তিনি প্রায় সমঝোতার কাছাকাছি চলে এসেছেন। তিনি অভিন্ন নদীর ৮০ ভাগ পানির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে মংলা, তারবেলা এবং রোহ্তাস্ বাঁধ নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাংক ৭৪০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেয়।

ভুট্টো ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের এক বছরের মধ্যেই ভুট্টো প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দুর্বলতাগুলো ধরতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত যুক্তি *'খারাপদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ'*কে গ্রহণ করার কৌশল গ্রহণ করেন। আইয়ুবের দোদুল্যমানতা তার আশাভঙ্গের কারণ। যদিও ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধতক ভুট্টো জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গেই ছিলেন। দীর্ঘকায়, সুদর্শন চেহারা এবং সামরিক শৃঙ্খলা আইয়ুবের মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দেয়—যা দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জন্সন্ তাকে 'বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাষ্ট্র নেতা' হিসেবে প্রশংসা করতেন। তিনি এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাকিস্তানে সাহায্য বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। যথারীতি সে প্রস্তাব অনুমোদিতও হয়।

১৯৬০ সালে ভুট্টো পুনরায় পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে জাতিসংঘে গমন করেন। সেখানে তিনি চীনের সদস্যপদের বিরোধিতা না করার জন্য মার্কিন কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হন। এ ক্ষেত্রে ভুট্টো কিছুটা সফলও হন। ১৯৫৪ সাল থেকে যতোবারই জাতিসংঘে চীনের সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। কিন্তু এবারে অনুপস্থিত থাকে। ভুট্টো ছিলেন চীনের জোরালো সমর্থক। তিনি মনে করতেন চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে কেবল 'ভারতীয় আধিপত্যবাদ'কেই খর্ব করা যাবে না, দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে এশিয়া আফ্রিকায় 'তৃতীয় শক্তি' প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে।

এদিকে মঞ্জুর কাদেরের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরো সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। যদিও CENTO ও SEATO জোট ইতোমধ্যে গঠিত হয়েছে। আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় ভুট্টো একাই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' অবস্থান নিতে চাইতেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রি মঞ্জুর কাদেরের আশঙ্কা, তাতে আফ্রো-এশীয় প্রেক্ষাপটে নেহরুবাদী ভারতীয় নেতৃত্বই উৎসাহিত হবে। এরই পাশাপাশি ভুট্টো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হন এবং ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে তাসখন্দ হয়ে মস্কো যান.। দক্ষিণ এশীয় পররাষ্ট্রনীতিতে কাশ্মির বিরোধ তখন প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ছাত্রদের উদ্দেশে এক ভাষণে ভুট্টো বলেন, 'কাশ্মির সমস্যার সমাধান হলে উপমহাদেশে শান্তি ও অগ্রগতি আসবে।' তিনি অভিযোগ করেন, *'ভারত জোরপূর্বক এ ভূখণ্ড দখল করে আছে এবং কাশ্মিরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারকে বানচাল করে দিচ্ছে।'*

সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে আইয়ুব ভুট্টোর চেয়ে নিজেদের 'যোগ্যতা' সম্পর্কে ভালো খোঁজ-খবর রাখতেন। কাশ্মিরের ওপর পাকিস্তানের নৈতিক ও আইনগত অধিকার যতো বেশিই থাক না কেনো সমর শক্তির দিক থেকে ভারত অনেক এগিয়ে। এ কারণেই তিনি কাশ্মির প্রশ্নে ভুট্টোর ন্যায় কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না।

১৯৬২ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্রী' সংবিধান রচনার কাজ শেষ হয়। এ ব্যাপারে ভুট্টো আইয়ুবকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মন্ত্রি হিসেবে তিনি ৯ কোটি মানুষের মধ্য থেকে ৮০ হাজার বিশ্বস্ত লোককে বেছে নেওয়ার উপায় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন। তাদের কাছে একটিই প্রশ্ন রাখা হয় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি তাদের 'আস্থা' আছে কি না? ৭৫ হাজারেরও বেশি 'মৌলিক গণতন্ত্রী' তার পক্ষে আস্থা প্রকাশ করেন। তিন হাজারেরও কম ভোটার 'না'—এ ভোট দেন। এ তথাকথিত গণভোটকেই আইয়ুব 'জাতীয় নির্বাচন' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

১৯৬২ সালের মার্চ এপ্রিলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও ভোটার ছিলেন ৮০ হাজার অনুগত 'মৌলিক গণতন্ত্রী'। দলীয়ভিত্তিতে এ নির্বাচন হয় নি। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ভুট্টো লারকানা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার বিরুদ্ধে আবদুল ফাতাহ মেনন প্রথমে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পরে বুদ্ধিমানের মতো তা প্রত্যাহার করে নেন। ভুট্টো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের ৮ জুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হলো। দুই প্রদেশ থেকে ১৫০ জন 'অনুপযুক্ত' সদস্য সামরিক আইন প্রত্যাহারে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন। কিন্তু বেশিরভাগ জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা তখনো কারাগারে আটক কিংবা আইয়ুবের 'মার্শাল ল' ইলেকটিভ বডিস্ ডিস্ কোয়ালিফিকেশন্ অর্ডার' (EBDO)-এর কারণে নির্বাচনে অংশে নিতে পারেন নি। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রি সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেফতার করে তার বিজয়কে ঠেকানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসের দশম বার্ষীকিতে ঢাকায় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় এবং তা গোটা পূর্বপাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। আরো এক দশক পরে বাংলাদেশে এক অভাবিত ঘটনা ঘটে। স্বাধীনতা যুদ্ধ। যাতে লাখ লাখ মানুষ শহীদ হন।

এ জাতীয় পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে ভুট্টো রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখান। তিনি ইবডো (EBDO) তুলে নেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি সামরিক আইন জারির জন্য পূর্ববর্তী শাসকদের অভিযুক্ত করেন। সোহরাওয়ার্দির বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনে ভুট্টো বলেন,

'এই লোকই জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন এবং মহাতাণ্ডব ঘটিয়েছেন। জাতির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনকে কলুষিত করা থেকে তাকে সবসময় দূরে রাখতে হবে।'

১৯৬২ সালের শেষ দিকে ভুট্টো আবার পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে জাতিসংঘে যান। পরবর্তী ৬ মাস ধরে কাশ্মির নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রি সরদার শরণ সিংয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তার আলোচনা হয়। এ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রি জওয়াহের লাল নেহেরু। তিনি ছিলেন ফিফ্‌থ এভিনিউর হোটেল কার নাইলে। এর কয়েক ব্লক পরেই ভুট্টো থাকতেন। নেহেরু একদিন তাকে চায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। শৈশবে ভুট্টো প্রথম নেহেরুকে দেখেন বোম্বেতে। তখনো পাকিস্তান ভারত ভাগ হয় নি। এরপর এ দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। নেহেরুর সঙ্গে সেদিনের আলাপের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভুট্টো বলেছেন, *'উপরের তলায় তার স্যুটের ড্রইং রুমে আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। নেহেরুর পা রেলিংয়ের ওপরে। নিচে সারিবদ্ধ ট্রাফিক ও চলমান মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখো, আমরা কতো ছোট।'*

আমি মাথা নাড়লাম।

এরপর তিনি বললেন, *'ধ্বংস এবং পরমাণু অস্ত্রের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে।'*

এটি ছিলো নিউ ইয়র্কে নেহেরুর শেষ সফর। এর দেড় বছর পর তিনি মারা যান। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রি হন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। ভুট্টো সব সময়ই নেহেরুর 'জোটনিরপেক্ষ' নীতিকে সমর্থন করতেন। চীনের প্রতিও নেহেরু ছিলেন নমনীয়। তার এ নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভালো চোখে দেখতো না। পাশ্চাত্যের চাপ সত্ত্বেও তিনি কোনো জোটের শরিক হন নি। বরং ভারতকে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশসমূহের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

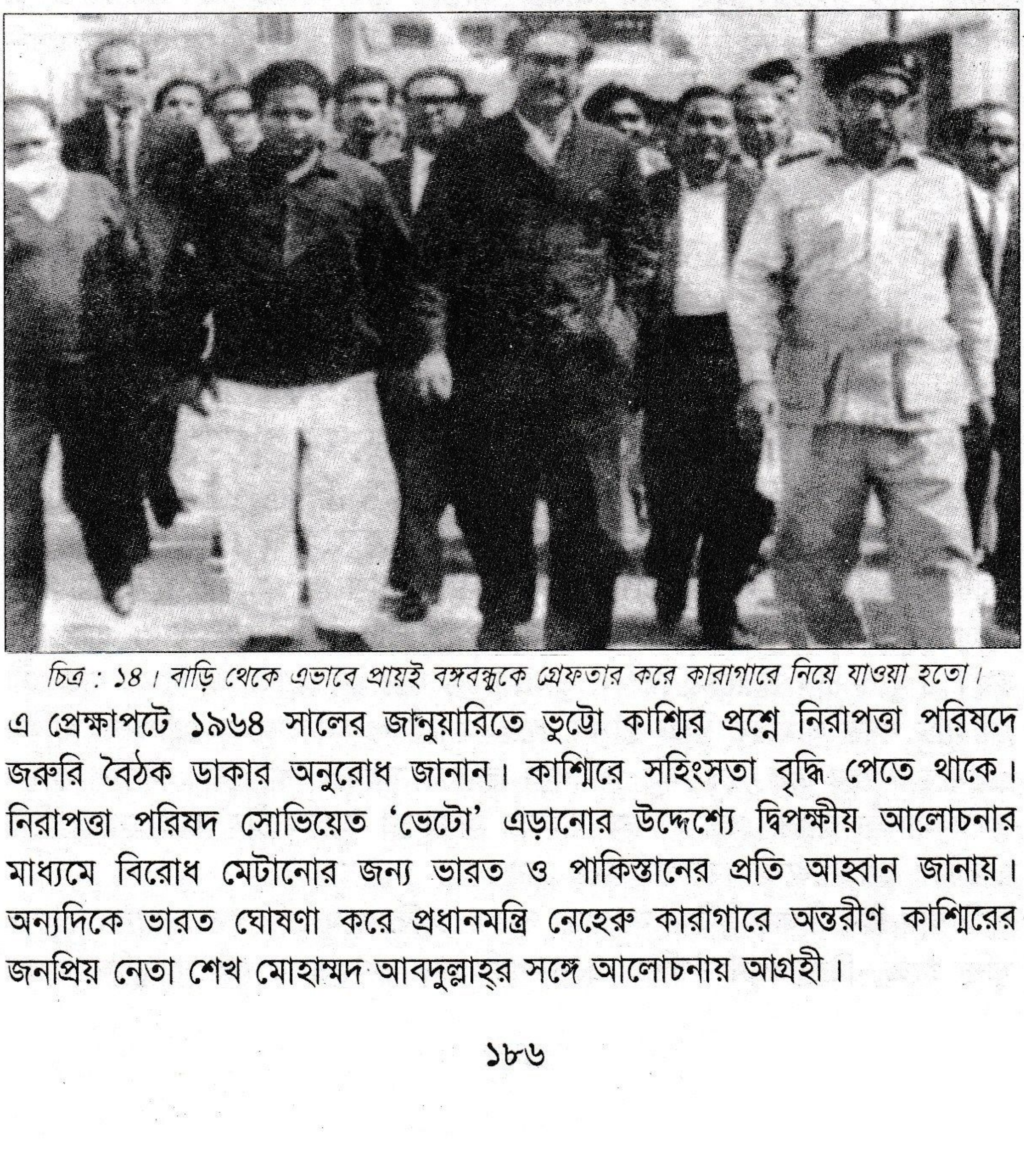
পররাষ্ট্রমন্ত্রি হিসেবে ভুট্টোর প্রথম সাফল্য ১৯৬৩ সালের ২ মার্চ চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তি। এর আগেই সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে চীন ভারতের বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং আসামের রাজধানী গৌহাটি পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। নেহেরুর আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি অবিলম্বে ভারতে সমরাস্ত্র পাঠানোর নির্দেশ দেন। প্রথম মার্কিন জাম্বো জেট পশ্চিম বাংলায় অবতরণ করলে চীন তার সেনাবাহিনী ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

পাকিস্তান-চীন সীমান্ত চুক্তির ব্যাপারে ভারত জাতিসংঘে প্রতিবাদ জানায়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, বিরোধপূর্ণ কাশ্মির প্রশ্নে পাকিস্তান এককভাবে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর

করতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদে দিল্লি-ইসলামাবাদ একে অপরের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে। ভুট্টো কাশ্মির থেকে ভারত ও পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার করে অবিলম্বে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি জানান। জওয়াহের লাল নেহেরু তার জীবনের অন্তিম বছরটিতে কাশ্মির নিয়ে কোনো সংঘাতে যেতে চান নি। আবার মুসলিম প্রধান কাশ্মিরে গণভোটের ঝুঁকিও নেন নি। কাশ্মির ভ্যালি তার অত্যন্ত প্রিয়ভূমি। পূর্বপুরুষের জন্মস্থান। নেহেরু পরিবার এক সময়ে কাশ্মির থেকে এলাহাবাদে চলে আসে। তিনি যে-কোনো সুন্দরী মহিলার মতোই কাশ্মিরকে ভালোবাসতেন এবং নারীসঙ্গের ব্যাপারে ভুট্টোর মতো তারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিলো।

নেহেরু, শেখ আবদুল্লাহ্ এবং পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে হযরতবাল মসজিদে সংরক্ষিত মহানবী সা.-এর পবিত্র চুল হারিয়ে গেলে সমগ্র কাশ্মিরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। এতে বহু লোক মারা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারত কাশ্মিরে আরো সৈন্য পাঠায়। এর আগেই অবশ্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা অনুযায়ী কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা কার্যত বাতিল করে ৩৬৫ ও ৩৭৫ ধারা জারি করা হয়।



চিত্র : ১৪। বাড়ি থেকে এভাবে প্রায়ই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হতো।

এ প্রেক্ষাপটে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে ভুট্টো কাশ্মির প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক ডাকার অনুরোধ জানান। কাশ্মিরে সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিরাপত্তা পরিষদ সোভিয়েত 'ভেটো' এড়ানোর উদ্দেশ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মেটানোর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়। অন্যদিকে ভারত ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রি নেহেরু কারাগারে অন্তরীণ কাশ্মিরের জনপ্রিয় নেতা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী।

১৯৫৩ সাল থেকে তিনি জেলে আছেন। এর আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা এখন যা চাই তাহলো, কাশ্মিরের জনগণই স্বাধীন ও নিঃশঙ্ক চিত্তে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করুক।' ১৯৫৮ সালে স্বল্প সময়ের জন্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 'কাশ্মিরের সিংহ' বলে খ্যাত শেখ আবদুল্লাহ বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের পরিণাম হবে আত্মঘাতী। এ সময়ে তিনি কাশ্মিরের বিভিন্ন জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'তারা (ভারত) আমাকে পুনরায় গ্রেফতারের চিন্তা করছে। কিন্তু শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করলেই কি কাশ্মির বিরোধ মিটে যাবে? ভাগ্যের কি খেলা! এরপর সত্যি সত্যি তিনি আবার গ্রেফতার হলেন।

১৯৬৪ সালের এপ্রিলে নেহেরুর স্বাস্থ্য দারুণভাবে ভেঙে পড়ে। তিনি চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে আর বিরোধে যেতে আগ্রহী নন। আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মির সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নেহেরু শেখ আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ২৭ মে ১৯৬৪ নেহেরু মারা যান। একই বিমানে ভুট্টো ও শেখ আবদুল্লাহ দিল্লি যান তার শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে। এ সময়ে কাশ্মির নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। শেখ আবদুল্লাহ সমগ্র কাশ্মিরে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এর আগে অবশ্য জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মিরের ভাগাভাগির বিপক্ষে।

ভুট্টো প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুবের পক্ষে নেহেরুর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন এবং তার প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানান। পরদিন সকালে তিন মূর্তি ভবনে তিনি নেহেরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি দার্শনিক রাধাকৃষ্ণাণ, নেহেরুর উত্তরসূরী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রি গুলজারি লাল নন্দ, কংগ্রেস সভাপতি কে. কামরাজ ও প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গেও কথা বলেন।

ইতোপূর্বে আলাপ-আলোচনার কথা বলা হলেও কাশ্মির প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান পুনরায় একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। নয়া দিল্লি পূর্ব অবস্থান থেকে সরে গিয়ে কঠোর অবস্থান নেয়। নবনির্বাচিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে ভুট্টো প্রস্তাবিত বৈঠক বাতিল করে দেন। তার ধারণা, ভারতের কোনো নেতাই আর কাশ্মিরে গণভোট দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক নন। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি তিনি সামরিক সমাধানের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেন। ঘটনা তখন অন্যদিকে মোড় নেয়।

এদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কঠিন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার সাংবিধানিক ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৬৪-৬৫ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে বৈরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রি সোহরাওয়ার্দি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ মারা যান। তার অন্যতম সিপাহশালার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মৃত্যুকে 'রহস্যজনক' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু

তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আওয়ামীলীগকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল আইয়ুবের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মুজিবের বয়স তখন খুবই কম। তা ছাড়া সে মুহূর্তে পশ্চিমপাকিস্তানে তার পরিচিতিও তেমন ছিলো না।

বাঙালি নেতা সাবেক গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন তার জীবনের শেষ বছরটিকে আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে বেশ সাফল্যের পরিচয় দেন। তিনি ডানপন্থী ইসলামি বলয় থেকে শুরু করে বামপন্থী ন্যাপ, চরমপন্থী আওয়ামী লীগকেও একই মঞ্চে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। গঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)। এ জোটে আবদুল কাইউম খানের কাউন্সিল মুসলিমলীগ; চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজামে ইসলামও ছিলো। অবশেষে জোট সর্বসম্মতভাবে আইয়ুবের বিরুদ্ধে একজন আদর্শ প্রার্থীকে খুঁজে বের করে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ৭১ বছর বয়স্ক ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে। ভগ্নস্বাস্থ্য ও ধূসর চুলের এ তাপসী বৃদ্ধা ক্ষমতাধর ফিল্ড মার্শালের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষেই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 'মাদারে মিল্লাত ফাতেমা জিন্নাহ্' নামেই তিনি সুপরিচিত। জনগণের স্মৃতিতে এখনো তার নাম ভাস্বর। ব্যাপক জনসমর্থন লাভ তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

ফাতেমা জিন্নাহ চেয়েছিলেন, ভুট্টোও সঙ্গে থাকেন। তিনি এটাও বলেছিলেন, ভুট্টো যদি আইয়ুবকে ত্যাগ করে চলে আসেন তাহলে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদেই বহাল রাখা হবে। তিনি জানতেন, আইয়ুব বা পশ্চিমপাকিস্তানের জাঁদরেল মুখ্যমন্ত্রি কালাবাগকে ছেড়ে গেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রির পদটি হাতছাড়া হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও তিনি আইয়ুবকে ত্যাগ করেন নি। এ নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ্ শতকরা ৩৭ ভাগ ভোট পেয়েছেন এবং তার বেশিরভাগই পূর্বপাকিস্তান থেকে। তিনি দাবি করেছেন, তার নির্বাচনী বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও ফাতেমা জিন্নাহ্ এটাও বিশ্বাস করেন, '১৯৬৪ সালে পশ্চিমপাকিস্তানের খুব কম লোকই একজন মহিলার শাসন মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো।'

১৯৬৪ সালের শেষে পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধের মুখোমুখি এসে পৌঁছে। ২৪ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে ভুট্টোকে এক চিঠিতে জানায়, 'ভারত এগিয়ে যাচ্ছে।' ইতোমধ্যে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রি ওয়াই.বি. চ্যবন ৮ লাখ ২৫ হাজার সদস্যের অত্যাধুনিক বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এরপর তিনি ওয়াশিংটন যান এফ-১০৪ জঙ্গি বোমারু বিমান সংগ্রহের জন্য। ভারত এইচ.এফ.-২৪-এম নির্মাণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে মিগ তৈরিরও প্রস্তাব দিয়েছে। এর মোকাবিলায় পাকিস্তানের হাতে আছে মাত্র এফ-১০৪ বোমারু বিমান। ইতোমধ্যে দু পক্ষের মধ্যে আরো কয়েক দফা বাকযুদ্ধ চলে। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতের প্রধানমন্ত্রি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান। এতে আইয়ুব ক্ষুব্ধ হন এবং এ আমন্ত্রণ বাতিলের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। অবশেষে সফর বাতিল হয়ে যায়। শাস্ত্রীও বিষয়টিকে 'কূটনৈতিক' রীতির খেলাপ হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে শাস্ত্রী কানাডা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

এদিকে কাশ্মিরের সীমান্তে বরাবর ছোটোখাটো গোলাগুলি চলতে থাকে। শাস্ত্রী জেনারেল আইয়ুবকে সর্তক করে দিয়ে বলেন, 'এর জবাব নিশ্চয়ই আরো কঠিন হবে। আমি দেখতে চাই কাশ্মিরে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে।' এর জবাবে আইয়ুব ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ক্রমাগত উস্কানিকে 'অঘোষিত যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। একই সঙ্গে তিনি আসামে বাঙালি মুসলিমদের হত্যাকাণ্ডেরও নিন্দা করেন, যারা এক সময়ে পূর্ববাংলা থেকে সেখানে গিয়ে জঙ্গল কেটে জমি আবাদ ও বসতবাড়ি করেছিলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রি এসব ব্যাপারে আলোচনার প্রস্তাব দিলে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব পুনরায় কাশ্মির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'কাশ্মির সমস্যাই বড়ো।'

এ সময়ে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রি ভুট্টো ও পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমদের কাছে একটি নোট পাঠান। জবাবে ভুট্টো তাকে লেখেন,

'ভারত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোভিয়েত সহায়তায় তারা অবিলম্বে নিজস্ব মিগ তৈরিতে সক্ষম হবে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ-১০৪ এম বোমারু বিমান পেতে পারে। প্রতিপক্ষ বৃহৎ শক্তি ছাড়াও ভারত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সমর্থন পাবে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের উচিত আগে ভাগে অভিযানে যাওয়া।'

ভুট্টো বছরের শুরু থেকে এ যুক্তি দিয়ে আসছিলেন। প্রেসিডেন্ট পদে আরো পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর জেনারেল আইয়ুবও কিছুটা আস্থাশীল।

এদিকে ভুট্টো সামরিক সমর্থনের জন্য বেইজিং এবং জাকার্তা যান। প্রেসিডেন্ট সুকর্নো নৌ সমর্থন দেওয়ার কথা জানান। চীনও সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যদিকে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রি ব্রিটেনের কাছে সামরিক সাহায্য কামনা করেন। আগে থেকেই ভারত মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিন নৌশক্তির উপস্থিতি ছিলো।

দক্ষিণ এশিয়ার সকল দৃষ্টি এখন জম্মু ও কাশ্মিরের দিকে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে প্রথম দফা যুদ্ধ শুরু হয় হচ্ছে। সিন্ধু ও গুজরাটের নিম্নভাগে অবস্থিত এ ভূখণ্ডটি ১৯৪৭ সাল থেকে অমীমাংসিত ছিলো। পাকিস্তান কচ্ছর উত্তরাংশে তাদের মালিকানা দাবি করলেও ভারত কখনো তা মেনে নেয় নি। ১৯৬৪ সালে মার্চে পাকিস্তান সেখানে দুটি পুলিশ চৌকি স্থাপন করে। ভারত এটিকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে সেখানে সামরিক টহল আরো জোরদার করে।

৭ এপ্রিল ভারত পাকিস্তানের অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। ৮ এপ্রিল ভারতীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তানের সামরিক তৎপরতার জোরালো প্রতিবাদ জানায় দিল্লি। ৯ এপ্রিল ভোর তিনটায় পাকিস্তানি পদাতিক বাহিনী অভিযান শুরু করে। তারা ভারতের সরদার চৌকিতে ঢুকে পড়ে। দু পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হয় এবং হামলার জন্য একে অপরকে দায়ী করে। দু সপ্তাহ ধরে এ ছোট্ট যুদ্ধে কে জিতেছে বলা কঠিন। তবে উভয়ই একে অপরকে শায়েস্তা করেছে বলে দাবি করে।

১ মে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব জাতির উদ্দেশে দেওয়া বেতার ভাষণে বলেন, 'কচ্ছে ভারতীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছে।' কচ্ছর ঘটনার পর তৎকালীন

পরিচালক, সামরিক অপারেশন, জেনারেল গুল হাসান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আইয়ুব, গুল হাসান, পররাষ্ট্রমন্ত্রি ভুট্টো, পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমেদের মধ্যে যে শলাপরামর্শ হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো গুল হাসানের জবানিতে,

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি মনে করো ভারত আক্রমণ করবে?'

'না।' খোলাখুলি বলছি—আমি জবাব দিলাম। তারা কচ্ছকে বেছে নিয়েছিলো সমুদ্রের সঙ্গে নিজ ভূখণ্ডের যোগাযোগকে সহজ করার জন্য। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। এখন দু পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গেছে।

'একই সময়ে আমরা কাশ্মির সীমান্ত দিয়ে মুজাহিদ পাঠানোর পরিকল্পনা নিই। আইয়ুবের নির্দেশে একটি সেল গঠন করা হয়। আজিজ আহমেদও ঐ সেলের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানভুক্ত কাশ্মিরে এই মুজাহিদরা 'অপারেশন জিব্রালটার' নামে অনুপ্রবেশ করে। সশস্ত্র মুজাহিদ কমান্ডোদের সীমান্তবর্তী যুদ্ধ-বিরতি এলাকায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতভুক্ত কাশ্মিরের ভেতরে মুসলিম বিদ্রোহ উস্কানি দেওয়াই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। মৌসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠা মাত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্রুত পরবর্তী অভিযান চালাবে।'

সামরিক সদর দপ্তরের অন্যান্য সহকর্মীর মতো এ পরিকল্পনায় গুল হাসান ততোটা সাহস দেখাতে পারেন নি। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সংযমী এবং সতর্ক। তাকে উদ্দেশ্য করে সহকর্মীরা বলতে থাকেন, 'দেখো, আমরা এ গেরিলাদের পাঠাচ্ছি এবং আমরা অগ্রাভিযান চালাবো।' এ সময়ে শেখ আবদুল্লাহ বিদেশ সফরে ছিলেন। লন্ডনে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'যদি সুষ্ঠু গণভোট হয় কাশ্মির পাকিস্তানের সঙ্গেই যুক্ত হবে।' ১৯৬৫ সালের মে মাসে শেখ আবদুল্লাহ দিল্লিতে ফিরে এলে তাকে গ্রেফতার করে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় নেতাদের আশঙ্কা, তিনি কাশ্মিরে ফিরে গেলে সেখানকার আন্দোলন আরো জোরদার হবে।

কচ্ছে আবার উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্যাটন ট্যাঙ্ক সীমান্ত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব ট্যাঙ্ক ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করার জন্য ওয়াশিংটন বার বার চাপ দিচ্ছিলো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে তার নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রি এ কূটনৈতিক সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। এরপর আইয়ুব-কোসিগিন্ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে মস্কো পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে সম্মত হয়। তারা কাশ্মিরে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সমর্থন করে। কিছুদিন পর ভারতের প্রধানমন্ত্রিও মস্কো সফর করেন।

জুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি হ্যারল্ড উইল্সনের মধ্যস্থতায় কচ্ছ বিরোধ নিয়ে লন্ডনে শাস্ত্রী ও আইয়ুবের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক হয়। ৩০ জুন দু পক্ষ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। আগস্টের ১০ তারিখে কাশ্মির বিপ্লবী পরিষদ ভারতের নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য বিপ্লবী কাশ্মিরীদের প্রতি আহ্বান জানায়। তারা কাশ্মির প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার স্বাক্ষরিত সকল চুক্তিও বাতিল বলে ঘোষণা

এবং নিজেদের কাশ্মিরের একমাত্র আইনানুগ কর্তৃপক্ষ বলে দাবি করে। এ আহ্বানে জম্মু ও কাশ্মিরের স্বল্পসংখ্যক মানুষই সাড়া দিয়েছে, বিপ্লবী পরিষদের আহ্বান গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারে নি। শ্রীনগরবাসী তখনো জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত নয়। পাঁচ দিন পর ভারতীয় সেনাবাহিনী কারগিলে তিনটি পাকিস্তানি চৌকি দখল করে নেয়। কচ্ছ বিরোধের পর ভুট্টো আইয়ুবকে কাশ্মির যুদ্ধের গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেন। জেনারেল আইয়ুব প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন। কেননা সম্প্রতি ওয়াশিংটন ভারত ও পাকিস্তান দু দেশেই অস্ত্রের চালান পাঠায়। ভুট্টো তাকে আরো বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, কাশ্মির বিরোধে চীন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নেবে।

আগস্টের মাঝামাঝি পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাত হাজার মুজাহিদকে আজাদ কাশ্মিরের সীমান্তে পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য জম্মুর বিদ্রোহীদের ইন্ধন যোগানো। ভারতীয় বাহিনী আজাদ কাশ্মিরের উরিপুঞ্জ এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। ইতোমধ্যে ভারতীয় বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬ লাখ ৫০, হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যা পাকিস্তানের তিনগুণেরও বেশি। এ ছাড়া পাকিস্তানের ছিলো ১ হাজার ৬০০ জঙ্গী বিমান, ১ হাজার ৫০০ ট্যাঙ্ক। ভারত তার প্রতিবেশীর থেকে ৫-৬ গুণ ভারী সমরাস্ত্রের মালিক। পাকিস্তান কাশ্মিরে হামলা করলে জেনারেল জে. এম. চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারত পাঞ্জাবে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনী ভিম্বার-চাম্বো এলাকায় সীমান্ত অতিক্রম করে। পাশাপাশি ভারি প্যাটন ট্যাঙ্ক পূর্বাঞ্চলে 'গ্লান্ড স্ল্যাম' অপারেশন চালায়। দক্ষিণের সরু স্থানে ভারত থেকে দ্রুত কাশ্মিরকে বিচ্ছিন্ন করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য। ভারতের হাজার হাজার সৈন্য পেছনে পড়ে থাকে। এর পরপরই ভারতীয় বিমান বহর আক্রমণ শুরু করে এবং ১৩টি ট্যাঙ্কসহ বিপুল পরিমাণ যানবাহন ধ্বংস করে দেয়। দু পক্ষের মধ্যে পুরোমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৪ সেপ্টেম্বর চীনা পরারাষ্ট্রমন্ত্রি চেন ওয়াই করাচি আসেন এবং ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠকে পাকিস্তানের 'ন্যায়সঙ্গত' অভিযানের প্রতি সমর্থন জানান। একই দিন অপরাহ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষের প্রতি যুদ্ধবিরতি এবং নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। তখন পাকিস্তান বাহিনী জম্মু কাশ্মিরের ২০ মাইল অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। পরদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মুসা বললেন,

'তোমরা শত্রুর ভেতরে দাঁত বসাতে পেরেছো। এখন এই আঘাত আরো প্রকট করে তুলতে হবে। তাকে পুরোপুরি ধ্বংস না করা পর্যন্ত আঘাত চালাতে থাকো। এটিই খোদার ইচ্ছে।'

৬ অক্টোবর ভারত তিনবহর ট্যাঙ্ক নিয়ে অমৃতসর থেকে লাহোর অভিমুখে ত্রিমুখী অভিযান চালায়। উদ্দেশ্য পাঞ্জাবের এ রাজধানী শহরকে হুমকির মুখে ফেলে জম্মু ও কাশ্মির থেকে পাকিস্তানি বাহিনী প্রত্যাহারে বাধ্য করা। ৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ট্যাঙ্ক লাহোরের উপকণ্ঠে শিয়ালকোট রেল জংশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। এরপর পাকিস্তান উত্তরের চাম্বো এলাকা থেকে পিছু হটে। সামরিক অপারেশনের

দিক দিয়ে ভারতীয় অভিযান ছিলো অধিকতর কুশলী ও কার্যকরী। পাকিস্তান আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রিয়াজ হোসেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারেন নি এবং প্রেসিডেন্টকেও জানাতে পারেন নি। তখন আইয়ুব খান রাগে ফেটে পড়লেন। আমতা আমতা করে রিয়াজ হোসেন বলতে চাইলেন, 'স্যার ১৯৬৪ সালের জুন থেকে গোয়েন্দা বিভাগ নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর প্রতিক্রিয়া জানার কাজে ব্যস্ত ছিলো।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রি ভুট্টোও আইয়ুবকে বুঝিয়েছেন, ভারত পাঞ্জাবে আক্রমণ করবে না। এখন তিনিও খানিকটা বিব্রত। এবারে ভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দোষ চাপিয়ে বললেন, '১৯৫৯ সাল থেকেই ওয়াশিংটন ভারতের মাটিতে পা রাখতে চাইছে। পাকিস্তানকে পুঁজি করে সে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী।' তিনি আরো জানান, 'যুক্তরাষ্ট্রের এ নীল-নকশা বাস্তবায়িত হলে আমাদের নেতৃত্ব কেবল আফ্রো-এশিয়ার মূলধারা থেকেই বিছিন্ন হবে না সে তার নিজের জনগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।' ভুট্টোর বক্তব্যে যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশি ছিলো।'

ভুট্টোর জবাবকে জেনারেল আইয়ুব কীভাবে নিয়েছিলেন জানা যায় নি। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি ভুট্টোর চাচাতো ভাই মমতাজ ভুট্টোকে তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন,

'তোমার চাচাতো ভাই একটি পাগল। তার পথে যেও না। সে তোমাকে বিপথে চালনা করবে এবং বিপদে ফেলবে।'

এদিকে ভারত বাঁধ ছেড়ে দিলে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়। খেম কারান সেক্টরে শ'খানেক প্যাটন ট্যাঙ্ক জল-কাদায় আটকা পড়ে যায়। ফলে তাদের 'দিল্লি অভিযান' পরিত্যাগ করতে হয়। 'ভারতের বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়। এরপর পাকিস্তানি মুসলমানরা কীভাবে তাদের আত্মোৎসর্গীকৃত যুদ্ধে টিকে থাকবে? এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় ট্যাঙ্কবহর লাহোরের উপকণ্ঠে অবস্থান নেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জওয়ানরা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে গেছে—যা অতীতে কখনো করে নি। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী থেকে তারা সংখ্যায় অনেক কম। ভারতীয় হাইকমান্ড শত্রুকে পরাস্ত করার ব্যাপারে ছিলো অত্যন্ত দৃঢ় ও আস্থাশীল। ভুট্টোর পক্ষে এটি মেনে নেওয়া কঠিন। তিনি এবং পাকিস্তানের বেশির ভাগ যুবক মনে করে ভারতের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন না করার অর্থ নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। আত্মমর্যাদাশীল জাতির বিপর্যয় ঘটানো। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভারতীয় বাহিনী রাজস্থান থেকে রাওয়ালপুর ও সিন্ধু অভিমুখে অভিযান চালায়। এ সময় ভুট্টো আইয়ুবকে 'অতি গোপনীয়' এক চিঠিতে জানান,

'তাদের পরবর্তী লক্ষ্য পূর্বপাকিস্তান। ... পূর্বপাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে চীনের সঙ্গে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' তিনি নেপালের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন।

৯ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী প্রধান আসগর খান ও জেনারেল গুল হাসানকে নিয়ে ভুট্টো

বেইজিং যান চীনা সামরিক সহায়তার আশায়। চীন কঠোর ভাষায় নৈতিক সমর্থন ব্যতীত কিছুই দেয় নি। যদিও ইন্দোনেশিয়া কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। ইরান, তুরস্ক ও জর্ডান 'প্রতীকী' সামরিক সাহায্য দিয়েছে। পশ্চিমের ন্যায় প্রাচ্যেরও বেশির ভাগ দেশ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিরোধিতা করে। সুয়েজ খাল যুদ্ধের পর এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথভাবে যতো দ্রুত সম্ভব অস্ত্র সংবরণের আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ মহাসচিব মি. উ থান্ট যুদ্ধবিরতিতে সম্মত করানোর উদ্দশ্যে পিণ্ডি, করাচি ও দিল্লি সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানে সকল অস্ত্র চালান বন্ধের নির্দেশ দেয়। ভুট্টো ওয়াশিংটনের এ পদক্ষেপকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবেই অভিহিত করেছেন।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই আইয়ুব অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধিতে আসেন যে, পাকিস্তান বাহিনীর বোমা ও বুলেটের অবস্থা কী সঙ্কটজনক। এ ছাড়া পাকিস্তান বাহিনীর হাজার হাজার সাহসী জওয়ান জীবন দিয়েছে, অত্যাধুনিক ট্যাঙ্কসমূহ কাদা-পানিতে আটকে গেছে। তার সামরিক অভিজ্ঞতা উথান্টের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণে উৎসাহিত করে। এটি প্রয়োজন পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে টিকিয়ে রাখার ও রাষ্ট্রকে রক্ষার প্রয়োজনেই। তা ছাড়া তখন তার বয়সও অনেক হয়েছে।

তরুণ পররাষ্ট্রমন্ত্রি ভুট্টো যুক্তি দেখাতে থাকেন 'যুদ্ধবিরতির অর্থ হবে আত্মসমর্পণ এবং তা আত্মমর্যাদাশীল জাতির আত্মবিনাশেরই শামিল।' কিন্তু ফিল্ড মার্শাল তার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বুঝতে পেরেছেন তার প্রথম কৌশল 'গ্রান্ড স্ল্যাম' মার খেয়েছে। এ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ বিজয় অর্জন নয়, হতাহত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ানো। অন্যদিকে ওয়াশিংটন, মস্কো, লন্ডন ও জাতিসংঘের সমর্থনও হারাতে হবে।

জেনারেল আইয়ুব প্রথমে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে কাশ্মির সমস্যাটিও যুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু শাস্ত্রী বললেন, 'সিম্পল যুদ্ধবিরতি।' কাশ্মির প্রসঙ্গ এর সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না। ২০ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় উভয় পক্ষের প্রতি দু দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে প্রস্তাব দেয়।

২২ সেপ্টেম্বর ভুট্টো নিউ ইয়র্ক গিয়ে পৌঁছেন এবং যুদ্ধবিরতি সংবলিত আইয়ুবের বার্তা নিরাপত্তা পরিষদে পাঠ করে শোনান। এ বার্তায় আইয়ুব তার সেনাবাহিনীর প্রতি ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ৫ মিনিটে অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দেন।

১৯৬৬ সালের শুরুতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রি আলেক্স কোসিগিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও প্রধানমন্ত্রি শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালেন। ৪ জানুয়ারি তাসখন্দে দক্ষিণ এশীয় দুটি বিবদমান দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রিকে সহায়তা করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রি ওয়াই বি চ্যবন এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রি ভুট্টো, তথ্যমন্ত্রি হাবিবুল্লাহ শাহাবুদ্দিন এবং তথ্য সচিব আলতাফ গওহর। ভুট্টো চাইছিলেন না, এ বৈঠকে আলতাফ গওহরও আসুন। এ দু জনের মধ্যে শুরু থেকে বিরোধ ছিলো। আইয়ুব ভুট্টোকে বাদ দেওয়ার জন্য আরো ৬ মাস অপেক্ষা করেন। কিন্তু

এ বৈঠকেই তাদের মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর আইয়ুব শাস্ত্রীর সঙ্গে একান্ত মিলিত হন। ভুট্টোর ইচ্ছে, তিনিও থাকবেন। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল তার সহকর্মীকে আঙুলের ইশারায় ফিরে যেতে বলেন।

আইয়ুবের তালাকনামা ও ভুট্টোর পার্টি গঠন

ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে ভুট্টোর আর কোনো সন্দেহ থাকলো না। জেনারেল আইয়ুবের হৃদয়েও তার মন্ত্রিসভায় ভুট্টোর কোনো স্থান নেই। তাসখন্দের শীতল পরিবেশ তাকে আরো নিরাশ করলো। অন্যরা তাকে নিয়ে কী ভাববে সে সম্পর্কে ভুট্টোর অস্বস্তির সীমা নেই। চেহারা, ভঙ্গি ও ভাষায় তিনি হতাশাকে আড়াল করতে চাইলেন।

আইয়ুব একাই সরাসরি শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। ভুট্টো তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের কাছ থেকে তার সারমর্ম জেনে নেন। এছাড়া ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে খোশ-গল্পও করেন। তার আন্তরিকতা ভুট্টোকে মুগ্ধ করে। কাশ্মিরের ভবিষ্যৎ যুদ্ধবন্দি ও আটক যানবাহনের ব্যাপারে আলোচনা না হওয়ায় তারা দু জনই উদ্বিগ্ন। ভুট্টোর হতাশা ও একঘেঁয়েমি বাড়তে থাকে।

আইয়ুব ও শাস্ত্রীকে সমঝোতায় আনতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পৃথকভাবে দু জনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে আলতাফ গওহর দুই পৃষ্ঠার একটি টাইপ করা খসড়া চুক্তি 'যুদ্ধ নয়' অনুচ্ছেদ যোগ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। বাধ্য হয়ে আইয়ুব নিজ হাতে 'ভারতের সঙ্গে বিরোধে পাকিস্তান শক্তি প্রয়োগ করবে না' বাক্যটি লিখে দেন। এরপরই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হন। পরে জেনারেল আইয়ুবের কাছে চুক্তিনামা পাঠ করে ভুট্টো ক্ষেপে যান এবং দেশে ফিরে যাওয়ার হুমকি দেন। কিন্তু আইয়ুব তাকে থাকার জন্য অনুরোধ জানান। শেষমেশ ভুট্টো সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু আইয়ুবের সূচিত বিপ্লবের থেকে তার সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়। চুক্তিনামা পেয়েই ভুট্টো সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রি আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনারেল আইয়ুবের 'শক্তি পরিত্যাগ' অঙ্গীকারের কূটনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন। তিনি বলেন, ভারত কাশ্মিরে গণভোট দিতে সম্মত হওয়ার পর জেনারেল আইয়ুব এ সিদ্ধান্ত নেন।

গ্রোমিকো জবাব দিলেন, 'মিথ্যে কথা।' ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব ও প্রধানমন্ত্রি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দুটি দেশের স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারের পাশাপাশি ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়।

রাত ১০টায় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তার স্যুটে ঘুমাতে গেলেন। এর আগে তিনি সোভিয়েতদের দেওয়া পার্টিতে যোগ দেন। পরের দিন কাবুল হয়ে তার নয়া দিল্লিতে ফেরার কথা। আইয়ুব তাকে পিন্ডিতে আমন্ত্রণ জানান। ঘুমুতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই শাস্ত্রী হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন। এটি ছিলো তৃতীয়বার এবং মারাত্মক। তার চিকিৎসক আর এন চোং অন্য রুমে ছিলেন। তিনি আসতে আসতে শাস্ত্রীর অবস্থার

মারাত্মক অবনতি ঘটে। রাত ২টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সকালে ভুট্টো ঘুম থেকে উঠলে তার পররাষ্ট্র সচিব তাকে জানান, 'বাস্টার্ডটি মারা গেছে।'
'কোন্‌টি?'—ভুট্টোর প্রশ্ন।
নুসরাতের সামনে জেনারেল আইয়ুব ভুট্টোকে যে একবার অপমান করেছিলেন তিনি তা কখনো ভোলেন নি। ফিল্ড মার্শাল তার আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়েছেন। অথচ আইয়ুবকে ফিল্ড মার্শাল হওয়ার পরামর্শটিও ভুট্টো দিয়েছিলেন। ভুট্টো আইয়ুবকে মনে করতেন একজন সাধারণ পাঠান, ওয়াশিংটনের 'ভাড়' ও আজ্ঞাবাহী বালক। পদত্যাগ সম্পর্কে পরে ভুট্টো জানিয়েছেন, 'তাসখন্দে আমি আমার পদত্যাগপত্র জমা দিই। কিন্তু আইয়ুব জাতীয় স্বার্থে তা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেন।'
ফিরতি ফ্লাইটে ভুট্টো মনে মনে ভাবেন, সামরিক একনায়কের সঙ্গে তার সখ্য প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পরিপক্কতার জন্য ৮ বছর যথেষ্ট সময়। জুন পর্যন্ত তিনি নামেমাত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদে আসীন থাকেন। দেশে ফিরেই তিনি লারাকানা চলে যান এবং মাসাধিককাল সেখানে কাটান। আল মুর্তজায় তার সময় কাটতো শিকার ও পরবর্তী পরিকল্পনার ছক এঁকে। এ সম্পর্কে মমতাজ ভুট্টো বলেন, 'কার্যত তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু এতে ভুট্টো মোটেই অখুশি নন। সময় ছিলো তার অনুকূলে। তাসখন্দ চুক্তি সমর্থন না করে দেশে তিনি বীরের মর্যাদা পেয়েছেন। অজনপ্রিয় জেনারেলকে ত্যাগ এবং নতুন পার্টি করা নিয়েও ভুট্টো মমতাজের সঙ্গে আলাপ করতেন। এ ছাড়া নতুন পার্টির ব্যাপারে তিনি শেখ কায়সার রশিদ, মোস্তফা খানের সঙ্গে পরামর্শ করেন।
ভুট্টো আরেকজনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। গোলাম মোস্তফা জাতোই। কিন্তু তিনি জাতোইকে বিশ্বাস করতেন না। ভাবতেন জেনারেল আইয়ুবের সহযোগী। তা সত্ত্বেও জাতোইর সঙ্গে ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার সুন্দরী স্ত্রী মারিয়ার কারণে। প্রথম দিন থেকেই মারিয়া ভুট্টোর সুনজরে আসেন।
নওয়াব শাহে শিকার শেষে পিণ্ডি ফেরার পথে আইয়ুব খান লারকানায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তিনি পার্লামেন্টে তাসখন্দ চুক্তির সমর্থনে বলার জন্য ভুট্টোকে অনুরোধ জানান। বিরোধী দল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রকাশ্য বিতর্কের দাবি করে। তাদের বিবেচনায় কাশ্মিরের মুক্তির জন্য পশ্চিমের 'অভিযান' বাসনা পূরণ করতে গিয়ে পূর্ববাংলার সাড়ে ৬ কোটি লোককে ভয়াবহ বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। অপারেশন 'গ্রান্ড স্ল্যাম' অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আইয়ুব পূর্ব-পশ্চিম সকল মহল থেকে সমালোচিত হন। তার ধারণা, পাকিস্তান রক্ষায় তিনি সর্বোত্তম চেষ্টা করেছেন এবং ভারতের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সই করে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। যদিও দেশবাসীর কাছে পরিচিত হয়েছেন একজন 'দুর্বল ভিলেন' হিসেবে। অপরদিকে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। অতএব ভুট্টোকে রাওয়ালপিণ্ডি নেওয়ার জন্য তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। অবশ্য ভুট্টো সে অনুরোধ রেখেছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১৬ মার্চ জাতীয় পরিষদে পাক-ভারত যুদ্ধের ওপর বিতর্ক শুরু হয়। শাহ আজিজুর রহমানসহ পূর্বপাকিস্তানের বেশির ভাগ নেতা যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। এর জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন করেন। এমন কি তাসখন্দ চুক্তিকেও। এক ঘণ্টার অধিক সময় ধরে তিনি তার সমাপণী ভাষণে বলেন,

'গত দুশে বছরে আমরা কোনো যুদ্ধ করি নি। ... আমাদের জনগণ ত্রিপোলীতে যুদ্ধ করেছে, তারা ইতালিতে লড়াই করেছে। তারা বিদেশি ভূখণ্ডে আত্মাহুতি দিয়েছে, বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু সেসব যুদ্ধ থেকে আমাদের যুদ্ধের পার্থক্য কী? আমরা পাঁচ হাজার লোক হারানো নিয়ে কথা বলছি। পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষ এ যুদ্ধে শরিক হয়েছেন ... আমরা একজনকেও হারাই নি। তাদের কখনো ভুলতে পারবো না। আমরা ক্ষুদ্র একটি দেশের বাসিন্দা হয়ে শক্তিধরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমরা সেই দেশকে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতই করি নি, আমরা বিজয়ও অর্জন করেছি।'

পার্লামেন্ট বিতর্কের পর পরই ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার উচ্চ রক্তচাপ বাড়তে থাকে এবং হৃদযন্ত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। বিতর্কের তিনদিন পর মুসলিম লীগ নির্বাহী কমিটি সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য ভুট্টোর প্রতি নির্দেশ দেয়। তাদের আশঙ্কা, ভুট্টো শিগগিরই নতুন পার্টি গঠন করতে যাচ্ছেন। জুন মাস পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদে বহাল থাকেন। ভুট্টো চেয়েছিলেন সম্মানজনক বিদায়। এ কারণেই জেনারেল আইয়ুব তাকে বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটি নিয়েছেন বলে পত্রপত্রিকায় ঘোষণা দেন। ছুটি শেষে ভুট্টো আর কখনো আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় ফিরে আসেন নি। কেননা তখন নিজেই মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব করার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। ভুট্টো যখন বুঝতে পারলেন তার বিদায় আসন্ন, তিনি জেনারেল আইয়ুবকে বললেন, 'আমি আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবো না। তবে আমার বিদায় হতে হবে সম্মানজনক।'

এ প্রসঙ্গে আইয়ুবের মন্ত্রি রোয়েদাদ খান বলেছেন, ভুট্টো যখন জেনারেল আইয়ুবের 'বিদায়পত্র' হাতে পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি আমার বন্ধু গোলাম ইসহাক খানকে বললাম, তার সঙ্গে আমাদের দেখা করা উচিত। ভুট্টো তখন পিণ্ডির সিভিল লাইনের একটি বাসায় থাকতেন। বাসায় গিয়ে দেখি তিনি একাকী। হুইস্কির গ্লাস হাতে। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি করমর্দন করলেন না। দু হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন। এরপর বললেন, *'আইয়ুব আজ আমার প্রতি যে ব্যবহার করলেন ... জবাবে আমরা দু জনেই জানালাম, 'ভালো দিন আসবে। ...'*

পরদিন ভুট্টো লাহোরের উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

জে.এ. রহিম পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করেছেন। পিপলস পার্টির ঘোষণাপত্রের খসড়াও তৈরি করেছেন তিনি। ভুট্টোর মতে, তিনি সমাজতন্ত্র ও আধুনিকায়নে বিশ্বাস করতেন। অক্টোবর মাসেই প্যারিসে পার্টির ঘোষণাপত্র মুদ্রিত হয়। যদিও পার্টির

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় আরো কয়েক মাস পর। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে। এরপরই ভুট্টো দেশব্যাপী জেনারেল আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূচনা ঘটান। প্রথম সুযোগেই তার সঙ্গে যোগ দেন মমতাজ ভুট্টো, ব্যারিস্টার রফি রাজা, হাফিজ পীরজাদা, মোবাশ্বির গোলাম মোস্তাফা খান, গোলাম মোস্তফা জাতোই প্রমুখ। এ দলের নেতারা ছিলেন মধ্যপন্থী, কাউকে চরম বিপ্লবী বা ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

এর আগে ভুট্টো লন্ডনে পাকিস্তানি ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেটি ছিলো ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস। তিনি পিন্ডি ত্যাগ করেন। রাতের বেলা আমি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে তাকে বিদায় জানাই।'

(রোয়েদাদ খানের সাক্ষাৎকার)

পরদিন লাহোরে গিয়ে পৌঁছলে ভুট্টোকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। সর্বস্তরের মানুষ স্টেশনে ভিড় জমায়। তারা ভুট্টোকে কিছু বলতে অনুরোধ জানালে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। ছাত্র-যুবকরা তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়, হাতে চুমু খায়। *'ভুট্টো জিন্দাবাদ'* শ্লোগান দেয়। ভুট্টো হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন জানান এবং অশ্রুসজল চোখে তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার পরবর্তী সময়ে ভুট্টো 'পিপলস পার্টি' নামে যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন, তার পরামর্শদাতা ছিলেন একজন বাঙালি আমলা। জে.এ. রহিম। ভুট্টোর অধীনেই কাজ করেছেন। ভুট্টো তখনো জেনারেল আইয়ুবের প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেন নি। তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলবেন না। ছাত্রদের দেওয়া সংবর্ধনার জবাবে ভুট্টো বলেন,

'আমার স্বাস্থ্য ভালো নেই। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমার রুগ্‌ণ স্বাস্থ্যও ভারতের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যথেষ্ট। যদি আপনারা তাসখন্দ চুক্তি কিংবা অন্যান্য বিষয়ে আমার কাছে কিছু জানতে চান আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে একথা মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান হচ্ছে পুণ্যভূমি। মুসলমানদের তৈরি রাষ্ট্র। আর এই রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের অভিন্ন উচ্চারণ ও আকাঙ্ক্ষার মিলিত কোরাস।' কাশ্মির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কাশ্মির ব্যতীত পাকিস্তান হচ্ছে মস্তকবিহীন ধড়।' একই ভাষণে ভুট্টো আফ্রিকা ও এশিয়ার সকল জাতীয় সংগ্রামের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সংহতি জানিয়ে বলেন, 'আমরা পৃথিবীর সর্বহারা। ... আমাদের একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে। একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সংগ্রামকে সফল করতে হবে। আমাদের জনগণের এটি প্রাপ্য। শত শত বছর ধরে তারা নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেছে।'

পাকিস্তানে দ্বিতীয় মার্শাল ল' এবং সত্তরের নির্বাচন

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই দেশব্যাপী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করতেও দেড় বছরের বেশি সময় চলে যায়। জেনারেল আইয়ুবের আমলে আটক রাজবন্দিরা অনেকে তখনো ছাড়া পান নি। সামরিক শাসনের নামে বিধি-নিষেধ বহাল ছিলো। রাজনৈতিক সভা সমাবেশ আইনত বেআইনি।

১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার' জারিপূর্বক সকল পার্টির জন্য পাঁচ দফা নীতি ঘোষণা করেন। এর অন্যতম শর্ত ছিলো : ১. কোনো দল ইসলামি আইনের পরিপন্থী কিছু করতে পারবে না, ২. পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আস্থাশীল হতে হবে, ৩. দেশব্যাপী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে, ৪. সকল প্রদেশ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে এবং ৫. সকল প্রদেশে সমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।

৪ জানুয়ারি ১৯৭০। জুলফিকার আলী ভুট্টো তার ৪০তম জন্মবার্ষিকীতে পি.পি.পি-র নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন। করাচিতে আয়োজিত ভাষণে তিনি পতিত সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব ও বিরোধী সকল রাজনীতিককে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। আবেগদীপ্ত ভাষায় ভুট্টো ঘোষণা করেন,

'আমরা পাকিস্তানের জনগণ। জনগণই আমার গোলটেবিলের অংশীদার। ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা ষড়যন্ত্রকারী। জনগণের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করেছেন। তারা বৈঠকখানার বাসিন্দা। এ কারণেই আমরা সেদিন আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিই নি। আমরা জনগণের রাজনীতি করি। বৈঠকখানার নয়, মুক্ত রাজনীতি। জেনারেল আইয়ুব জনগণের সংগ্রামকে নস্যাতের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তিনি ক্ষমতা ছাড়তে চান নি। পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী তার পক্ষে ছিলো। কিন্তু জনগণ সম্পূর্ণভাবে তার বিপক্ষে ছিলো।'

কিন্তু এ প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে যে, আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে কোনো রাজনৈতিক ফর্মুলা কি ১৯৭১ সালের সহিংসতা তথা পাকিস্তান বিভক্তি ঠেকাতে পারতো? গোলটেবিল বৈঠকে ভুট্টো ও মুজিব কি পাশাপাশি বসে একে অপরের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনতেন? কোন্ ভাষায় তারা বলতেন? কতোক্ষণ একে অপরের কথা শুনতেন? শোষণ থেকে রেহাই পেতে ঘোষিত বাঙালির মুক্তিসনদ আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ইতোমধ্যে বহুবার প্রচারিত হয়েছে। গোলটেবিল বৈঠকে তা পুনরাবৃত্তি করার কি প্রয়োজন আছে?

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনঅধ্যুষিত পূর্ববাংলা মনে করে তারা শুধু পশ্চিমের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবেই শোষিত হচ্ছে না, রাজনৈতিক, সামরিক শোষণেরও শিকার। দেশ বিভাগের পূর্বে ব্রিটিশদের প্রতি বেশির ভাগ দক্ষিণ এশিয়ার ধারণাও এমন ছিলো। আবার কট্টর পশ্চিমপাকিস্তানিদের মনোভাব ঠিক এর বিপরীত। তারা মনে করেন, বাঙালিদের অভিযোগ অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য এবং এর পেছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে।

'দেশপ্রেমিক' ভুট্টোর ধারণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর বাঙালি অনুগামীরা পুণ্যভূমি পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকদের চেয়ে কিঞ্চিৎ ভালো। ইয়াহিয়া খানের মতো তিনিও বাঙালিদের সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক পদ ছেড়ে দিতে রাজি, সামরিক বাহিনীতেও তাদের নিতে আপত্তি নেই, এমন কি অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য হিস্যাও দেওয়া যেতে পারে। বাংলায় লেখা, পড়া, বলা এবং সিভিল সার্ভিস

পরীক্ষাও হতে পারে। কিন্তু তারা (বাঙালিরা) আর কতো চায়? তারা কি পাকিস্তানের মুসলমান না দেশদ্রোহী? স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত একটি অঞ্চল কতো বেশি স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাশা ও দাবি করতে পারে? একজন ভালো সিন্ধি হিসেবে ভুট্টোর আঞ্চলিক শক্তির সীমা কতোখানি? পূর্ববাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো সিন্ধুও একটি প্রদেশ। সবগুলো মিলেই পাকিস্তান মহান মুসলিম রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এক বৃদ্ধ গবেট অথবা শেয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোনো বৈঠকে ভুট্টো কীভাবে অংশ নেন? ভুট্টো সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন, জেনারেল আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক ছিলো জনগণের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র।

করাচির নিসতার পার্কের জনসভায় ভুট্টো পুনরায় আইয়ুবকে আক্রমণ করেন। তিনি ঘোষণা দেন, 'আইয়ুব একজন শিকারি। কিন্তু আমি তার চেয়ে ভালো শিকারি। তিনি অন্যান্য নেতাকে ফাঁদে ফেলতে পারলেও জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পারেন নি। আমি চাই নি জনগণ তার ফাঁদে পড়ুক। এ কারণে আমিও বেরিয়ে এসেছি।' গোলটেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করে ভুট্টো আরো বলেন, 'আমরা যদি সেখানে অংশও নিতাম তাহলেও বৈঠক সফল হতো না। আইয়ুব খান নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। কেননা নির্বাচন অথবা সর্বজনীন ভোটাধিকার কোনোটিই অর্জিত হতো না।'

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচনের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের সকল প্রধান দলই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছিলো। ভুট্টো নিজেকে 'আইয়ুবের থেকে ভালো শিকারি' বলে গর্ববোধ করতে পারেন। অন্তত মৌখিক শব্দবাণে তিনি ফিল্ড মার্শালকে বিদ্ধ করতে সক্ষম। অথচ এ ফিল্ড মার্শালের অধীনেই ভুট্টো দীর্ঘ ৮ বছর মন্ত্রিত্ব করেছেন। ভুট্টো এখন পতিত একনায়কের প্রতি তীব্র আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি আবারো আইয়ুবের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'একদা তিনি আমার কাছে বলতেন, 'আমরা যদি পূর্বপাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারি তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লি জয় করতে পারতো। পূর্বপাকিস্তানই একমাত্র বাঁধা। অন্যথায় অনায়াসে আমরা কাশ্মিরে অভিযান চালাতে পারতাম।' নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ভুট্টো একে একে আইয়ুবের গোপন দুর্বলতা ফাঁস করতে থাকেন। পাশাপাশি জেনারেল পীরজাদার প্রশংসা করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে কিছুই বলেন না। অবশ্য ক্ষমতায় থাকতেও তিনি ঘরোয়া পার্টিতে এসব গল্প বলেছেন। এবারে জনসমক্ষে নিয়ে এলেন। কথায় কথায় তিনি আরো যোগ করলেন,

'আমি নির্বাচনকে খেলার সামগ্রী হিসেবে নিই নি। সেদিন আমি আইয়ুবকে বলেছিলাম, পূর্বপাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কোনো কঠিন বিষয় নয় ... প্রত্যেকেই জানেন, আমাদের সাহসী সেনাবাহিনী কচ্ছতে কীভাবে ভারতকে শিক্ষা দিয়েছিলো। ... কিন্তু আইয়ুব খান মনে করলেন, আমি অতি বেশি আবেগপ্রবণ। আমি তাকে বললাম, আবেগের বশে কিছু বলছি না, আপনি শুধু আমার নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ দিন। তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন এবং নিজেকে ভারতের বন্ধু বলে ঘোষণা দিলেন। এ কারণেই আমরা আমাদের ভূ-খণ্ড হারালাম।'

ভুট্টো বিশ্বাস করতেন, তার মতো বেশির ভাগ পাকিস্তানি সেটিই সত্য হিসেবে মানতে চায়, যা তারা মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করেন। তারা এটাও বিশ্বাস করে, ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানি বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পারে। বেয়নেট ও রাইফেলধারী একজন মুসলমান সেনা ১০ জন হিন্দু সেনার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। বেশিরভাগ মানুষের বিশ্বাস ছিলো তাই। অতএব এটিই কি সত্য নয়?

ভুট্টো পুনরায় উচ্চারণ করেন, আমাদের সামরিক অধিনায়করা দুটি ডিভিশন বাড়ানোর অনুরোধ জানালেন। শিল্প স্থাপনে আমাদের অর্থমন্ত্রি যথেষ্ট অর্থের যোগান দিতে পারেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর দুটি ডিভিশন বাড়ানোর প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন। এমন কি ফিল্ড মার্শাল প্রেসিডেন্টও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। যদি আমাদের দুই ডিভিশন অতিরিক্ত সৈন্য থাকতো আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। কাশ্মির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ভারত কাশ্মির ফ্রন্ট থেকে তার সকল সৈন্য সরিয়ে নেয়। আইয়ুব তখন হুনজায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন। সে সময়ে কাশ্মিরে অভিযান চালালে চিরতরে কাশ্মির সমস্যার সুরাহা হতো।

ভুট্টো তার বক্তৃতা-বিবৃতিতে পশ্চিমপাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে চাইতেন। মুজিবের মতো তিনিও বাইশ পরিবারের কঠোর সমালোচনা করতেন। ভুট্টো ঘোষণা করলেন, *'বিগত ২২ বছর জনগণকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তারা প্রতারিত হয়েছেন। আমি তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চাই। আমি চাই ইসলামি সমাজতন্ত্র।'*

তিনি সমস্ত অব্যবস্থা ও শোষণের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দায়ী করে বলেন, 'কায়েদে আযম যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেন তখন তার উদ্দেশ্য ছিলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ। তিনি কখনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চান নি। কেননা এটি ভারতের হিন্দুদের ব্যবস্থা। তিনি চেয়েছেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে এবং তা ভারতের অনুসৃত পথে নয়।'

ভুট্টোর এ যুক্তির সঙ্গেও সত্যের কোনো মিল ছিলো না। ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের বম্বেতে তার বিশাল বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি রেখে এসেছেন। পাকিস্তানে এসেও লাহোরে নতুন সম্পত্তি কিনেছেন। অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে জিন্নাহ ছিলেন উদার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। তিনি বিয়ে করেছেন এক পার্সী মহিলাকে। বম্বেতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো হিন্দু আইনজীবী, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী। দেশ বিভাগের পূর্বে বহু বছর তিনি টাটা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। মতাদর্শের দিক থেকে তিনি পুঁজিবাদবিরোধী নন। কিংবা পেশাগত জীবনেও হিন্দুদের বিরোধিতা করেন নি। তার প্রথম জীবনের রাজনৈতিক উপদেষ্টারাও ছিলেন হিন্দু।

নির্বাচনী প্রচারভিযানে ভুট্টো মাও ক্যাপ এবং সবুজ জ্যাকেট পরতেন। এ দুটিই ছিলো চীন ও 'গণবিপ্লবের' প্রতীক। পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নেতাদের নিজস্ব পোশাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যই তিনি

এগুলো পরতেন। পূর্ববাংলায় আওয়ামীলীগ অনুসারীরা পরতেন মুজিব কোট। তবে ভুট্টো প্রতিপক্ষের সমালোচনার ব্যাপারে সব সময়ই সতর্ক থাকতেন। তাকে যাতে কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা না হয়, সে কারণে ভিন্নভাবে লংমার্চের ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, *'আমাদেরও একটি লংমার্চ প্রয়োজন। কিন্তু আমি যখন লং মার্চের কথা বলি তখন সবাই ভাবে আমি একজন কমিউনিস্ট। ইতিহাসে প্রথম লং মার্চ করেছেন ইমাম হোসেন।'*

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাঙালি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন কমিশন দেশব্যাপী নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে। এর আগে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে। আগস্টের শেষ নাগাদ পূর্বপাকিস্তানে ৩ কোটি ১০ লাখ এবং পশ্চিমপাকিস্তানে ২ কোটি ৫০ লাখ ভোটারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে ভোটারের বিরাট তারতম্য ভুট্টোর কাছে মস্ত-বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। আবার পশ্চিমপাকিস্তানে প্রায় সকল দলই তার বিপক্ষে। রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট তার সন্দেহ ছিলো। আশঙ্কা ছিলো। তা সত্ত্বেও ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'আমরাই নির্বাচনে জয়ী হবো।'

সেপ্টেম্বরে পূর্ববাংলায় প্রথম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ভয়াবহ বন্যায় বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা ডুবে যায়। হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ি হারায়। কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়। অক্টোবরের প্রথম দিকে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিলো। ইয়াহিয়া খান ডিসেম্বরের সাত তারিখ পর্যন্ত তা স্থগিত ঘোষণা করেন।

নির্বাচনী প্রচারভিযান যখন তুঙ্গে তখন পিপিপি'র বেশ কিছু নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। ভুট্টো একে অভিহিত করেন 'ষড়যন্ত্র ও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মাস্তানি' হিসেবে। ১৬ আগস্ট লারাকানার ডেপুটি কমিশনার ও.এম. কারানিকে তিনি লেখেন,

'দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে আমার দলের কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানি করা হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, ব্যাংকার, সামন্তশ্রেণী ও শোষকদের বিরুদ্ধে বলেই শুধু পিপিপি'র কর্মীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।'

১২ নভেম্বর। হাজার মাইল দূরবর্তী পূর্ববাংলায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৫ লাখ (কারো কারো মতে ১২ লাখ) লোক প্রাণ হারায়। দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের উপর দিয়ে স্মরণকালের ভয়াবহতম ধ্বংসলীলা বয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'পাকিস্তানের প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানে ছয়দফা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলে তিনি গণআন্দোলন শুরু করবেন।' মুজিব এবং তাঁর অনুসারীরা জোর দিয়ে বলেন, *'বর্তমানে বাঙালি নিজ দেশে যে ভৃত্যের মতো জীবন-যাপন করছে তা থেকে মুক্তিলাভ এবং পাকিস্তানের মর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার সর্বশেষ সুযোগ হচ্ছে আগামি নির্বাচন।'* মুজিবের ভাষাভঙ্গি আলাদা হলেও ভুট্টোর মতো তিনিও নিজের ইমেজ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। আওয়ামীলীগ প্রধান সরাসরি অভিযোগ করেন, কতিপয় সুবিধাভোগী পরিবার

বাংলার রক্ত শুষে সৌভাগ্যের ইমারত গড়ে তুলেছে। তারা পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আরো বলেন, 'বাংলার ঐক্যকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাঙালি সাংসদদের কেনা-বেচার ষড়যন্ত্র চলছে।'

নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে লাহোরে নিজের আসনে এক নির্বাচনী সভায় পিপিপি নেতা ভুট্টো বলেন, 'গরিব মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকের পক্ষে লড়াই করার জন্য পিপলস পার্টির জন্ম হয়েছে। অন্যান্য পার্টি পুঁজিবাদের দালাল ... তারা জনগণের রক্ত শুষে নেয় এবং সর্বস্ব লুট করে।'

১৮ নভেম্বর ভুট্টো রেডিও-টিভিতে দেওয়া নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, 'অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে পাকিস্তানের জনগণকে মুক্তি দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য।' জনগণের সচেতনতা বেড়েছে এবং শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একই বক্তৃতায় তিনি ধর্ম ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'সীমাহীন দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই তারা ধর্মকে ব্যবহার করছে।'

পিপলস পার্টি নেতা বলেন, 'ক্যান্সারের ন্যায় দুর্নীতি সমাজ দেহে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা দুর্নীতিকে চিরতরে নির্মূল করবো। আমরা অঙ্গীকার করছি, পাকিস্তানের জনগণকে আমরা একটি স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দিবো। সৎ ও দৃঢ়চেতা লোকদের নিয়ে আমরা সরকার গঠন করবো...শক্ত হাতে অপরাধ ও সহিংসতা দমন করবো।...আমরা দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করবো। আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিবো। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবো। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবো। ভবিষ্যতের কর্ণধার হিসেবে ছাত্রদের গড়ে তুলবো। আমরা সরকারি কর্মচারীদের বেতন আরো বাড়াবো...সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করবো। আমরা গরিবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেবো ... আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেবো ... দেশের ভারি শিল্পসমূহের মালিক হবে জনগণ...আমি আপনাদের এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি— একজন মুসলমান হিসেবে, একজন পাকিস্তানি হিসেবে।'

আওয়ামীলীগের বিজয় এবং ভুট্টো-ইয়াহিয়ার টালবাহানা

আগের একটি ঘটনা।

৪ এপ্রিল ১৯৭০। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে। অন্যান্য বাঙালি নেতার সঙ্গেও আলোচনা করবেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, বেশিরভাগ বাঙালি নেতা বড়ো ধরনের কোনো আপত্তি ছাড়াই তার এল.এফ.ও. মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ভুট্টো। জেনারেল তাদের জটিল মনের নাগাল পান নি। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মুজিবের একটি টেপে ধারণকৃত উক্তি বাজিয়ে শোনালে তিনি মর্মাহত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কী উক্তি করেছিলেন? তিনি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে এ ব্যাপারে বলেছেন,

'আমার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরই আমি এল.এফ.ও'র কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। একবার নির্বাচন হয়ে গেলে আমাকে আর কে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে?'

ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যতোটা জানতেন নিঃসন্দেহে ভুট্টো তার চেয়ে বেশি জানতেন। ভুট্টোর মতো মুজিবও একদিন এক জনসভায় যা বলতেন, পরবর্তী সভায় অন্য কথা বলতেন। সর্বোপরি রাজনীতি একটি আপোসের শিল্প। তাই নয় কি?

পিপলস পার্টি নেতা সমস্যাটি অনুধাবন করেছিলেন। এপ্রিলে এক নিবাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দেশে একটি সংবিধান রচিত হবে। কিন্তু এ সংবিধানই আপনাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। কেবল নির্বাচনেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সেখানের জনগণ অবর্নণীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। এর কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।' এ সময়ে ড. মোবাশ্বির ছিলেন ভুট্টোর একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি চেয়েছিলেন গরিব জনগণের দুর্দশা ও দুর্ভোগের জন্য কাউকে দায়ী করতে। এবং একটি শব্দকেই মোক্ষম মনে করছেন 'পুজিবাদী ব্যবস্থা'।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩০০ আসনের জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন পায় (সংরক্ষিত ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ৭টি)। সবগুলোই পূর্ববাংলা থেকে। অন্যদিকে ভুট্টোর পিপলস পার্টি পায় ৮১টি আসন। এর মধ্যে পাঞ্জাবে ৬২ এবং নিজ প্রদেশ সিন্ধুতে ১৮টি। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি আসনে জয়ী হয়। পিপিপি'র অবস্থান তখন আওয়ামীলীগের মোট আসনের অর্ধেকের চেয়ে মাত্র দুটি বেশি।

ফলাফল ঘোষণার কদিন পর লাহোরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে এক সমবেশে ভুট্টো ঘোষণা দেন,

'আমরা সংখ্যাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আমরা কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারি অথবা নাও পারি। কিন্তু পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের চাবি আমার পকেটে। অন্যদিকে সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের চাবিও আমার কাছে। ... আমাদের সহযোগিতা ব্যতীত কোনো কেন্দ্রীয় সরকার চলতে পারবে না।'

একই সমাবেশে তিনি মুজিব এবং ইয়াহিয়ার প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'পিপলস পার্টি সমর্থন না করলে কোনো সরকার কাজ করতে পারবে না; সংবিধান রচিত হবে না। সংবিধান রচনার জন্য আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে'। ... যখন আমি বলি, তখন তা পালনেরও চেষ্টা করি। আমি বোঝাতে চাই ... আমি আমার জনগণের জন্য মরতেও প্রস্তুত আছি।'

বঙ্গবন্ধু দেখলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সুস্পষ্ট জয়লাভের পর ক্ষমতা গ্রহণের আগে ভুট্টোর সঙ্গে দরকষাকষিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৭০ সালের

১৭ ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করলেন, 'বাংলাদেশের আইনসঙ্গত দাবি বানচাল করার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই।'

১৯৭১ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ঢাকায় যেতে রাজি হন। তিনি সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'দেশের ভাবি প্রধানমন্ত্রি' হিসেবেও অভিহিত করেন। ঢাকা থেকে ফেরার পর পরই ইয়াহিয়া খান পীরজাদাকে নিয়ে লারকানা যান ভুট্টোর সঙ্গে শিকারে অংশ নিতে। সেখানে তাদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত সংবিধান নিয়ে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে ভুট্টোর ভাষ্য হচ্ছে—

'প্রেসিডেন্ট আমাদের কাছে ঢাকার আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরলেন। তিনি মুজিবকে আওয়ামীলীগের জন্য তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের কথাও বলেছেন। প্রথমত আওয়ামীলীগ এককভাবে চেষ্টা চালাতে পারে, দ্বিতীয়ত পিপলস পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে, তৃতীয়ত পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষুদ্র ও পরাজিত দলগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে পারে। প্রেসিডেন্ট আরো জানান, এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে উত্তম হচ্ছে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা। আমাদের দিক থেকে ছয় দফার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং সে সম্পর্কে আমাদের প্রবল আপত্তির কথাও জানিয়ে দিয়েছি।'

(The Great Tragedy, Jhulfiqar Ali Bhutto)

এরপর ভুট্টো পাঞ্জাব পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা খানকে ঢাকায় পাঠান। উদ্দেশ্য ছিলো, ২৭ জানুয়ারি তার প্রস্তাবিত মুজিব-ভুট্টো শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। সে বৈঠকেও মুজিবের অনমনীয়তা তাকে হতাশ করে। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজেই তাকে জোর দিয়ে বলেছেন, 'ছয় দফার থেকে এক ইঞ্চি সরে যাওয়ার মতো অবস্থা তাঁর নেই।'

জবাবে ভুট্টো যুক্তি দিয়েছেন, পশ্চিমপাকিস্তানের জনগণ তো ছয় দফার বিপক্ষে। সাধারণ ধারণা হচ্ছে ছয় দফা পাকিস্তানকে বিভক্ত করার। এরপর ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বিলম্বিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি চাপ দেন। কিন্তু মুজিব ১৫ ফেব্রুয়ারির ব্যাপারেও ছিলেন অনড়।

ভুট্টোর ভয় ছিলো যে, একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বানের পর পরই পূর্বপাকিস্তান থেকে একজন স্পিকার নির্বাচিত হবেন এবং ছয় দফার সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হবে। তিনি ঢাকায় আহূত পার্লামেন্ট অধিবেশন বয়কটের কৌশল নেন। ২ ফেব্রুয়ারি তিনি লাহোরে, দু দিন পর করাচিতে এবং পরের সপ্তাহে মুলতানে পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তিনি দলীয় সদস্যদের প্রতি যে-কোনো মূল্যে ঢাকা না যাওয়ার নির্দেশ জারি করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পার্লামেন্ট অধিবেশন আরো ছয় সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। দু দিন পরই জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের নতুন সংবিধান তৈরির উদ্দেশে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে।

ইয়াহিয়ার ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভুট্টো বললেন, তার পিপলস পার্টি অধিবেশনে যোগ দেবে না। তিনি আরো ঘোষণা করেন, 'একটি দলের তৈরি করা সংবিধান অনুমোদনের জন্য আমরা অধিবেশনে যোগ দিতে এবং অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে পারি না।'

এরপর ভুট্টো নবনির্বাচিত সদস্যদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'পশ্চিমপাকিস্তান থেকে কোনো দলের কোনো সদস্য অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় গেলে তার 'ঠ্যাং' ভেঙে দেওয়া হবে।' ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার আগেই পিপলস পার্টির সকল সদস্য তার কাছে লিখিত 'পদত্যাগপত্র' জমা দেন। মুজিব ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে দর কষাকষিতে জেতার জন্য ভুট্টো এ কৌশলের আশ্রয় নেন।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক সমাবেশে ভুট্টো বলেন 'দেশ এখন মহাসঙ্কটে।' সেই সঙ্গে তিনি আরো যোগ করেন, পূর্বপাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলেছি, 'আওয়ামী লীগকে জনগণ ছয় দফার ওপর ভোট দিয়েছে, পিপলস পার্টিকে নয়।' আমি তাকে আরো বলেছি, 'আমাদের পার্টিকে জনগণ ভোট দিয়েছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের জন্য। আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবো। ... তথাপি সব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা আছে। যদি আমরা সে সীমা থেকে অনেক দূরে চলে যাই তাহলে তা দেশের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।' ভুট্টো ভেবেছিলেন, তিনি চাপ দিয়ে মুজিবকে নরম করতে পারবেন। তিনি মুজিবকে আরো প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন যে, পশ্চিমের দায়িত্ব ভুট্টোর হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হলেই কেবল তিনি (মুজিব) পাকিস্তানের পূর্বাংশে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

ভুট্টো সভা-সমাবেশ অব্যাহত রাখেন। লাহোরে এক ছাত্র সমাবেশে ভুট্টো ঘোষণা করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছেন প্রয়োজনে আলাপ-আলোচনার জন্যে ঢাকায় যাওয়ার কথা। আমি তাকে বলেছি।... হ্যাঁ আমি এক বার, দু বার, তিন বার, দশ বারও আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছি...। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর মতো পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তাদের স্বার্থও আমাদের স্বার্থ। কিন্তু একটি প্রদেশের পক্ষে স্লোগান তোলা বেদনাদায়ক। কেননা তারা সমগ্র পাকিস্তানে পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে না? যদি আমরা আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের ধর্মের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি তাহলে সকল শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে। এখানে (পশ্চিমপাকিস্তান) পিপলস পার্টির জয় এবং ওখানে (পূর্বপাকিস্তান) আওয়ামীলীগের জয়লাভও সম্ভব হয়েছে জনগণের দ্বারা। এখানে ভুট্টোর সমাধান উর্দু বাগধারা অনুযায়ী *'ইধার হাম উধার তোম'*। অর্থাৎ 'এটি আমার ওটি তোমার।' যে ভুট্টো তার দেশ, জাতি ও ধর্মের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনিই আবার দ্বৈত ভাগাভাগির পথ বাতলে দেন। কূটনৈতিকভাবে এ প্রস্তাব ছিলো আত্মঘাতমূলক। ভুট্টো সরাসরি বলতে

চেয়েছেন, পিপল্‌স পার্টি পশ্চিমপাকিস্তান শাসন করবে এবং পূর্বপাকিস্তান শাসন করবে আওয়ামীলীগ। অর্থাৎ ভুট্টো হবেন পশ্চিমের শাসক, আর মুজিব পূর্বাংশের। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে ভুট্টো আরো বলেন,

'দেশের উভয় অংশে একমাত্র জনগণই হচ্ছে বিজয়ী শক্তি। এ কারণেই আমরা সংঘাত এড়িয়ে চলেছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা ধৈর্য ধরেছি। আমরা আমাদের মতপার্থক্যকে বড়ো করে দেখি নি। আমরা পূর্বপাকিস্তানে গিয়েছি আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ... আমি লাহোর, মুলতান ও করাচিতে আমার সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমরা নীরব থাকতে চেয়েছি। জনগণ ইতোমধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন— ভুট্টো কী করছেন? কিন্তু এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আগাগোড়া অনড়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঢাকা গিয়ে ঘোষণা করেছেন—মুজিবই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রি। তারা উভয়ই স্বীকার করেছেন, আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। অতএব এটি ধরে নেওয়া যায় যে, দেশের সংবিধানও কার্যত রচিত হয়ে গেছে। কিন্তু যে লাখ লাখ মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছে তাদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে।'

ভুট্টো একক অনুভূতি এবং অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কেও স্মরণ করিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া খানকে তিনি বলেন, *'একজন সত্যিকার পাকিস্তানি মুসলমানের কাছে যদি ভোট সংখ্যাই প্রধান বিবেচ্য হয় তাহলে ভারতে ভোটারের সংখ্যা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি।'* ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেন, *'জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পিপলস পার্টি আকস্মিকভাবে এমন কাণ্ডকারখানা ও বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করলেন যা জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।'*

এর তিন দিন পর ভুট্টো লাহোরে অপর এক জনসভায় বলেন,

'বর্তমান সঙ্কট নিরসনে আমি দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হোক অথবা অধিবেশন শুরু হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনার জন্য যে সময় বেঁধে দেওয়া আছে তা তুলে দেওয়া হোক। যদি এ দুটি বিকল্পের কোনো একটি গৃহীত হয়, আমি আগামিকালই ঢাকা যাবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অধিবেশনপূর্ব অচলাবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো। পিপিপি'র অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে যদি আগামি ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমি পশ্চিমপাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গণআন্দোলন শুরু করবো।'

এ উচ্চারণে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে ইয়াহিয়ার প্রতিই অধিক হুমকি ছিলো। ভুট্টো বলেছেন, 'আগামিকালই আমি ঢাকা যাবো' অথচ তিনি প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন সে কথা বলেন নি। কিংবা তিনি পিণ্ডির বর্তমান শাসক ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রথমে সমাধানে আসতে চান নি। ভুট্টোর মনে হয়েছে যে, এ ক্ষুদে জেনারেল তাকে অগ্রাহ্য করেছেন, অপমান করেছেন। অথচ তিনিই তাকে লারকানায় শিকারে নিয়ে গেছেন। আতিথেয়তা দিয়েছেন। পীরজাদার কূটনীতিকে সমর্থন করেছেন।

আইয়ুবকে ভুট্টো যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন জেনারেল ইয়াহিয়াকে কেন তা করেন

নি? আর কিছুদিন পরই তার শাসনকাল শেষ হয়ে যাবে। আর এখনই তিনি আগাম বলে দিচ্ছেন, মুজিবই হবেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রি।' কী কারণে? কারণ মুজিবের আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদে বেশি আসন পেয়েছে বলে। অথচ এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আর কখনোই বসে নি।

২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পিপলস পার্টির মুখপাত্র মার্সিং-এ লিখেছেন :

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অভিযোগ এনেছেন যে, আমি ক্ষমতা হস্তান্তরে বাঁধা দিচ্ছি। এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি। এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, আমলা, পুঁজিবাদী অথবা শাসকগোষ্ঠী কিংবা কোনো বিদেশি শক্তির সঙ্গে আমার কোনো গাঁটছাড়া থাকতে পারে। এরা সবাই পিপলস পার্টির বিরোধিতা করেছে এবং এর প্রতি বরাবর নাখোশ ছিলো। ... যদি তা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়ে থাকে আমি সংগ্রম করে যাবো। এর জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত আছি।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'যদি দেশের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। পূর্বপাকিস্তানে পি.পি.পি. সদস্যরা দ্বৈত জিম্মি হবে এবং জাতীয় পরিষদ তাদের জন্য 'কসাইখানা' হবে বলে বিবৃতি দিয়েছি। সে সম্পর্কেও তারা প্রশ্ন তুলেছেন। আমি আবারও বলতে চাই, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে জড়ো করা হচ্ছে সে সময় আমি ১২০ দিন পশ্চিমপাকিস্তানের বাইরে থাকতে পারি না। যখন নিরাপত্তা হুমকির মুখে তখন আমার কর্তব্য হচ্ছে আমার জনগণের পাশে থাকা। ... যদি ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসে আমার দল প্রতিবাদ অভিযান শরু করবে।'

ভুট্টোর কাছে ইয়াহিয়ার আত্মসমর্পণ ও অসহযোগ

১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'পরে তারিখ নির্ধারণ করা হবে।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর দলীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি শলাপরামর্শে বসেন। ঢাকায় ৬ দিনের ধর্মঘট ডাকা হয়। ৩ মার্চ এ ধর্মঘট সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে লাখো লাখো মানুষের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন, যদি ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হয় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। বঙ্গবন্ধু এ জনসভায় ভুট্টোকে সংখ্যালঘু দলের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন ভুট্টো সব সময়ই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করে আসছেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার বক্তব্য শেষ করেন 'এবার সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে। এ সভায়ই তিনি অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং মার্শাল ল' তুলে নেওয়ার দাবি জানান।

পরদিন জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, খোদা সাক্ষী নির্বাচনের পর থেকে সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানে আমরা আপ্রাণ

চেষ্টা চালিয়ে আসছি। আমরা শুধু পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার হয়ে আসছে তা সংশোধনেরই চেষ্টা করি নি, দেশের সকল মানুষ যাতে সম্প্রীতির মাঝে বসবাস করতে পারে তারও প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্বপাকিস্তান ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবেন তিনি তা ভাবতে পারেন নি। অন্যদিকে বাঙালিদের হতাশা, দৃঢ়তা, আবেগ-উদ্দীপনাকেও তিনি ততোটা গুরুত্ব দেন নি। এ কারণেই আলাপ-আলোচনার পথকেই সুবিধাজনক মনে করেছেন। ভুট্টো আরো জানান, 'দুই বৃহৎ দলের মধ্যে আরেক দফা সংলাপের সুযোগ তৈরি করার জন্য আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছিলাম। আওয়ামীলীগ যদি চায় আমরা যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময়ে সংলাপে বসতে পারি।'

ঢাকার রাজপথ তখন জনতার পদভারে প্রকম্পিত। বাংলাদেশ জন্মের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। হরতালের প্রথম দিকেই বহু নিরস্ত্র বাঙালি যুবক সেনাবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে দু জন মারা যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, *'বাংলার মানুষকে তার ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য বাঙালি ভাইদের সঙ্গে এ যুবকরা প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। যারা জনগণের বিরুদ্ধে সংঘাতে নেমেছে, যারা নিরীহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে তাদের প্রতিরোধ করুন। এরা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে।'* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারি কর্মকর্তাসহ প্রতিটি বাঙালির প্রতি এ গণবিরোধী শক্তিকে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানান।

পূর্বপাকিস্তানের সকল সরকারি অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়। আধা-সরকরি পিআইএ, রেলওয়েসহ সকল যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। ঢাকায় তখন শুধু সামরিক বিমান চলাচল করে যাতে সাদা পোশাকে পাঞ্জাবি ও পাঠান সেনাদের আনা হতো। ৭ কোটি বাঙালির ওপর চূড়ান্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি হিসেবে গোটা মার্চ মাসে হাজার হাজার পাকিস্তানি সেনা বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এক রেজিমেন্ট বালুচ সেনা চট্টগ্রামে পৌঁছে। ৩ মার্চ অস্ত্রবাহী জাহাজ সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। কিন্তু বাঙালি শ্রমিকরা এ অস্ত্র খালাস করতে অস্বীকৃতি জানায়। বন্দরনগরী থেকে রাজধানী ঢাকার মধ্যবর্তী সড়কের মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। বাংলা ভূখণ্ডে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে।

এ সময়ে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন এডমিরাল এস.এম. আহসান। তিনি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের অধীনে চাকরি করেছেন। পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর সামরিক সচিব নিযুক্ত হন। ধর্মঘটী বাঙালিদের ওপর সেনাবাহিনীকে গুলি করার নির্দেশ দিতে এস.এম. আহসান দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ১ মার্চই তাকে অপসারণ করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রথম সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি দেন। পরে তিনিও গণহত্যার নির্দেশে অসম্মতি জানালে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। এ লোকটি কাউকে গুলি করার জন্য দ্বিধা করেন নি।

৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। এটি ছিলো তার পরবর্তী পদক্ষেপ। পরদিন বিকেলে বঙ্গবন্ধু ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ লোকের জনসভায় ভাষণ দেন। এ সভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করলে এখনো ভাইয়ের মতো বসবাস করার সময় আছে। আমরা যখন রক্ত দিয়েছি তখন কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কীভাবে রক্ত দিতে হয় তা আমরা জানি।'

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার বা নিহত হলে 'বাংলাদেশ'-এর সংগ্রামকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সে ব্যাপারেও তার সহযোগীরা প্রস্তুত ছিলেন এবং বাস্তবিকই বিপুল রক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে সেই বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১ কোটি লোক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন।

১৪ মার্চ করাচির নিসতার পার্কে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে অনেক ছোট এক জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ভুট্টো বলেন,

'আজ পাকিস্তানের সামনে যে ভয়াবহ সঙ্কট বিগত ২৩ বছরে তা আর কখনো আসে নি।' তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষায় আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েছি। একমাত্র বুদ্ধিবিবেকহীন কোনো লোকই শাসকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বর্তমান সংঙ্কট সৃষ্টি করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে। ভুট্টোর সঙ্গে কারা ষড়যন্ত্র করবে? পুঁজিবাদীরা করবে না। তারা আমাদের 'কল্লা' চেয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা করবে না। আইয়ুব সরকারের বিদায় নেওয়ার পর তারা আমাকে দলে ভিড়াতে চেয়েছিলো। প্রতিক্রিয়াশীলরা করবে না।'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার কথিত গোপন বৈঠক সম্পর্কে ভুট্টো বলেন, 'আমরা পশ্চিমপাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করি। ... তিনি (ইয়াহিয়া খান) আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হয়েছেন। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট পূর্ববাংলার বৃহত্তম দলের নেতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন।'

ভুট্টো স্বীকার করলেন পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেই বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি। কিন্তু তিনি আওয়ামীলীগের যুক্তি মানতে চান নি। ভুট্টো দলীয় মুখপাত্র মার্সিং-এ লিখলেন :

আওয়ামীলীগের অভিযোগ, পশ্চিমপাকিস্তান পূর্বপাকিস্তানের কাছে ৩১ বিলিয়ন টাকা ঋণী। আমি এ কথা মানতে পারছি না যে পশ্চিমপাকিস্তান উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ফেরত দেবে। আমাদের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন টাকা। আওয়ামীলীগ দাবি করছে এর মধ্যে ৩৮ বিলিয়ন টাকা পশ্চিমপাকিস্তানকে শোধ করতে হবে। এখন আমি যদি তাদের সঙ্গে আপোস করি তাহলে...আপনারা আমার আত্মসম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন ... এবং পূর্বপাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করণীয় নেই।'

ভুট্টো এখানে সমস্যাটি যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন। তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে

রাজি হন নি। ভুট্টো আরো বলেছেন,

সানুগ্রহে সঙ্কটের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করুন। এটি ছিলো অনিবার্য। একদিকে পূর্বপাকিস্তান কার্যত স্বাধীন হতে চায়, অন্যদিকে পশ্চিমপাকিস্তান শোষণের শিকার হতে চায় না....সঙ্কটের গভীরতা এখানেই ... । এ ষড়যন্ত্রে অশুভ শক্তির হাত রয়েছে। বড়ো ধরনের কোনো পদক্ষেপ সঙ্কট নিরসনে সহায়ক হতে পারে...একমাত্র সমাজতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের গরিবদের সাহায্য এবং শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। সেখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর কোনো প্রশ্ন আসবে না। যদি তারা সেখানে সংখ্যাগুরু হয়, আমরা এখানে সংখ্যাগুরু। দুই অংশ মিলেই পাকিস্তান। উভয় অংশের সমৃদ্ধি হতে হবে সমানভাবে। আমরা চাই ক্ষমতার হস্তান্তর। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।'

ভুট্টোর মনে এখন ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও তিনি অনেক বিলম্ব করে ফেলেছেন। সামরিক শাসনের অবসানই এখন একমাত্র কাম্য। দলীয় সমর্থকদের সমাবেশে ভুট্টো আরো যোগ করলেন,

'প্রিয় বন্ধুগণ।....বাঙালি ভাইদের জন্য আমি কেঁদেছি। আমি জীবন দিয়ে হলেও তাদের সহায়তা করবো। তারা নির্বিচারে হত্যার শিকার হচ্ছে। তাদের দুরবস্থায় কথা ভেবে আমার ঘুম হয় না। আমি সব সময়ই বাংলার সেবা করেছি। বাঙালিরা আমাদের ভাই...জনাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি ভুল করেছেন। আসুন একসঙ্গে বসি। আসুন জাতীয় পরিষদে মিলিত হয়ে সংবিধান রচনা করি। কেবল এ পথেই সামরিক আইনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। ... কিন্তু আপনি যদি 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে বলতে থাকেন আমরাও এখানে সংখ্যাগুরু এবং সিন্ধু দেশ, পাঞ্জাব দেশ বলতে পারি ... সে ক্ষেত্রে কায়েদে আযমের পাকিস্তান কোথায় থাকবে?'

জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো। পশ্চিমপাকিস্তানের মানুষের আবেগ-উদ্দীপনা জাগানোর ভাষা ও দক্ষতা রপ্ত করেছেন ভুট্টো। বার বার আত্ম বলিদানের অঙ্গীকার তাকে শহীদের আসনে বসিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতি অবিচল আস্থা এবং কায়েদে আযমের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি তার ইমেজকে আরো উজ্জ্বল করেছে। তিনি জনগণকে এটা বোঝাতে পেরেছেন যে, তিনি একাই দুই বৃহৎ শক্তি এবং ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। তিনি যে-কোনো সাহসী, যে-কোনো জওয়ান ও জেনারেলের চেয়ে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কীভাবে বলা যায় এ লোকটিই পাকিস্তানের ধ্বংস প্রক্রিয়ায় শামিল হবেন, কারো সঙ্গে হাত মেলাবেন?

এর পরদিনই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঢাকায় যান। বালুচ রাজনীতিবিদ নওয়াব আকবর খান বুগতি আগে থেকেই ঢাকায় ছিলেন এবং তিনি প্রেসিডেন্টকে সেখানে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বুগতির বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিতেই আগ্রহী। তিনি বর্তমান অচলাবস্থার জন্য ভুট্টোকে দায়ী করে বলেন, এ লোকটি সাবেক একনায়ক আইয়ুবের চেয়েও খারাপ এবং নির্দয়। পশ্চিমপাকিস্তানের ছোট ছোট দলের নেতাদেরও ধারণা ছিলো অনুরূপ। তারাও বর্তমান সঙ্কট সৃষ্টির জন্য ভুট্টোর নিন্দা করেন। ১৫ মার্চ করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো অচলাবস্থা নিরসনে তার চূড়ান্ত সমাধান পেশ করেন :

'দুই অর্থনীতি কার্যত দুই দেশভিত্তিক সংবিধান রচনার দাবি আমরা জানাই নি। আমরা বলেছি, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমপাকিস্তানের আইনগত স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা বলছি, দুই অংশের গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। আমরা বলছি কেন্দ্রের ক্ষমতা দুই অংশের সংখ্যাগুরু দলের কাছে এবং প্রদেশগুলোর ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুরু দলের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এই ব্যবস্থাই পাকিস্তানের ঐক্য নিশ্চিত করতে পারে।'

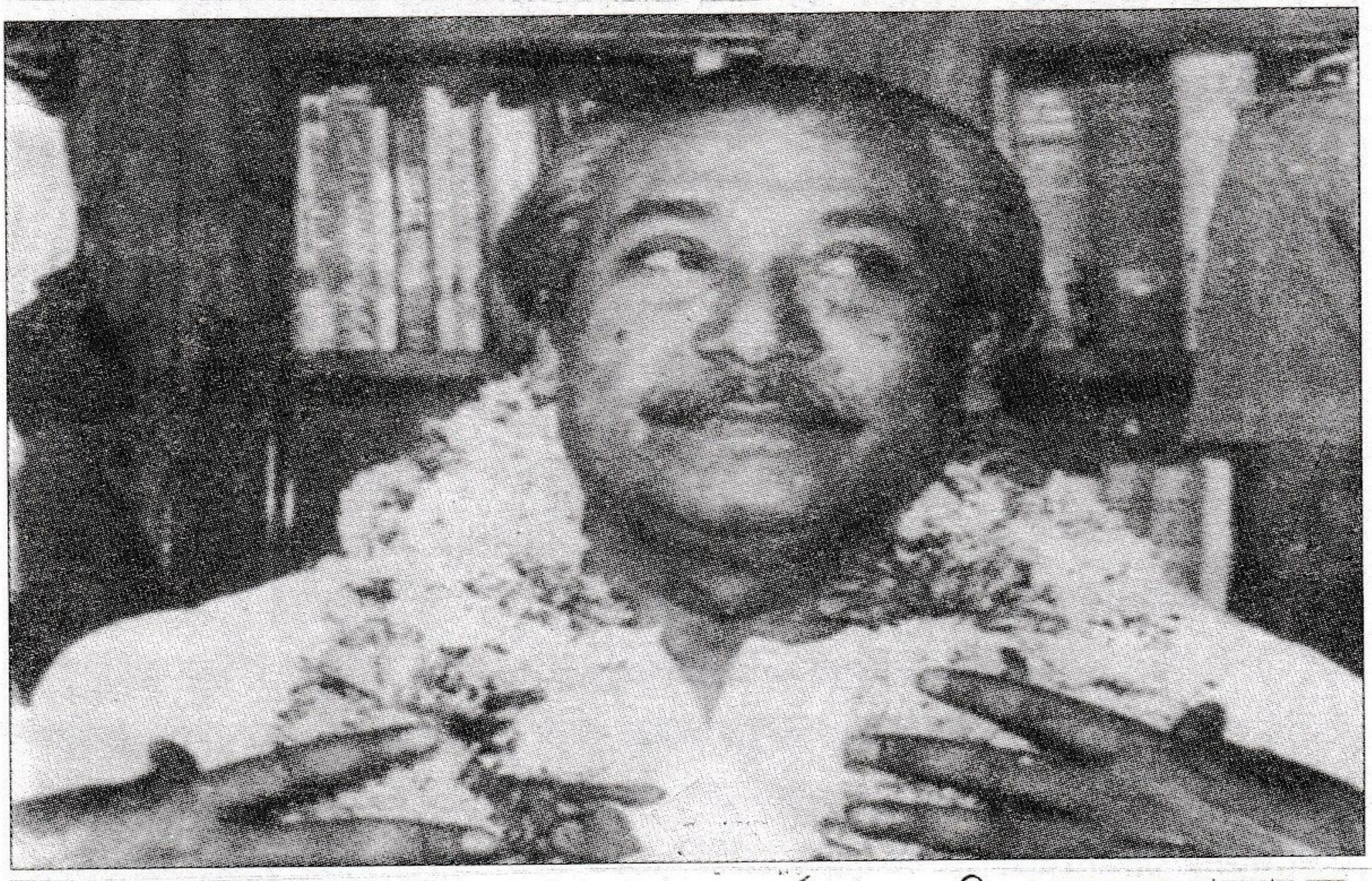
এটি ছিলো জেনারেল ইয়াহিয়াকে পাশ কাটিয়ে মুজিবের প্রতি ভুট্টোর জোরালো আহ্বান। তিনি জনগণের বিপ্লবে শরিক হওয়ার জন্য বাঙালি নেতাকে আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে ইয়াহিয়া খান বা অন্য কোনো পশ্চিমপাকিস্তানি নেতার চেয়ে মোটেই বেশি বিশ্বাস করতেন না। তিনি ভুট্টোর আহ্বানে সাড়া দেন নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালি খান জোর দিয়ে বলেন যে, এ প্রদেশে ভুট্টোর কোনো অবস্থান নেই এবং এর পক্ষে তিনি কিছু বলতেও পারেন না। ভুট্টোর প্রস্তাব সম্পর্কে সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খানও নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। পাঞ্জাব কাউন্সিল মুসলিমলীগ সভাপতি মিয়া মমতাজ দৌলতানা বলেন, 'এক পাকিস্তান থাকতে... দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই সংখ্যাগুরু দলের প্রশ্ন উঠতে পারে না।' ...

বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং *'মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে'* বলে অঙ্গীকার করেন। সাধারণ ধর্মঘটে ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য বড়ো শহর সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। সামরিক আইন ও সামরিক বাহিনীর ওপর ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া বাড়তে থাকে। কার্যত তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো পথ ছিলো না। যদিও জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর গুলিতে বেশ ক'জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। ১৯ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় তার প্রেসিডেন্ট ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। পরদিন সকালে ফের বসার ব্যাপারেও তারা একমত হন। দু পক্ষের আলোচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বঙ্গবন্ধু সহাস্যে জবাব দেন, 'আমি সব সময় ভালোর প্রত্যাশা করি এবং খারাপটির জন্য প্রস্তুত থাকি।'

ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোর হাতে পাকিস্তানের ভাগ্য

২১ মার্চ ভুট্টো দলীয় উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকা রওনা হন। ঢাকার সবুজ জমিনে বিমান অবতরণের পরক্ষণেই তার মনে অন্য ধরনের অনুভূতির জন্ম নেয়। ভুট্টো সে সময়ের কথা স্মরণ করে বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে আমাদের ভাই-বোনেরা (বাঙালি) সেই দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—যে দেশ প্রতিষ্ঠায় তারা এ মাটিতে রক্ত ঝরিয়েছে।' কঠোর সামরিক প্রহরায় তাকে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের শীর্ষ তলায় প্রেসিডেন্টের নির্দিষ্ট সুটে নিয়ে যাওয়া হয়। হোটেল লবিতে যখন তিনি অপেক্ষা করেছিলেন তখন আওয়ামীলীগ সমর্থকরা তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, অপমান ও নাজেহাল করে। বঙ্গবন্ধু আহূত হরতালের কারণে সামরিক প্রহরায় তার

পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় নি'। লবির সোনালি দরজা খুলে গেলে বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীসহ ইকবাল ইসমে বেরিয়ে আসেন। হোটেল লবিতে অপেক্ষা করতে করতে ভুট্টো তখন ক্লান্ত। বাংলা ভাষায় গাল-মন্দ শুনতে শুনতে তার কান ঝালাপালা। তিনি বঙ্গবন্ধুর সহযোগীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, *'আমি জানি কখন তোমরা থামবে। তাকে (মুজিব) বলো, আমি ভাগ্য নিয়ন্তা।'* এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধুর সহযোগী স্মিত হাসলো।'



চিত্র : ১৫। ধানমণ্ডির বাস ভবন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এ বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন।

রাতে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই সঙ্গে চলে পানাহার। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে ইয়াহিয়া তাকে সংক্ষেপে অবহিত করেন। বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ পরিষদ পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য দুটি পৃথক কমিটিতে বসবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা ইসলামাবাদে এবং পূর্বপাকিস্তানের সদস্যরা ঢাকায়। উভয় কমিটি পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে এবং এক সঙ্গে বসবাসের উপায় খুঁজে বের করতে আলোচনায় বসবে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পূর্বপাকিস্তান ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। অন্যদিকে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে পশ্চিমপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ফয়সালা হবে। জাতীয় পরিষদ নতুন সংবিধান অনুমোদন না করা পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন। তবে এখন ভুট্টোর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ সম্পর্কে ভুট্টো তার গ্রেট ট্রাজেডি'তে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট সেই অন্ধকার ও ভাগ্যাহত দিনগুলোতে পুনরায় আত্মসমর্পণ করলেন। প্রথমবার তার কাছে। দ্বিতীয়বার মুজিবের কাছে ভুট্টোর মনে হয়েছে, এ প্রস্তাবনা ভয়াবহভাবে প্রতারণামূলক। তিনি কিছুটা সময় নিতে চাইলেন। ভুট্টো প্রেসিডেন্টকে

জানান যে, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। এরপর ভুট্টো হোটেলে ফিরে এলেন। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ভুট্টোর ভাষায়,

'তারাও এই প্রস্তাবের প্রতি আস্থাশীল নন, এবং আমাকে তা গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। আমার মতো তারাও বিশ্বাস করেন এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দুই পাকিস্তানের বীজ রোপিত হবে। তাদের সহমতের কারণে আমি স্বস্তি ফিরে পেলাম।'

পরদিন সকাল ১১টায় তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে ফিরে আসেন। এ দিনই বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছোটখাটো কথা-বার্তার পর বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইলেন আওয়ামীলীগ উত্থাপিত প্রস্তাবকে তিনি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিচ্ছেন কি না?

জবাবে ইয়াহিয়া তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'এ প্রস্তাবে ভুট্টোকে একমত হতে হবে। এবং তিনি এখানে উপস্থিত আছেন।' এরপর ভুট্টোর জবানিতে বিষয়টি তুলে ধরা হলো, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'তিনি প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করেছেন এবং আমাকে রাজি করানোর দায়িত্ব তার।' তিনি আরো বললেন, 'নীতিগতভাবে ভুট্টো প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছেন এবং তারা এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করতে পারেন।' জবাবে ইয়াহিয়া জানান, 'এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত দেওয়া উচিত নয়।' কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব নাকচ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কি ভুট্টোকে নিছক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন? কেন নয়? তিনি বলেছেন, 'চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে ভুট্টোকেও এ ব্যাপারে একমত হতে হবে। এবং যে অনানুষ্ঠানিক কথা-বার্তা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়।' প্রেসিডেন্ট কাম জেনারেল এবং তার সামরিক সহকর্মীরা কি ইতোমধ্যে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দর কষাকষি কি সময়ক্ষেপণ মাত্র? অথবা গতরাতে পানাহারের সময় সরলমনা ইয়াহিয়া কি তার স্পষ্ট পরামর্শের জন্যে ভুট্টোকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন? ভুট্টো তাকে বাঙালির চরমপত্র তথা বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের কাছে আত্মসমর্পণ না করার কথা বলেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ও অনুভূতি যা-ই থাক না কেন, ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ সকালে এ তিন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত ছিলো পাকিস্তানে ভাগ্য। কোনো কিছু ফয়সালায় না গিয়েও কিছুটা সমঝোতা ও কিছুটা মতদ্বৈততা নিয়ে তখনো পর্যন্ত তারা গণহত্যার ট্র্যাজেডি এড়াতে পারতেন।

প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে বেরিয়ে ভুট্টো মুজিবকে অনুসরণ করলেন। পরে ভুট্টো এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'আকস্মিক মুজিবের মনোভাব পরিবর্তনে আমি কিছুটা বিস্মিত হই। তারা পরবর্তী রুমে গিয়ে বসেন। সেখানে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবকে বাইরে যেতে বলেন।' ভুট্টোর ভাষ্য অনুযায়ী, *'মুজিব হাত দিয়ে আমাকে*

কাছে টেনে নেন এবং তার পাশে বসান। তিনি আমাকে বললেন, 'পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। এবং এটি সামলাতে আমার সাহায্য প্রয়োজন। এ সময়ে আমাদের সন্দেহ হলো রুমে কেউ আড়ি পাততে পারেন। এ কারণে আমরা বারান্দা পার হয়ে পোর্টিকোতে গিয়ে বসলাম।' মুজিব আমাকে বললেন, 'আমি এখন বুঝতে পারছি পিপলস পার্টিই পশ্চিমপাকিস্তানের একমাত্র শক্তি। পশ্চিমপাকিস্তানের অন্যান্য নেতা তার সময় নষ্ট করছেন মাত্র। এ কারণেই আমাদের দু জনের একমত হওয়া প্রয়োজন।' তিনি আরো বললেন, 'পশ্চিমপাকিস্তানে আমি যা কিছু চাই না কেন তিনি সমর্থন দিয়ে যাবেন। বিনিময়ে পূর্বপাকিস্তানের দাবি তাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং সহায়তা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পরামর্শ দিলেন 'আমি যেনো পশ্চিমপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হই এবং তিনি পূর্বপাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হবেন। বঙ্গবন্ধু পূর্বপাকিস্তানেও সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রি হিসেবে মানতে রাজি নন তিনি।' পরে ভুট্টো লিখেছেন, মুজিব শুধু পূর্বাংশ 'দেখাশুনা' করবেন এবং আমি কতো সহজে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি বনে গেছি। এখন ভুট্টো তার নিজের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন।

ভুট্টো ত৭ার 'গ্রেট ট্রাজেডি'তে লিখেছেন,

'তার (মুজিব) মতে, অচলাবস্থা নিরসনের এটাই একমাত্র পথ। তিনি সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেন এবং তাদের বিশ্বাস না করতে বলেন। যদি তারা প্রথমে তাঁকে (মুজিব) ধ্বংস করে তাহলে পরে আমাকেও শেষ করে দেবে। তাকে জবাব দিই, আমি ইতিহাসের কাছে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে সামরিক বাহিনীর হাতে ধ্বংস হওয়াকে শ্রেয় বলে মনে করি। তাঁর প্রস্তাবে সম্মতিদান এবং দুই কমিটি গঠনের ব্যাপারে তিনি আমাকে চাপ দিতে থাকেন। মুজিব আমাকে আরো জানান, তিনি আমার সঙ্গে ফের বৈঠকে বসতে আগ্রহী। তিনি আমাদের দু জনের মধ্যে একদফা গোপন বৈঠকেরও প্রস্তাব দেন। আমি জানাই, গোলাম মোস্তফা খান তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।...বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এটাও ব্যাখ্যা করি যে, আমি সদিচ্ছা নিয়েই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছি এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষেপে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। ... আমি তাঁকে (মুজিব) আরো জানাই, তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আমি ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করবো এবং একটি সুষ্ঠু সমাধানে সম্ভাব্য সব কিছু করবো।'

ইয়াহিয়া জানালা দিয়ে দেখছেন তারা দু জন (মুজিব ও ভুট্টো) বাগানের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং কথা বলছেন। মুজিব চলে যাওয়ার পর ইয়াহিয়া আবার বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের দু জনের মধ্যে কি মধু চন্দ্রিমা হলো?' ভুট্টো তাকে বললেন, 'আমরা রাজনৈতিক বিষয়েই কথা-বার্তা বলেছি।' তিনি মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন, 'প্রস্তাবিত যে পরিকল্পনায় অনি বার্যভাবে দুই পাকিস্তানের ধারণা সুস্পষ্ট আমি তাতে শামিল হতে পারি না। এটিই ছিলো আমার প্রধান আপত্তি। ... কিন্তু এখানে অন্যান্য ত্রুটিও আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি ফয়সালা করাও সহজসাধ্য নয়। ভুট্টো কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, জারি হওয়ার পর থেকে সামরিক আইনই

পাকিস্তানের আইনের একমাত্র উৎস। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের 'আইনগত কর্তৃত্ব'ও আর থাকবে না। সেখানে এক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে ভুট্টো তার লাতিন শিক্ষার কথাও ভোলেন না এবং যোগ করেন 'এর ফলে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারই নিজেকে 'সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন' বলে বিবেচনা করতে পারবে। এ রকম পরিস্থিতিতে পূর্বপাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বন্ধ করা যাবে না।' এ কারণেই ভুট্টো ইয়াহিয়ার 'আইনগত' ও সামরিক সমাধানে সহায়তা করেছেন। নিঃসন্দেহে ভুট্টো ছাড়াই মুজিব ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের জন্য ইয়াহিয়ার একক উন্মত্ততা যথেষ্ট ছিলো।

এ সম্পর্কে ভুট্টো আরো লিখেছেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিই যে, আপসে রাজি করানোর জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তার কর্তৃত্ব ও প্রভাব খাটানো উচিত। নিশ্চিতভাবে এটি যুক্তিসঙ্গত ছিলো যে, মুজিবুর রহমান কিছু কিছু বিষয়ে সমঝোতায় রাজি হবেন। যার ফলে জাতীয় ঐক্য সংরক্ষিত হবে। আবার একইসঙ্গে তাঁর দাবির সারবত্তা পূরণ করা হবে। এরপর ইয়াহিয়া খান সকল বিষয়ে তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিবাদ এবং অশেষ ও প্রয়োজনীয় যুক্তিতর্কে সময় নষ্ট করার মতো প্রেসিডেন্টের নিজের সময় নেই। তার সামরিক মন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তৈরি হচ্ছে। তিনি কখনো লাতিন পড়েন নি। কিন্তু যখন কোনো দল বিশ্বাসঘাতকতামূলক বিচ্ছিন্নতার পথে অগ্রসর হয় তাকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা তিনি ভালোই জানেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পশ্চিমপাকিস্তানের সর্বত্র মুসলিমলীগের লাহোর প্রস্তাবের ৩১তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিবছর এটি পাকিস্তান দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু ঐদিন সকালে ঢাকায় বেশিরভাগ সংবাদপত্র 'বাংলাদেশের মুক্তি' শিরোনামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণীও সন্নিবেশিত হয়। এ বাণীতে তিনি বলেছেন, *'আমাদের সংগ্রাম ন্যায়সঙ্গত এবং এর বিজয়ও অবশ্যম্ভাবী। জয় বাংলা।'* একই দিন ইয়াহিয়া খান কোনো নতুন তারিখ নির্ধারণ ছাড়াই ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন, 'দেশের ভবিষ্যৎ এবং দুই অংশের জনগণের সন্তুষ্টির জন্য আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমঝোতা চাই।' পাকিস্তান দিবসে ইয়াহিয়া খান সকল নাগরিক ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি দেওয়া বাণীতে বলেন, 'আমরা সকল কাজে যাতে জাতির পিতা ঘোষিত একতা, ঈমান শৃঙ্খলার প্রতি অবিচল থাকি সে জন্য এদিনে সবাইকে পুনরায় শপথ নিতে হবে।' ২৩ মার্চ বিকেলে তাঁর ৩২ ধানমণ্ডি সড়কের বাড়ির সামনে এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন,

> *'আমাদের জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্ত দিতে শিখেছে। এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে-কোনো ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং শক্তি প্রয়াসের চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।'*

২৪ মার্চের খবরে বলা হলো, ঢাকায় আওয়ামীলীগ সদর দপ্তরের ভেতরে বেসামরিক

নাগরিকদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ এর প্রতিবাদে এক বিবৃতিতে বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়াস নস্যাৎ করে দেওয়ার কোনো অপচেষ্টা হবে অবিমৃষ্যকারিতার সমান। তিনি এ ধরনের তৎপরতা থেকে বিরত থাকা এবং গণবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্য যে-কোনো ত্যাগের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ঐ দিন রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করেন, *'আমরা বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করবো ... হয় আমরা মানুষের মতো বাঁচবো অথবা আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা যাবো।'*

২৪ মার্চ সকালে ভুট্টো পুনরায় ইয়াহিয়া ও পীরজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বলেন, 'সমাধানের সময় পার হয়ে যাচ্ছে মনে হয়...।' ভুট্টো আরো জানান যে, তিনি তার পার্টির কয়েকজন নেতাকে ফেরত পাঠিয়েছেন এ মুহূর্তে তাদের পশ্চিমপাকিস্তানে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু ভুট্টো ও মোস্তফা খান মুজিবের কাছ থেকে একটি গোপন 'বার্তা' পেয়েছেন। এতে তাদের এখানে থাকার জন্য বলা হয়। ঐ রাতেই মোস্তফা খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চট্টগ্রামে গুলির খবরে মুজিব তখন বিচলিত।

পরদিন সকালে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়া ও পীরজাদার সঙ্গে আরেক দফা বৈঠক করেন। এ সময়ে তার সঙ্গে জে.এ. রহিম ও মোস্তফা খানও ছিলেন। তারা সবাই পরদিন অর্থাৎ দুর্ভাগ্যজনক ২৬ মার্চ সকালে করাচি যাওয়ার বিমান 'বুক' করেন।

রাজনৈতিক মীমাংসার বদলে সামরিক অভিযান

২৫ মার্চ রাতে ভুট্টো ও তার বন্ধুরা রাত সাড়ে ১০টায় ডিনার শেষ করে যার যার রুমে ফিরে গেলেন। ভুট্টোর ভাষ্য অনুযায়ী,

> *'এক ঘণ্টা পর আমরা গোলাগুলির শব্দে জেগে উঠি। কয়েক বন্ধু আমার রুমে চলে আসে।....আমরা হোটেল কক্ষ থেকে তিন ঘণ্টাব্যাপী সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করি। বহু স্থান পুড়ে ভস্মীভূত এবং ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপল' অফিসও জ্বালিয়েও দেওয়া হয়েছে। এই পত্রিকাটি 'নগ্ন' এবং 'আক্রমণাত্মক' ভাষায় সেনাবাহিনী ও পশ্চিমপাকিস্তানের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে আসছিলো। আগুনের লেলিহান শিখার সঙ্গে সঙ্গে আমি অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে থাকি।...দেওয়ালে কি আমাদের পিঠ ঠেকে গিয়েছিলো কিংবা সময়ে কি এ বেদনা অপসৃত হয়ে যাবে এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে আমরা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছি?'*

'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হওয়ার পর পরই ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে টেলিফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আগেই 'ঘরে' ফিরে গেছেন শুনে বিস্মিত হলেন। ভুট্টো যখন মধ্যরাতে ঢাকার আকাশে ভয়াবহ গোলাগুলির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করেন ইয়াহিয়া তখন শ্রীলংকার আকাশে ৪০ হাজার ফুট ওপরে স্কচ ও সোডার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন।

মার্কিন এম-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে পাঞ্জাব-বালুচ সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্যাঙ্ক থেকে ইকবাল বর্তমান নাম জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলে বিরামহীন পাঁচ মিনিট গুলি চালানো হলে ঘুমন্ত ছাত্র ও কর্মচারীদের লাশের স্তূপ জমে যায়। সৈন্যরা ট্যাংকে থেকে নেমে শেল বর্ষণ করতে থাকে। এরপরও যারা বেঁচে আছে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। ছাত্র, অধ্যাপক, প্রশাসক, কর্মচারী—কেউ এদের হাত থেকে রেহাই পান নি। টিক্কা খানের বাহিনী নির্বিচারে হত্যালীলা চালায়।

২৬ মার্চ সালে ভুট্টো 'ঘরে' ফিরে যান এবং পরে সে সম্পর্কে লিখেছেন :

'বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে বিভিন্ন বাড়ির শীর্ষভাগ থেকে বাংলাদেশের পতাকা নামানো দেখলাম ... রাস্তায় বেরিকেডসমূহ ... আমি পুনরায় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করি। আমি প্রার্থনা করি এই ঘটনা যেনো পরস্পরের ধ্বংসের দিকে না নিয়ে যায়। আমার প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম পুনর্গঠিত হোক এবং ফ্যাসিবাদের দুঃস্বপ্ন কেটে যাক ... উল্লাসিত জনতা করাচি বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার মতো মানসিকতা আমার ছিলো না। শেষ-পর্যন্ত আমি বললাম, 'আল্লাহর ইচ্ছেয় পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। আন্তরিকভাবেই আমি তাই চেয়েছিলাম এবং আমিই সঠিক ছিলাম।'

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শুরু করার প্রেক্ষাপটে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং পরে তা চট্টগ্রাম বেতার থেকে প্রচারিতও হয়েছিলো। তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ঘোষণা হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর এ গণহত্যামূলক অভিযান। এ ঘোষণা সারা বিশ্বে আরো বেশি সোচ্চার ও স্মরণীয় হয়েছিলো। এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ 'সমস্যার' ইয়াহিয়া ও টিক্কার চূড়ান্ত সমাধানের সঙ্গে ভুট্টোও একমত ছিলেন এবং তাদের মতো তিনিও আওয়ামীলীগের দাবি এবং ঢাকার ভবনে ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডয়নকে 'ফ্যাসিবাদী দুঃস্বপ্ন' হিসেবে বিবেচনা করতেন। অবশিষ্ট মানব বিশ্ব দেখেছে নিরীহ নিরপরাধ মানুষের ওপর নির্মম এক হত্যাযজ্ঞ। যেমন তা প্রত্যক্ষ করেছে সেদিন ঢাকায় উপস্থিত বিদেশি সাংবাদিক ও বিদেশি কূটনীতিকরা। তারা দেখলেন, জাতীয় স্বাধীনতার জনপ্রিয় দাবিকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে সামরিক সন্ত্রাসীরা কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

এ সময়ে ঢাকায় কর্তব্যরত সিনিয়র মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ব্লাড (কনসাল জেনারেল) এ সম্পর্কে ওয়াশিংটনে তারবার্তা পাঠালেন : *নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা, ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধিজীবীদের নিঃশেষ এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।*

পরদিন ভোরেও ঢাকা শহর জ্বলছে। রক্তের নদী বয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণা করেন,

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের শুরু ছিলো দেশদ্রোহিতামূলক। তিন সপ্তাহ ধরে তিনি এবং তার দল আইনগত কর্তৃপক্ষকে

অমান্য করেছেন। তারা পাকিস্তানি পতাকাকে অপমান করেছে ... তারা একটি সমান্তরাল সরকার পরিচালনারও চেষ্টা করেছে। তারা দেশে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে ... পূর্বপাকিস্তানে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের নানাভাবে হয়রান ও নাজেহাল করেছে। তারা (সশস্ত্র বাহিনী) যে বিরল ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। ... আমি তাদের জন্য গর্বিত।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর গতরাতে পাকিস্তানি সেনারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পশ্চিমপাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার আগে ১ এপ্রিল পর্যন্ত তাকে ঢাকা সেনানিবাসে রাখা হয়। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে মিয়ানওয়ালি জেলের নিঃসঙ্গ 'ভিআইপি' সেলে অন্তরীণ রাখা হয়। ইতোপূর্বে ভুট্টোকেও এ সেলে রাখা হয়েছিলো।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (তখনো তিনি অন্তরীণ) তাঁর গ্রেফতার সম্পর্কে ভুট্টোকে বলেছেন, *'আমি বাড়িতেই ছিলাম। সেখানে কী কী ঘটেছিলো সবকিছু আমি জানতাম। তা সত্ত্বেও পালাই নি। কেন পালাই নি? কেবল দেশকে রক্ষার জন্য। সহিংসতা নয়! আমি সহিংস পথে যেতে পারতাম। কিন্তু যাই নি। তাতে বহু লোক মারা যেতো।'*

বাংলাদেশে যে বহু বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁকে কিছু জানতে দেওয়া হয় নি। গ্রেফতার হওয়ার আগ মুহূর্ত থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফের শুরু করলেন, *'কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, ইয়াহিয়া আমাকে গ্রেফতার করতে চান। গ্রেফতারের আগে আমি সকল রাজনৈতিক নেতাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বললাম। আমি গ্রেফতার হবো-এটাই আমার দেশ।...প্রথমে তারা আমার বাড়িতে মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ করলো।'*

বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর কাছে আরো জানতে চাইলেন, 'আমাকে বলো, এখন আমার দেশের অবস্থা কি?'

সে দিনটি ছিলো ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ ।

ভুট্টো সবেমাত্র জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং তার বাঙালি বন্দিকে দেখতে সামরিক বাংলোতে যান। মুজিবের প্রশ্নে ভুট্টো ভড়কে গেলেন। পরে আমতা আমতা করে জবাব দিলেন দেশের পরিস্থিতি হচ্ছে...। 'আমি ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম, আপনাকে অবিলম্বে রাজনৈতিক সমাধানে আসতে হবে এবং রক্তাক্ত কোনো সমাধানে যাবেন না। আপনাকে অবশ্যই নির্বাচিত নেতাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি (ইয়াহিয়া) আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা শিগগিরই তা করবো।'

এর তিন মাস আগে ভুট্টো তার 'গ্রেট ট্র্যাজেডি' পুস্তিকায় মার্চের সামরিক অভিযানকে সমর্থন করেছেন এবং পাকিস্তানের সমালোচকদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। বিশ্বব্যাপী সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখেছেন, *'যদি এটি অবক্সুসুলভ না হয়ে থাকে তাহলে হতাশাজনক।'* একই পুস্তিকায় ভুট্টো জোরালো সমর্থন দেওয়ার জন্য

চীনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার মতে, 'ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। সাধারণভাবে পশ্চিমা সংবাদপত্র নির্লজ্জভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। ... এ আন্দোলনে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মদদ যোগাচ্ছে ..এবং এরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে....তাদের সেনাবাহিনীই একদা হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ায় সামরিক অভিযান চালিয়েছিলো।' শেষ মার্চের সামরিক অভিযানে অন্যদের মধ্যে হুসনা আহমদের স্বামী আবদুল আহাদও নিহত হন। তিনি ছিলেন অর, জিগহাম ফার্মের সিনিয়র শরিকদার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বন্ধু। হুসনা বহু আগেই স্বামীকে ত্যাগ করে করাচিতে ৭০, ক্লিফটন-এর কাছে ভুট্টোর ভাড়া করা বাড়িতে বসবাস করছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে আরো বহু তথ্য ও খবর ইতোমধ্যে ভুট্টোর হাতে এসে পৌঁছেছে। [হুসনা শেখের সাক্ষাৎকার]

ঢাকায় তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেখ কায়সার রশিদ ধানমন্ডির বাড়ি (বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিকটে) থেকে এপ্রিলে লিখেছে :

'বিপর্যয়ের ভয়াবহতা কতো গভীর তা বিবৃত করা কঠিন। আমি শঙ্কিত যে, যেখানে সামরিক অভিযানের সামান্যই প্রয়োজন ছিলো সেখানে প্রতি ফোঁটা রক্তের দায়দায়িত্ব সামরিক বাহিনীকেই নিতে হবে। প্লিজ, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ করো এবং তাকে বোঝাতে সচেষ্ট হও যে, সামরিক অভিযান আরো জোরদার করার কোনো প্রয়োজন নেই। সমাধানের ক্ষেত্রে এটি সীমা লঙঙ্ঘনকারী ঘটনাও বটে। আমি তোমার কাছে এ ব্যাপারে তোমার নিন্দাসূচক বিবৃতিও চাই। এখানকার ঘটনাবলিতে তারা নির্দয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এটি কি সত্য নয়? আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো তুমি এখানে আসো এবং নিজের চোখে অবস্থা দেখে যাও।'

[ভুট্টোকে লেখা চিঠি, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১]

এপ্রিলের শেষ নাগাদ ১০ লাখ দুর্ভাগা মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যায় এবং রক্তস্নাত বছরের বাকি সময়টা কলকাতার শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করে। দীর্ঘ নয় মাসে প্রত্যহ ৫০ হাজার বাস্তুহারা মানুষ সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

ইয়াহিয়ার সাবেক সাংবিধানিক উপদেষ্টা ড. জি.ডব্লিউ. চৌধুরী—যিনি একজন বাঙালি, ১৯৭১ সালের শেষ মে'তে ঢাকা আসেন। এ সম্পর্কে তিনি তার Last days of United Pakistan গ্রন্থে লিখেছেন,

'এটি ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা। আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই শুনেছি একজন তার পুত্র হারিয়েছেন। আরেকজন স্বামী হারিয়েছেন। বহু গ্রাম পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে ... ইয়াহিয়ার সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার পরবর্তী বৈঠক হয় ... তার প্রথম প্রশ্ন ঢাকায় আমি কী দেখেছি?' আমার ত্বরিত জবাব ছিলো, কোনো বিদেশি সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত কিছু লেখে নি ... 'আমি তাকে এটাও বলেছি শুধু মৃতের সংখ্যা শুনেই এর ভয়াবহতা আঁচ করা যাবে না ... নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, মহিলারা ধর্ষিত হয়েছে যা আমাদের মাতৃভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করেছে। একদা হাজার হাজার জীবনের বিনিময়ে উপমহাদেশের মুসলমানরা যে দেশ কায়েম করছিলো। ...তাকে ফ্যাকাসে মনে হলো এবং তিনি আমার সঙ্গে

কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি এটাও জানতেন যে, আমি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য কী পরিমাণ নিষ্ঠাবান এবং কখনো মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনাকে সমর্থন করি নি। ভারত প্রভাবিত একজন আদর্শবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী'র মতো আমার মূল্যায়নকে তিনি বাতিল করতে পারলেন না। এরপর আমি শাসক দলের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গেও পর্যায়ক্রমে দেখা করি। তাদের মনোভাব আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে।'

বিদ্রোহীদের অবশ্যই নির্মূল করে দিতে হবে। এরপর আমরা যে-কোনো রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি।'

জেনারেল হামিদ, পীরজাদা ও ওমরের নেতৃত্বাধীন সামরিক কর্মকর্তাদের চিন্তা ছিলো—শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিরতরে পূর্বপাকিস্তান সমস্যার সমাধান করা যাবে ... ইয়াহিয়া খোলাখুলি আমাকে জানালেন, বিচারপতি কর্নওয়ালিশকে পূর্ব পাকিস্তানের 'সীমিত' স্বায়ত্তশাসন সংবলিত একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য বলা হয়েছে। ভুট্টো তার পার্টির জন্য 'কার্যকর ক্ষমতা' দাবি করেছেন। তাকে মোকাবিলার জন্যই কর্নওয়ালিশকে দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো। ইয়াহিয়া তখনো ভুট্টোর কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। ভুট্টো ছিলেন পূর্ববাংলার বাঙালিদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। তাদের এ বিচার মোটেই অযৌক্তিক নয়। কতিপয় 'শিকারী' জেনারেলের যোগসাজশে তিনিই সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঢাকার গণহত্যার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। কিন্তু জুলাইয়ের গোঁড়ার দিকে তিনি হোয়াইট হাউস নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠান। কিসিঞ্জার ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইয়াহিয়া মাও সেতুং এবং চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তার গোপন বৈঠক সম্পর্কে অবহিত করেন। চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি (ইয়াহিয়া) ঘটক হিসেবে কাজ করেছিলেন। জুলাই মাসে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, কিসিঞ্জারের পাকিস্তান ত্যাগ অপ্রত্যাশিতভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ থেকে বেইজিং যান। আমেরিকার গোপন কূটনীতিকে সহায়তা করার জন্য কিসিঞ্জার ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। আর এটি প্রত্যাশা করা দুরূহ যে, বাংলাদেশের সমালোচনার জন্য হোয়াইট হাউজ প্রকাশ্যে তাকে তিরস্কার করবে।

এ সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার উদ্যোগ নেন। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি। এর আগে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউজের সমর্থন চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। জেনারেল ইয়াহিয়া ও নিক্সনের মতো ভুট্টোও কখনো ইন্দিরা গান্ধীকে পছন্দ করতে পারেন নি। এরা তিন জনই ইন্দিরার 'অহমিকা' নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করতেন। কখনো এ জোক্স শালীনতার সীমাও ছাড়িয়ে যেতো।

পূর্বপাকিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনায় শাহের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে তেহরান পাঠান। যুদ্ধের ব্যয়ভার অনেক বেশি এবং তা পূর্ব

ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। পশ্চিমে গণহত্যার খবর প্রচারিত হওয়ার পর ডেমোক্রেটিক দল নিয়ন্ত্রিত মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে সকল অস্ত্র চালানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তখন আমেরিকান অস্ত্রের অন্যতম মজুদাগার ছিলো ইরান। আর এখান থেকে জানাজানি না করে অস্ত্র পাকিস্তানে নেওয়াও ছিলো সহজ। এ ছাড়া ইরানের শাহের সঙ্গে পাকিস্তানের শিয়া বংশোদ্ভুত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর সম্পর্কও ছিলো চমৎকার। এ সময় থেকেই ভুট্টো পারস্য শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাকে নিয়মিত লারাকানায় বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানান। এ পার্সী 'রাজাদের রাজা'র কাছে সকল আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ভুট্টোর ধারণা ছিলো। পরে শাহ সম্পর্কে ভুট্টো লিখেছেন,

'অবশ্যই তিনি একজন চমৎকার মানুষ। তার আচার-আচরণ এক ধরনের ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রখর। তিনি ছিলেন কিছুটা গোঁড়াপন্থী। ... তবে আমি তার সাহস সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নই ...। অত্যন্ত নিষ্পাপ। ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় কথা বলেন ... কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু কোন্‌টি আগে করবেন কোন্‌টি পরে করবেন তা গুলিয়ে ফেলেন। তাকে খুশি করাও যেমন কঠিন, অখুশি করাও কষ্টসাধ্য। সামান্য কিছুতেই তাকে ভুল বোঝা স্বাভাবিক।'

ইয়াহিয়ার প্রত্যাশা সাংবিধানিক প্রশ্নে ভুট্টোর সঙ্গে পূর্বে যে সমঝোতা হয়েছিলো তার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। ২৯ জুলাই ইয়াহিয়া ভুট্টো ও তার পি.পি.পি. 'টিম'কে করাচির গভর্নমেন্ট হাউসে এক আমন্ত্রণ জানান। তার পরিকল্পনা, সেখানে পীরজাদা ও তাদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নওয়ালিস্‌কে সঙ্গে নিয়ে তিনি পি.পি.পি. নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। কিন্তু ভুট্টো এ ধরনের বৈঠকের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রেসিডেন্টকে নিশ্চয়তা দেন যে, দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে শাসকদের সঙ্গে এ রকম কোনো সংঘাতে যেতে তিনি ইচ্ছুক নন।' তিনি আরো লিখেছেন, *'প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি যে ঘোষণা দেবেন তার প্রতি আমরা আস্থাশীল। আমরা আপনাকে জানি এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনি মানুষের সঙ্গে সমঝে চলবেন তাও আমাদের ভালো জানা আছে। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ যদি ক্ষমতায় আসে আমরা তাদের বিরোধিতা করবো এবং তাদের ধ্বংস করে দেবো।'*

ভুট্টো সানন্দে ইয়াহিয়াকে আশ্বস্ত করেন, পরবর্তী সরকারে আপনিই রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অলঙ্কৃত করতে পারেন।' এবং অবশ্যই ভুট্টো হবেন প্রধানমন্ত্রি। ভুট্টো তাকে আরো লিখেছেন, 'আপনি অন্যান্য দলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। এতে আমরা আপত্তি করবো না।' কিন্তু ভুট্টোর আপত্তি এ ধরনের পার্টিসমূহের সঙ্গে কোনো গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বসতে রাজি নন। জনগণের সঙ্গে তার দৃঢ় অঙ্গীকারকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এ কারণেই অন্যান্য দলের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাবে ভুট্টো সরাসরি অসম্মতি জানিয়ে বলেন, 'কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে।' জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। এ ছাড়া তিনি মনে করেন না, গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে কোন 'সন্তোষজনক' সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব। পিপিপি'র সেক্রেটারি জেনারেল জে.এ.

রহিম ভুট্টোর মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন,

'যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাসঘাতকতা নাও করতেন তাহলেও সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমেই সঙ্কটের অবসান ঘটতো না। সম্পত্তির সম্পর্ক থেকেই সঙ্কটের উৎপত্তি...যদি আমরা ক্ষমতায় আসতাম তাহলে আমরা পরিবর্তনের সূচনা ঘটাতাম।....কয়েক বছর পর জে.এ. রহিম নিজেই ভুট্টোর জন্য বড়ো ধরনের সমস্যা হয়ে দেখা দেন। তার জিহ্বার মতো তার মনও ছিলো ধারালো এবং তার স্মৃতিশক্তিও প্রখর ছিলো, যেমন ছিলো ঠিক ভুট্টোর।'

জেনারেল ইয়াহিয়ার জবাব ছিলো ধীরস্থির। ভুট্টো বা রহিমের মতো ক্ষিপ্র নয়। ভুট্টোর চিঠির জবাবে জেনারেল ইয়াহিয়া লেখেন,

'জনগণকে কীভাবে সমঝে চলতে হয় আপনি ভালো জানেন। কিন্তু আমি আপনাকে জানি। আমি একজন সৈনিক। কিন্তু অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমি ক্ষমতায় আসি নি।...ক্ষমতায়ই আমাদের বেছে নিয়েছিলো। আমরা আসতে চাই নি...কেননা আমরা চেয়েছিলাম... দেশকে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি নিজে শুধু আল্লাহ তা'আলার শক্তিতে ভীত। সংবিধান কোনো সাধারণ আইন নয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কীভাবে আপনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জনগণকে অস্বীকার করেন? সংবিধান রচনায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করেন?...সে ক্ষেত্রে সংবিধান রচনায় কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয় দেখানো যেতে পারে না। আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভীতিতে আপত্তি ভুলেছেন—অন্যরা আপনার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে আপত্তি তুলবে।

যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত সংবিধান নেই...এর চেয়েও জরুরি হচ্ছে একটি ভালো সরকার। আমাদের অবশ্যই এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে—যা সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে এবং জনগণের চাহিদা মেটাতে পারবে। আপনার সঙ্গে বৈঠকে আমি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমি অন্যান্য দলের সঙ্গেও আলোচনা করবো। কিন্তু আমি ১২ কোটি মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি না।'

ভুট্টোর মুখের ওপর আয়তচোখের দৃষ্টি ফেলে ইয়াহিয়া খান ধীরস্থিরভাবে বলেন, 'আমার সঙ্গে সংঘাতের কথা বলবেন না। আমি আপনার প্রতিপক্ষ নই। কিন্তু যখন আমি ক্ষমতায় আছি আমার অবস্থান থেকে যা প্রয়োজনীয় মনে হবে তা করে যাবো... আমি আপনাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই.. কিন্তু আমি বলতে পারি না কেন্দ্রে কে ক্ষমতাসীন হবে।' জেনারেল ইয়াহিয়া এরপর পি.পি.পি. নেতাদের পূর্বপাকিস্তানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে যেসব আসন খালি হয়েছে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেন। তিনি পূর্বপাকিস্তানে ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার পরিকল্পনা নেন।

এ সংঘাতের এক সপ্তাহ পর ভুট্টো অ্যাপেনডিক্সে আক্রান্ত হন। ৫ আগস্ট তাকে করাচি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডা. নাসির শেখ সফল অস্ত্রোপচার করেন। এর এক সপ্তাহ পর তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করার জন্য তাকে আরো দু সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়। ইয়াহিয়া খান ও পীরজাদার সঙ্গে ভুট্টো ২৫ আগস্ট সাক্ষাৎ করে পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ইয়াহিয়া তাকে পূর্বপাকিস্তানে বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান। এর এক সপ্তাহ পর ড. এ.এম. মালিকের নেতৃত্বে একটি অজনপ্রিয় প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়।

এ সম্পর্কে ভুট্টো পীরজাদাকে পরে এক চিঠিতে লেখেন, 'গত ২৭ মার্চ আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলাম প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্ত তারই সমর্থক বলে মনে করি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্যোগ না থাকলে সামরিক অভিযান পর্যাপ্ত নয়। যদিও আমি মনে করি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কোনো বেসামরিক সরকার নিয়োগের অর্থ এক নয়।'

ভুট্টোর হুমকি ও ইন্দিরার কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রস্তাব

ভুট্টোর আশঙ্কা ছিলো, ইয়াহিয়া হয়তো তার বিরুদ্ধে আরেকটি ষড়যন্ত্র আঁটছেন। যেমন ১৯৬৯ সালের আইয়ুব এঁটেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে। ২ সেপ্টেম্বর তিনি পীরজাদাকে সতর্ক করে দিয়ে লেখেন, 'এ ধরনের সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রচণ্ড বিরূপ জনমত এড়ানোর জন্য আমার মতামত আমি জনসমক্ষে এবং সংবাদপত্রে তুলে ধরতে চাই এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই তা চাই। সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে।'

মোস্তফা খানের মাধ্যমে সে চিঠি পীরজাদার কাছে পৌঁছানো হলো। পীরজাদা সে চিঠির বক্তব্য শুধু প্রেসিডেন্টের কাছে তুলেই ধরেন নি, ৯ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠকও নিশ্চিত করেন। ভুট্টো চেয়েছিলেন বৈঠক করাচিতে হোক। ইয়াহিয়া তাকে ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। ভুট্টো বিনীতভাবে সে আমন্ত্রণ নাকচ করে দেন। ৮ সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে আরেকটি চিঠি পাঠান। এবারে সরাসরি ইয়াহিয়া খানের কাছে। ভুট্টো এতে—'অবিলম্বে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেওয়ার' আহ্বান জানান। ভুট্টো তাকে আরো লেখেন :

> *'যন্ত্রণাকাতর' ও 'বিচলিত' জাতি তার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চায়। ইতিহাসই জীবন্ত বিচারক। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য সম্পন্ন করা উচিত। আমরা আত্মগোপনে যাওয়া ব্যক্তির মতো ভূমিকা নিতে পারি না। ... গন্তব্য এখন আপনার হাতে এবং আমাদের কাছে অর্পিত হয়েছে অসীম দায়িত্ব। আল্লাহর রহমত ও জনগণের মঙ্গলের জন্যই এটি সম্পন্ন করা উচিত। পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে আমরা কৃতসঙ্কল্প।*

একই দিন ভুট্টো হায়দরাবাদে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি কোনো কিছু গোপন না রেখে স্পষ্টত ইয়াহিয়ার প্রতি তার আশাভঙ্গের বিষয়টি জনগণের কাছে তুলে ধরেন। ভুট্টো আরো বলেন, 'প্রেসিডেন্ট'কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার বয়স এখন তেতাল্লিশ। আন্দোলন গড়ে তোলার যথেষ্ট সামর্থ্য ও সাহস আমার আছে। যারা অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী ভুট্টো তাদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'আমরা জনগণের সকল শত্রুকে পরাস্ত করবো।' এর তিনদিন পর ভুট্টো করাচির কায়েদে আজম মিউজিয়ামে এক বড়ো

সমাবেশে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন,

'ভাইসব! জুলফিকার আলী ভুট্টো হিসেবে, একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি কিছুই না। আপনারাই আমার ক্ষমতা ও শক্তি। জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত পৃথিবীর কোনো সরকার তার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। নির্যাতন চালিয়ে, বুলেট ছুঁড়ে এবং শক্তি প্রয়োগ করে কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কয়েক মাস আগে যখন আমি প্রথম এ কথা বলি, তখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও পরাজিত রাজনীতিকরা একে দেশদ্রোহিতামূলক বলে অভিহিত করেন। তখন কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো? পূর্বপাকিস্তানে যা ঘটুক না কেন তার জের কি পশ্চিমপাকিস্তানেও পড়বে?... কিন্তু আমি ক্ষমতাসীনদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, এখানে আমরা কোনো রক্তপাত সহ্য করবো না। আমরা আরেকটি জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটতে দিতে পারি না। জনগণের আত্মত্যাগের বিনিময়ে কায়েদে আজম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ওহ! জাতির পিতা, আমরা যে পাকিস্তানে বসবাস করছি তুমি কি সেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলে? এই কি ছিলো তোমার ধারণা? তোমার স্বপ্ন? ... তিনি ছিলেন গণতন্ত্রী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি তার শ্রদ্ধাও ছিলো ... তিনি বলতেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংবিধান প্রণয়ন করবেন ... বলো, বলো, আমার কায়েদ ... কখন এই নিপীড়নের রাত শেষ হবে? খোদার দোহাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করুন।'

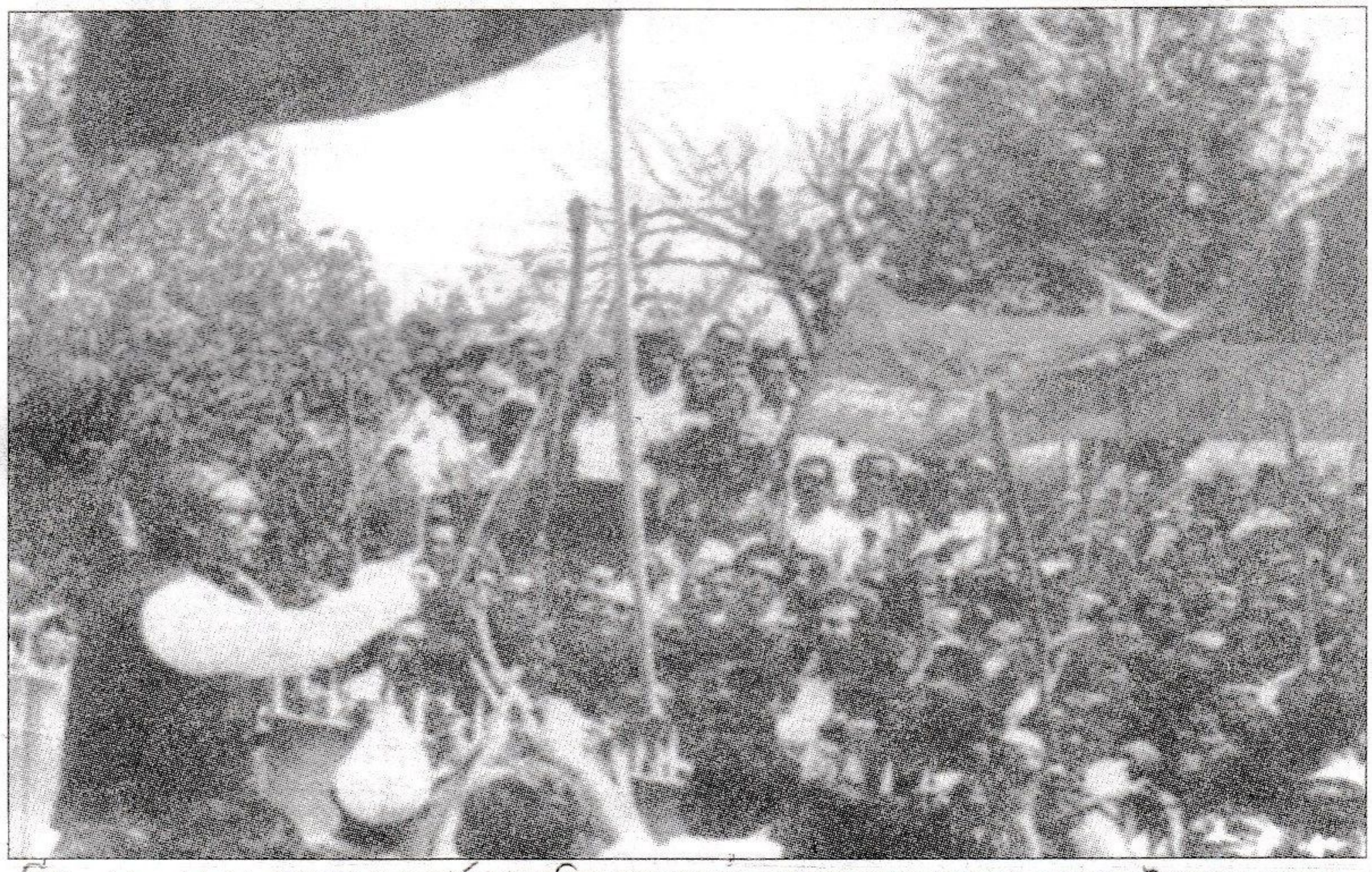
১৮ অক্টোবর করাচিতে ভুট্টোর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া খান অঙ্গীকার করেন পূর্বপাকিস্তানে উপনির্বাচন (যদি সম্ভব হয়) শেষ হওয়ার পর বছর শেষ হওয়ার আগেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। এর পরপরই এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো ঘোষণা করেন, কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তার বিশ্বাস পাকিস্তানের দুই অংশ একক সরকারের অধীনে পরিচালিত হবে।

২৯ সেপ্টেম্বর ভুট্টো পুনরায় ঘোষণা করেন, 'আমরা বিশ্বাস করি আজ আমাদের সকলের প্রধান কর্তব্য দেশকে রক্ষা করা।' তিনি বলেন, 'কেউ যুদ্ধ চায় না। তবে যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় তবে তা হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ।' সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণে এ যুদ্ধ। ভুট্টো তখনো ভারতের বিরুদ্ধে 'হাজার বছর ধরে যুদ্ধ' করতে প্রস্তুত এবং বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানকে বিজয়ী করার ব্যাপারে জেনারেল ইয়াহিয়ার চেয়ে তিনি অধিকতর যোগ্য। তিনি পাকিস্তানের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি অসতর্ক ছিলেন না এবং এর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতার কথাও জানতেন।

২৯ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভুট্টো বলেন, 'পূর্বপাকিস্তান জ্বলছে, সমগ্র দেশ ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছে। দেশের অপর অংশে নতুন করে গোলাগুলি শুরু হলে পাকিস্তানকে উদ্ধার করা যাবে কী করে? জনগণের অধিকারকে স্বীকার না করে নিলে সে গোলাগুলি শুরু হতে বাধ্য।... জনগণের পক্ষে আমাদের স্পষ্ট দাবি হচ্ছে, সমগ্র দেশের সংহতি এবং জনগণের কল্যাণ। পাকিস্তানের বিনাশকামী আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের সঙ্গে এখানেই আমাদের পার্থক্য। আমরা একই লেবেল লাগাতে পারি না। পাকিস্তানের দু অংশের জনগণের প্রতি সেটি হবে খুব অন্যায় ও

অবিচারের শামিল। দেশপ্রেমিক এবং দেশদ্রোহী এক হতে পারে না। ... পাকিস্তানের নৈতিক শত্রু ভারতের সঙ্গে পিপিপি'র কোনো গাঁটছাড়া নেই যা আমাদের জাতীয়তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

সেপ্টেম্বরেই জেনারেল ইয়াহিয়ার আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা বিভাগের নতুন প্রধান মেজর জেনারেল জিলানি খবর দেন যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় সেনা পূর্ববাংলার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ ছাড়া সোভিয়েতের ভারি অস্ত্রের চালান ভারতে আসছে। ইয়াহিয়া খানও জানতেন, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয়গ্রহণকারী লাখ লাখ বাঙালি উদ্বাস্তুকে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ভারতকে প্রতিমাসে কোটি কোটি রুপি ব্যয় করতে হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী এ ভার বহনের চেয়ে যুদ্ধকেই শ্রেয় মনে করতে পারেন।



চিত্র : ১৬। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ধানমণ্ডির বাস ভবনে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পতকো উত্তোলন করেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ইয়াহিয়া খান ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠানো বার্তায় ৬ দফা পুরোপুরি বাস্তবায়নের অঙ্গীকারপূর্বক একটি গোপন শান্তি পরিকল্পনার কথা জানান। ইসলামাবাদে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত জয় কুমার অটলের মাধ্যমে এ বার্তা পাঠান। কিন্তু সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট ভারত তখন সে ধরনের কোনো প্রস্তাবে সাড়া দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। মৌসুমী বৃষ্টি বন্ধ এবং নদীর পানি কমতে থাকলে ভারত পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে সৈন্যদের জড়ো করতে থাকে।

ইয়াহিয়া খান উদারমনা প্রবীণ বাঙালি নেতা নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত করেন। নিজে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থেকে তিনি ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ভুট্টো প্রথমে এ প্রস্তাব নাকচ করেন। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে কম জনপ্রিয় একজন বাঙালির দুই নম্বর হয়ে তাকে থাকতে হবে! এটি ছিলো তার কাছে অপমানজনক। অক্টোবরে তিনি মুলতানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, '*আমি প্রেসিডেন্টকে বলেছি, তার উপদেষ্টারা তাকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি তাকে*

এটাও বলেছি তারা (উপদেষ্টারা) হচ্ছেন গোখরো সাপের মতো। প্রেসিডেন্ট হাউজে যতোগুলো গোখরো আছে তাদেরকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।'

ভুট্টো আরো বলেন, 'সকল যুদ্ধই রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। পাকিস্তানের জনগণ যদি সরকারের সঙ্গে না থাকে তাহলে তারা কীভাবে সফলতার সঙ্গে শত্রুকে মোকাবিলা করবে? তারা সর্বাত্মক যুদ্ধের কথা বলছেন। যদি সর্বাত্মক যুদ্ধই বেঁধে যায় তাহলে জনগণকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। ... আমরা জনগণের প্রতিনিধি। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে আমাদের সময়ের প্রয়োজন, অন্তত ছয় মাস। কিন্তু পাকিস্তান দু মাসও সময় পায় নি।' নভেম্বরের মাঝামাঝি ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করা শুরু করে, পাকিস্তানের নড়বড়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তারা সহজেই ভেঙে ফেলে। এক লাখেরও কম সেনা নিয়ে পাকিস্তান বাহিনী নিরাপরাধ ও নিরস্ত্র লাখ লাখ বাঙালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত অস্ত্রসজ্জিত ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর কোনো তুলনাই হয় না। ভারতীয় বাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল হন) শ্যাম মানেকশ। নভেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন যান। সেখানে তিনি নিক্সন বা কিসিঞ্জারের কাছ থেকে কোনো আশার বাণী পান নি। বরং তারা ইন্দিরাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তানি নেতাদের আরো সময় দেওয়া প্রয়োজন।'

ওয়াশিংটন থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে জানান,

'সেনাবাহিনীর সংঘাত নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা একে শান্তির প্রতি হুমকি বলেও অভিহিত করেন।' তিনি বলেন, *'যখন গোটা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানো হয়েছিলো তখন কি শান্তি ছিলো? দু দেশের মধ্যে যুদ্ধের কারণে মানুষ মারা গেলেই বিশ্ব উদ্বিগ্ন হবে' একটি সামরিক শাসক জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা ও দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে সে ব্যাপারে কি বিশ্ব উদ্বিগ্ন হবে না?*

এরপর ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর বিশেষ দূত হিসেবে বেইজিং যান এবং ভারত পূর্বপাকিস্তান আক্রমণ করলে সামরিক সমর্থন পাওয়া যাবে—চীনা নেতা মাও চৌ এন লাইয়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। কিন্তু এর দু সপ্তাহ পর পাকিস্তান যখন অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তখন চীন কার্যত কিছুই সরবরাহ করে নি।

২২ নভেম্বর সকালে ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও সেনারা যশোর অভিমুখে সীমান্ত অতিক্রম করে। ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল রাজা এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ভারত 'আক্রমণ' করেছে। একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, 'যুদ্ধ কি আসন্ন?'

জবাবে রাষ্ট্রদূত জানান, 'শুধু আসন্ন নয়, যুদ্ধ চলছে।'

দু দিন পর ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের একজন বিশ্বাসভাজনের কাছ থেকে একটি গোপন বার্তা পান। সে বার্তায় বলা হয়,

'এখন যে-কোনো দিন আপনার উচিত প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করা। ভুট্টোর বিশ্বস্ত সহযোগী তাকে পরামর্শ দেন যদি ভারত একবার পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তাহলে পাকিস্তানের কর্তব্য হবে ভারতের পূর্বাঞ্চল দখল করা এবং স্থায়ীভাবে তা পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা। এ ফলে চীনের সঙ্গে পূর্বাংশের পাকিস্তানের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। যে-কোনো মূল্যে কাশ্মির দখল এমন কি শিখ-পাঞ্জাবকে খালিস্তান রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।'

উদ্বিগ্ন বার্তাপ্রেরক পড়ার পর চিঠিটি নষ্ট করে ফেলার অনুরোধ জানালেও ভুট্টো এটিকে করাচি লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন।

[ভুট্টোকে লেখা এন.এম.-এর চিঠি, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১]

পরদিন ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইয়াহিয়ার প্রতি এখন তিনি পুরোপুরি আস্থাশীল। ভুট্টোর প্রত্যাশা তার নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট পদেই বহাল থাকবেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়োবৃদ্ধ নূরুল আমিন ক্ষমতাচ্যুত হবেন। কেননা ইয়াহিয়া ও ভুট্টো দু জনেই জানেন যে, বহির্বিশ্বে তার বাঙালি পরিচয়ের জাহির করার উদ্দেশ্যেই নূরুল আমিনকে এ পদে বসানো হয়েছে। ইয়াহিয়া নিজে অবশ্য এখনো উপলব্ধি করতে পারে নি যে তার উচ্চাভিলাষী নতুন মিত্র অবিলম্বে তাকেও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করবেন।

এর কিছুদিন পর ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়াকে লেখেন, 'আমি মনে করি না এ বিষয়ে বৈঠক বা আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে। ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত 'সংবিধান' সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে ভুট্টো এর জবাব দেন। এ বিষয়ে ভুট্টো তাকে আরো জানান,

'যে-কোনো সংবিধান তৈরি হতে হবে বাস্তবতার নিরিখে। এবং এর অর্থ হচ্ছে সংসদীয় ফেডারেল ব্যবস্থা অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী। এর প্রধান কারণ পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এক দশক ধরে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির একনায়কত্ব বহাল থাকা। যে-কোনো সংসদীয় ব্যবস্থায় মুখ্য নির্বাহী প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রি। এখন আপনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বাড়তি ক্ষমতাসহ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে সংবিধানসম্মত করতে আগ্রহী। এটি জরুরি ক্ষমতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক আইনের চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী।'

নির্বোধ ইয়াহিয়ার ভাবনা ছিলো, যে ভুট্টোর সঙ্গে তিনি শিকার করেছেন এবং মদের আসর জমিয়েছেন তার সঙ্গে কাজ করা যাবে না কেন? ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খানকে লেখা চিঠিতে ভুট্টো আরো জানান, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও আদর্শ রক্ষা এবং মৌলিক অধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টকে ভারসাম্যহীন এবং উস্কানিমূলক অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ যারা দিয়েছেন তারা ঠিক করেন নি। আপনাকে ভুল পরামর্শ দিয়েছেন। এ নীতি প্রতিটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সমগ্র জাতিকে এক গভীর সন্দেহের মধ্যে ফেলবে। তাদের দেশপ্রেমের উদ্দীপনা মিইয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই একজন ব্যক্তির হাতে সমগ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মাতৃভূমির সবার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দাবি করবে।' ...

আমরা একজন 'জীর্ণ' প্রেসিডেন্ট চাই না। আমরা চাই একজন কার্যকর প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তা এ পরিকল্পনা মাফিক নয়। এটি কার্যত একনায়কে পরিণত করবে। গণতন্ত্রের নিজস্ব একটি নিয়ম আছে। একবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আপনা থেকেই দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে সক্ষম। ... কিন্তু এ পরিকল্পনা কোনো কাজে আসবে না। সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে আমি আপনাকে এ ব্যবস্থা স্থগিত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি—বড়ো ধরনের সঙ্কট এড়ানোর জন্যই তা প্রয়োজন ...। এ ছাড়াও ভুট্টো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন 'গভর্নর নিযুক্ত হতে হবে সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রির সুপারিশক্রমে।' প্রেসিডেন্ট, আপনি বলেছেন গভর্নর নিয়োগের বিষয়টি একান্তই আপনার আওতাধীন এবং এ পদে আপনি পার্টি বহির্ভূত লোককেই বেছে নিতে চান। আমি আপনাকে শুধু বলতে চাই, কেউই দলের ঊর্ধ্বে নয় ... মানুষ মাত্রেই রাজনৈতিক জীব।'

জেনারেল ইয়াহিয়ার আশা ছিলো নতুন সংবিধানের আওতায় অন্তত দুটি সংসদের মেয়াদে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকবেন। কিন্তু ভুট্টো এর বিরোধিতা করে বলেন, 'পাকিস্তানের জনগণের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।' তবে তিনি প্রথম একটি মেয়াদে ইয়াহিয়ার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে সম্মত ছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কিন্তু এখন ভুট্টো, তার মত পাল্টেছেন এবং প্রথম একটি মেয়াদের প্রস্তাবও 'আমার কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ' বলে জানিয়ে দেন।

এক সপ্তাহ পর ২ ডিসেম্বর ভুট্টো জেনারেল পীরজাদাকে লেখা এক চিঠিতে বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি 'পরিস্থিতি' নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আমাকে নতুন বহু সমস্যা সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলেছে। তারা আরো বলেছে, জনগণ সরকারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তারা বিদেশি শক্তির উপরই বেশি নির্ভরশীল। জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করার কোনো উপায় তাদের নেই। আজকের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, যুদ্ধ চলছে ... ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মারাত্মক ভুলের কারণে এ ধারণা জন্মেছে যে, ভারত আমাদেরকে পূর্বপাকিস্তান থেকে লাথি মেরে বের করে দিচ্ছে। আমরা বিদেশী শক্তির কাছে নতজানু হয়ে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।'

এর পরদিন ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। এবারে নূরুল আমিনের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে তিনি রাজি হন। ভুট্টো জানান, 'যদি পাকিস্তান পিপলস পার্টি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে তা হবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাদের বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার।'

ভুট্টো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বসহ উপ-প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত হলেন। মোট ১৩ সদস্যের মন্ত্রিসভার সাতজন পূর্বপাকিস্তান থেকে ও ছয়জন পশ্চিমপাকিস্তান থেকে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ছয়জনের মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টি থেকে পাঁচজন ও প্রতিদ্বন্দ্বী জামা'আতে ইসলাম থেকে একজন। পি.পি.পি. জামা'আতকে বরাবর চরম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করতো। জামা'আতের চোখে পি.পি.পি. ইসলামবিরোধী। পি.পি.পি. মন্ত্রিরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংস্থাপন, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।

ভুট্টোর ভাষায় 'পাকিস্তান আজ সর্বাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন। যদিও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এখনো বসে নি এবং সময়সূচি অনুযায়ী আগামি ২৭ ডিসেম্বরের আগে বসার সম্ভাবনাও নেই। ন্যূনতম শর্ত পূরণ হলে আমরা কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে পারি। সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আর চলতে দেওয়া যায় না।'

ভুট্টো পুনরায় সামরিক সরকারে ফিরে এলেন—পাঁচ বছর আগে তিনি যে পদ ছেড়ে এসেছিলেন। দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এখন সামরিক প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান উভয়েরই পতন আসন্ন।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি বোমারু বিমান অমৃতসর, আগ্রা, শ্রীনগর বিমানবন্দর এবং আরো অর্ধডজন ভারতীয় ছোট শহরে আক্রমণ শুরু করে। একই সঙ্গে তারা সিন্ধুতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে রাজস্থানে ঢুকে পড়ে। এতো দিন ভুট্টো ইয়াহিয়ার ওপর 'সর্বাত্মক যুদ্ধের' জন্য যে চাপ দিয়ে আসছিলেন তা শুরু হয়ে গেছে এবং ভুট্টোও ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। ১৯৬৫ সালে তিনি যেভাবে জেনারেল আইয়ুবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এখন ইয়াহিয়া খানকে সেভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন।

এফ-৮৬ স্যাবর জেট ও মিরেজ কয়েকটি রানওয়ে ও হ্যাংগারকে অকেজো করে দিতে পারলেও তারা মাত্র কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পেরেছে। তারা ভারতীয় বিমানবাহিনীকে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী দ্রুত পাল্টা অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ফ্রন্টে পাকিস্তানি আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। ফলে সহজেই পাকিস্তানি বাহিনীর নৈতিক মনোবল ভেঙে যায়। পূর্বাংশে ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যশোর দখল করে নেয়। সোভিয়েত অস্ত্র সামরিক যানসমেত তারা ঢাকা অভিমুখে অগ্রাভিযান চালায়।

৮ ডিসেম্বর ভুট্টো নিউ ইয়র্ক যান। প্রত্যাশা, কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করবেন। করাচি বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানাতে আসা উৎফুল্ল জনতাকে আশ্বস্ত করে ভুট্টো ঘোষণা দেন, 'আমরা ক্ষান্ত হবো না। পাকিস্তানের পবিত্র মাটি থেকে ভারতীয় আগ্রাসন নির্মূল না করা পর্যন্ত হাজার বছর ধরে লড়ে যাবো।' কিন্তু ১১ ডিসেম্বর ওয়াল্ডফ্ টাওয়ারে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশের স্যুটে পররাষ্ট্রমন্ত্রি হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশ্রামেই ছিলেন। কিসিঞ্জার এ সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—

'আট হাজার মাইল দূরে আমার অতিথির দেশের ভবিষ্যৎ যে সুতোয় ঝুলছে চীনা ওয়াল পেপার ও নিপুণ পরিবেশেকরা তা প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। মার্জিত, বাকপটু ও চতুর ভুট্টোই হচ্ছেন পাকিস্তানের শেষ প্রতিনিধি যিনি জনমত গঠনে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন। আমি তার ভেতরে মেধাবী, সম্মোহনী শক্তি লক্ষ্য করেছি। তিনি নির্বোধের আনন্দ নিয়ে খুশি থাকেন না।'

হেনরি কিসিঞ্জার ভুট্টোকে পরামর্শ দিয়ে বলেন,

'বক্তৃতাবাজি করে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই না। আমরা চাই তোমার অবস্থান অটুট থাকুক।

নীতিগতভাবে আরো অনেক ভালো কথা বলা যায়। কিন্তু চূড়ান্তভাবে তোমার অস্তিত্ব আমাদের রক্ষা করতে হবে। ... আগামি ৪৮ ঘণ্টাই হবে চূড়ান্ত। এই সময়টা আমাদের ইতিহাস ঘেঁটে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

ভুট্টো ছিলেন সুস্থির এবং মনোযোগী। ঘটনাবলি সম্পর্কে আমার মতো তিনিও অবহিত। তিনি কল্পনার জগতে বাস করা মানুষ নন এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়া দেশকে রক্ষার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার জন্য প্রস্তুত আছেন—তা যতো বেদনাবহই হোক না কেন?'

পরদিন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দিতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রি জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'সময় বয়ে যাচ্ছে।' ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রি শরণ সিং সবেমাত্র তার ভাষণ শেষ করেছেন। ভুট্টো তার বক্তৃতার শুরুতে ঘোষণা করেন,

'আমি বক্তৃতা বাড়াবো না কিংবা বিরোধের আনুপূর্বিক ইতিহাসও বিবৃত করবো না। কেননা ঘটনা তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। এখনই আমাদের কিছু করতে হবে ... হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে তা করতে হবে। আমরা নিজেদের বিশুদ্ধ বলে দাবি করছি না। আমরাও ভুল করেছি। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সবাই ভুল করেছে। পৃথিবীর সকল রাজা ও রাষ্ট্র, রোমান সম্রাট থেকে ব্রিটিশ রাজন্য। কিন্তু এই ভুলের জন্য কোনো রাষ্ট্র শাস্তি পেতে পারে না। সভ্য রীতিনীতিতে আমরা এই ভুলগুলো শুধরে নিতে প্রস্তুত আছি, সহযোগিতা ও সমঝোতার আলোকে।'

নিরাপত্তা পরিষদে ভুট্টো দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি পাকিস্তানের ইতিহাস ও ভারতের সঙ্গে বিরোধের বিবরণও তুলে ধরেন। ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তান একটি আদর্শ। শারীরিকভাবে এটি ধ্বংস হয়ে গেলেও পাকিস্তান বেঁচে থাকবে। আমরা শারীরিক ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত আছি। এরপর আমরা নতুন থেকে শুরু করবো এবং একটি নতুন পাকিস্তান গড়ে তুলবো।' এ ভাষণে তিনি আরো বলেন, 'আমরা অত্যন্ত গরিব। দুঃখ-দুর্দশার শেষ নেই। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আমাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত হামলা ও নিধনযজ্ঞে নিয়োজিত। এটি ঘটতে দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ভারত ১২ কোটি মানুষের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র শানাবে। এ বীর জনগণই স্বাধীনতার জন্য, তাদের মর্যাদার জন্য লড়াই করেছে। অতএব আমি ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিই।'

পরাজিত পাকিস্তান এবং জয়বাংলা

ভুট্টো যখন নিউ ইয়র্কে ভারতের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নতুন সামরিক কমান্ডার জেনারেল এ.এ. খান নিয়াজি ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল্ হোটেলে বসে জয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন।

বিদেশি সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা আক্রমণ করলে পাকিস্তান বাহিনী কী করবে?'

এ প্রশ্নের জবাবে নিয়াজি বললেন,

'আপনারা আমাদের 'গোপন' শক্তি সম্পর্কে অবহিত নন। আমি আপনাদের বলছি দ্রুত পরিস্থিতি বদলে যাবে। আগামিকাল কিংবা তারপর দিনের মধ্যে। ... শহর রক্ষার জন্য আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে কি না সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। যদি আপনি ঢাকায় থাকেন দেখবেন, আমাদের সৈনিকরা বীরের মতো মারা যাচ্ছে ... আমরা জানি, আমরা কীসের জন্য জীবন দিচ্ছি। শত্রুরা কী করছে। মনে রাখবেন একজন মুসলিম সেনা ১০ জন হিন্দু সেনার সমান। আমরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করবো। জনাব, ঢাকায় বড়ো রকমের লড়াই শুরু হয়ে গেছে প্রায়।'

অন্যদিকে ভুট্টো নিউ ইয়র্কে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন,

'ভারত সরকারের মুখেই কেবল বাংলাদেশের অস্তিত্ব আছে। বাংলাদেশ তাদের মনে। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না। আমাদের জনগণ সাহসী। আমরা এবং ভারত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের অংশীদার। ... বিশ্বাস করুন, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নিতে পারে, ডেনমার্ক জার্মানি দখল করে নিতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায় ভারত পাকিস্তানকে দখল করে নিতে পারবে না। মনে রাখবেন, আমরা লড়বো, আমরা হাজার বছর ধরে লড়ে যাবো। অতীতেও আমরা হাজার বছর ধরে লড়াই করেছি—আমরা এ লড়াই অব্যাহত রাখবো।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সপ্তম নৌবহরে পরমাণু অস্ত্রসহ জঙ্গী বিমানবাহী রণতরীকে বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার সে রণতরী যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয় নি। একটি সত্য কথা হলো পাঠানো হয়েছিলো ঢাকার পতনের পর আমেরিকান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে আরো অভিযোগ করেন,

'আজ আমরা ভারত একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। ভারত একটি বড়ো দেশ। কিন্তু সে আরেকটি বৃহৎ শক্তি কাঁধে ভর করছে—যাতে তাকে আরো বড়ো দেখা যায়। যদি তাই না হতো, তাহলে যুদ্ধবিরতি, উস্কানির অবসান এবং সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে সাধারণ পরিষদ তথা সমগ্র বিশ্ব যে প্রস্তাব নিয়েছে ভারত তা অগ্রাহ্য করতে পারতো না। ... আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে ভারতকে সমর্থন করছে ... অন্যথায় বঙ্গোপসাগর অবরোধের শিকার হতো না।'

হেনরি কিসিঞ্জার ভুট্টোকে নিশ্চয়তা দেন যে, ভারত-সোভিয়েত সম্ভাব্য হামলা থেকে পশ্চিমপাকিস্তানকে রক্ষায় যা কিছু করার হোয়াইট হাউজ করবে। কিন্তু জাতিসংঘে উপস্থিত সকল কূটনীতিকের কাছে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের ওপর ইসলামাবাদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের সময় ফুরিয়ে এসেছে। জেনারেল নিয়াজি ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণের ইচ্ছে ব্যক্ত করে ভারতের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। ভারতের বৃহৎ স্থল ও বিমানবাহিনী যখন ভারী অস্ত্র ও বোমারু বিমান নিয়ে ঢাকায় উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে তখন ক্ষুদ্র পাকিস্তানি বাহিনী তাকে মোকাবিলা হবে আরো বেদনাদায়ক।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রি শরণ সিংয়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ভুট্টো বলেন,

'১০ বছরের জন্য পূর্বপাকিস্তানকে আপনারা নিয়ে নিন, আমরা আবার তা ফিরিয়ে নেবো। বিশ্বাস করুন পররাষ্ট্রমন্ত্রি ... আদিকাল থেকে এটিই ইতিহাসের শিক্ষা। জনগণ যার মালিক তা জনগণের হাতেই যাবে...আপনি জানেন, পূর্বপাকিস্তান পাকিস্তানের অংশ।'

তখনো বাংলাদেশকে একাত্তর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ভুট্টো এবং স্বাভাবিকভাবে সে স্বপ্ন চিরতরে ভেঙে যায়।

ভুট্টো এরপর শুরু করেন, 'আজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রি বলেছেন, 'তথাকথিত' বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিনিধি এখানে প্রতিনিধিত্ব করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ বাংলাদেশ সরকার ভারতের সৃষ্টি। আপনি কি কোনো বৃহৎ দেশের প্রাদেশিক দলগুলোকে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি দেবেন? কখনো শিখরা নিরাপত্তা পরিষদে আসবে, কখনো পাঞ্জাবিরা ... আমরা ভারত থেকেও কিছু লোক নিয়ে আসতে পারি...। শুনুন সরদার সিং, সোনার বাংলার মালিক ভারত নয়, আমরা। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করবো। শেষ মানুষটি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়ে যাবো।'

এদিকে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসী তাদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে। মুহুর্মুহু *'জয় বাংলা'* স্লোগান দেয়। তাদের চোখে মুখে বেদনা মেশানো ও উল্লাসের ছাপ। জীর্ণ কুটির, গাছের ডাল, সোভিয়েত রাইফেল, ভারতীয় ট্যাংকের এন্টেনা সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা। লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গান। এরাই স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ নয় মাস সন্ত্রাস ও নির্যাতনকে নীরবে সহ্য করেছেন।

পরদিন নিউ ইয়র্কে ভুট্টো কি সাহসিকতার সঙ্গে ঢাকাকে রক্ষা করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানি বাহিনী কীভাবে (হাস্যকর) লড়াই করছে তার বিশদ বিবরণ দেন। কিন্তু বাংলাদেশের দু সপ্তাহের লড়াই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ভুট্টো নিউ ইয়র্কে যখন জেহাদী হুমকি দেন এবং অঙ্গীকার ঘোষণা করেন তার দু-এক দিনের মধ্যেই টাইগার নিয়াজি জেনারেল অরোরার কাছে তার মুক্তো খচিত রিভলভার সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এবং তিনি আপত্তিসহ বাংলাদেশ বিজয়ী এ শিখ বীরের কাছে নির্লজ্জভাবে মস্তক অবনত করেন।

১৫ ডিসেম্বর ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে তৃতীয় এবং শেষবারের ভাষণে বলেন,

'ঢাকার পতন হলে কি আসে যায়? সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের পতন হলে কি আসে যায়? অথবা সমগ্র পাকিস্তানে পতন হলে? ... আমরা নতুন পাকিস্তান গড়ে তুলবো। আমরা এর চেয়ে ভালো পাকিস্তান বানাবো। জনাব সভাপতি, আপনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রিকে 'সম্মানিত' বলে অভিহিত করেছেন। যখন তার হাত রক্তে ভরা এবং হৃদয় বিষে আকর্ণ তখন তিনি কীভাবে সম্মানিত হন? অন্যদিকে আমি তার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি ... আমি পশ্চিমপাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত নেতা হিসেবে এখানে কথা বলছি। পূর্বপাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিজয়ের

চেয়ে পশ্চিমপাকিস্তানে আমার বিজয় ছিলো অধিকতর আকর্ষণীয়। ... কিন্তু তিনি সে মর্যাদা রাখেন নি।.. আমি বলতে চাই Cato *রোমানদের যা বলেছিলেন-কার্থেজ নগরীকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। যদি ভারত চিন্তা করে থাকে পূর্বপাকিস্তানের মতো পশ্চিমপাকিস্তানকেও ধ্বংস করে ফেলবে—কেননা আমরা অভিন্ন জনগণ, অভিন্ন রাষ্ট্র। এরপর আমরাও বলবো কার্থেজকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।'*

১৮ বছর বয়স্কা বেনজির ভুট্টো সে সময়ে কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। সেখান থেকে এসে বাবার সঙ্গে যোগ দেন। ভুট্টো যখন নিরাপত্তা পরিষদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন বেনজির ছিলেন তার পেছনের সারিতেই বসা। ভুট্টো তার স্বভাবসুলভ ভাষায় ফের শুরু করেন :

'আমরা হাজার বছর ধরে লড়বো ... ভারত আজ তার সামরিক সাফল্যে উন্মত্ত। ..সুতরাং আপনি দেখবেন...এ হচ্ছে পথের শুরু...আজ পাকিস্তান আমরা আজ আপনার গিনিপিগ। কিন্তু অন্যরাও গিনিপিগ হবে।....আপনারা চান, আমরা পদলেহন করি। আমরা পদলেহন করতে যাচ্ছি না...। আমি ইঁদুর নই। আমি আমার জীবনে কখনো নতি স্বীকার করি নি। আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো, তবু সাহসের সঙ্গে তা মোকাবিলা করেছি। আমি সব সময়ে লড়াই করে এসেছি। আজ আমি নতি স্বীকার করবো না। কিন্তু আমি আপনার নিরাপত্তা পরিষদ ত্যাগ করছি। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা আমি নিজেকে অপমানিত বোধ করছি, আমার দেশের জন্য অপমানিত বোধ করছি। আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে...আমি এর শরিক হতে পারি না; আমরা ফিরে যাবো এবং লড়াই করবো। আমার দেশ আমাকে চায়। আপনি আপনার নিরাপত্তা পরিষদ নিতে পারেন।'

একথা বলে ভুট্টো চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবের কপি ছিঁড়ে ফেলেন। টেবিলে সংরক্ষিত অন্যান্য কাগজ মেঝেতে ছুঁড়ে মারেন।

ভুট্টো দ্রুত পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। বেনজির ভুট্টো এবং পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাকে অনুসরণ করেন। সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বেনজির তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

'পাকিস্তানের বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় আমার বাবা ভীষণ ভেঙে পড়েন। আমরা হাঁটতে থাকি, হাঁটতে থাকি এবং সেই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করি।' ভুট্টো মন্তব্য ছিলো, 'এখন পাকিস্তানকে ভারতের কাছে লজ্জায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। এর চেয়ে চরম মূল্য আর কি হতে পারে?'

জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টার সময় আত্মসমর্পণ করেন। ঐদিন বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে তিনি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাকে রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করে নেন। এটি ছিলো পাকিস্তানের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক পরাজয়। এমন কি ভুট্টোর জেহাদি অঙ্গীকারের প্রতি পশ্চিমপাকিস্তানের লাখ লাখ মানুষ আস্থা ব্যক্ত করেছে, উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং দেশের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনাও করেছে। তারা ভুট্টোর মিথ্যা সাহসকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।

ঢাকার প্রবেশ পথে রাস্তা ও ডোবা-নালায় তখন মৃত সেনাদের লাশ পড়ে আছে। গ্যাবিন ইয়ং নামে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক যিনি ঢাকার ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম

হন, ১৯ ডিসেম্বর লন্ডনের অবজারভার পত্রিকায় তিনি আরো লিখেছেন, 'ভারতীয় সেনাদের অগ্রবর্তী পাহারায় প্রথম ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল নাগরা জানান, হতাহতের সংখ্যা ভয়াবহ। অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, তিনি ইতোমধ্যে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কি না? জবাবে জেনারেল নাগরা বলেন, ও হ্যাঁ। তিনি আমাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। কলেজে আমরা একে অপরকে চিনতাম।'

গ্যাবিন ইয়ং তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন How Dhaka Inside Story-তে আরো লিখেছেন,

'যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন সকালে দুই সামরিক কর্মকর্তা একে অপরের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন। তারা একই সামরিক স্টাফ কলেজের ছাত্র ছিলেন। এখন একে অপরকে অভিযুক্ত করেছেন। বাস, ট্রাক ও জিপে করে ভারতীয় সেনারা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বাঙালিরা তাদের মালা দিয়ে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানাচ্ছে। চিৎকার দিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছে। নিয়াজি আমাকে (গ্যাবিন ইয়ং) জানান, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি—অন্যথায় দুই বাহিনীর লড়াইয়ে নগরী ধ্বংস হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত আমাদের আত্মসমর্পণ করতেই হতো। অতএব যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? তার ঠোঁটে ম্লান হাসি ... তিনি কোনো মেধাবী লোক নন, কিন্তু নিষ্ঠাবান। তার কোনো রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা নেই। যুদ্ধ এক সপ্তাহ আগেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিয়াজিকে বুঝিয়েছেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে।

১৭ ডিসেম্বর ভুট্টো নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডার বিসক্যানে যান নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে মার্কিন নেতাদের কাছ থেকে তিনি সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের নিশ্চয়তা আদায় করেন। ১৮ ডিসেম্বর বিকেলে ভুট্টো দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন—যে দেশ খণ্ডিত, বিপর্যস্ত এবং তার নেতৃত্বের অপেক্ষায়।

এদিকে পিপলস পার্টি করাচি থেকে ইসলামাবাদ পর্যন্ত অসংখ্য জনসভার আয়োজন করে। এসব জনসভায় উপস্থিত ক্ষুব্ধ সমর্থকদের কণ্ঠে স্লোগান উচ্চারিত হয় 'ইয়াহিয়ার ফাঁসি চাই, ভুট্টো জিন্দাবাদ।' ২০ ডিসেম্বর ভুট্টো খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন। যুদ্ধের পর ইতিহাস বুঝি এভাবে নতুন রূপে যাত্রা শুরু করে।

আরো পেছনের কথা :

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

৯ নভেম্বর ১৯৫৫। করাচিতে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র পরিষদের অধিবেশন। পূর্ববাংলার অন্য সদস্যদের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন। কিন্তু আজ তিনি পরিষদ কক্ষে দাঁড়িয়ে ডেপুটি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, *আমি আজ বাংলায় বলব। ডেপুটি স্পিকার আমার বক্তৃতা বুঝতে পারবেন না এজন্য আমি দুঃখিত। তা সত্ত্বেও আমি বাংলায় বলতে চাই।'*

পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার কারণ দুটো। পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যরা ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু পূর্ববাংলার

সদস্যরা বাংলায় বক্তৃতা দিলেই তারা 'বুঝতে পারি না' বলে আপত্তি করতেন। দ্বিতীয়ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও পরিষদের কার্যবিবরণী বাংলায় রেকর্ড করার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। রেকর্ড হতো ইংরেজি এবং উর্দুতে। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলায় বক্তৃতা করেন।

ঐদিনের বিষয় ছিলো নবগঠিত ইউনিট পশ্চিমপাকিস্তানে ফেডারেল রাজধানী করাচি অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া নিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ পশ্চিমপাকিস্তানের সঙ্গে করাচিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। তাদের যুক্তি হলো, করাচি সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী অতএব সেই রাজধানী কোনো একটি প্রদেশের অধীনে থাকতে পারে না। করাচি হবে কেন্দ্রের শাসনাধীন অঞ্চল। যার প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তান উভয়ের সমান অধিকার থাকবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর বক্তৃতায় আরো যুক্তি দেখান যে, ক্ষমতাশীন মুসলিম লীগের বন্ধুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যদি করাচিকে পশ্চিমপাকিস্তানের অংশ করে নেন, করাচি থেকে নির্বাচিত সদস্যরা যদি পশ্চিমপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হন তাহলে করাচি আর কেন্দ্রীয় রাজধানী থাকবে না। অথচ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্সহ অনেক নেতাই একে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিলো শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন 'যুক্তফ্রন্ট ভূক্ত (আওয়ামীলীগ ব্যতীত) সদস্যদের প্রতি। তিনি বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট নেতারা কিছু দিন আগে বিভিন্ন জনসভায় বলে বেড়িয়েছেন যে, করাচি ফেডারেল রাজধানী হিসেবেই থাকবে। পশ্চিমপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখন এ সংশোধনীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তারা পূর্ববাংলায় গিয়ে জনগণকে কীভাবে মুখ দেখাবেন।'

বাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতার প্রতিবাদ জানান পশ্চিমপাকিস্তানের বহু সদস্য। সিন্ধু থেকে নির্বাচিত সদস্য পীর আলী মোহাম্মদ রাশদি দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি যদি সিন্ধিতে বলতে চাই তাহলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে কি না?'

সঙ্গে সঙ্গে আতাউর রহমান খান দাঁড়িয়ে বলেন, 'হ্যা দেওয়া হবে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'আপনি চাইলে তা দিতে পারেন।'

এর একুশ দিন বিরতির পর ২৯ নভেম্বর পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদস্যদের অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তারও পেছনে কারণ ছিলো। আওয়ামীলীগ সমর্থিত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সরদার ফজলুল করিম অধিবেশনে যোগ দিতে করাচি আসার পথে পুলিশ তাকে বিমান থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে করাচিতে সরকারি বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় সিলেটের মাহমুদ আলীকে (পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন।)

অধিবেশন শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রথমেই পরিষদ সদস্যদের অধিকারের প্রশ্ন তুলে বলেন, 'সম্প্রতি জননিরাপত্তা আইনে আমাদের দু জন সদস্যকে গ্রেফতার করা

হয়েছে। এদের মধ্যে সরদার ফজলুল করিম গ্রেফতার হয়েছেন অধিবেশনে যোগদানের জন্য, করাচিতে আসার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে। অন্যদিকে মাহমুদ আলী গ্রেফতার হয়েছেন করাচিতে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত বাসভবন সামার সেট হাউজ থেকে।'

স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, 'এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা যখন এখানে দেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য বসছি তখন আমাদের দু জন সহযোগীকে জেলখানায় আটক রাখা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আইনমন্ত্রি থাকাকালেও একবার সদস্যদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিলো। তখন বলা হয়েছিলো যে, ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্যরা যে সুযোগ-সুবিধা পান শাসনতন্ত্র পরিষদের সদস্যরা ও অনুরূপ সুবিধা পাবেন। সে ক্ষেত্রে অধিবেশন চলাকালীন সময় কোনো সদস্যকে গ্রেফতারের আগে স্পিকারের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া হয় নি। সরকারের এ দমননীতি আমরা সহ্য করবো না। আজ ঘটনাক্রমে আপনি বিরোধী দলে থাকলে আপনাকেও গ্রেফতার করতে পারতো। সে কারণেই এ ধরনের রাজনৈতিক নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পুনরায় অধিবেশনের কার্যবিবরণীর প্রশ্নটি তোলেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপ :

'The members Shall address the Assembly in Urdu, Bengali or Euglish, provided that the chairman may permit any member, Who cannot adequately express himself in any of these languages, to address the Assembly in his mother tougue.

If member desires that an English translation of Summery of his speceh delivered in a language othe than Urdu, Bengale should be read to the Assembly, he shall supply a copy to the Assembly. Such translation, it head to the Assembly, shall be include in the record of the procedings of the Assembly.

2. The official record of the procedings of the Assembly shall be kept in Urdu, Bengali and English.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দাবি ছিলো ইংরেজি উর্দু ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর তিন ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে দিনের কার্যসূচি ইংরেজি ও উর্দুতে প্রচারিত হতে পারলে বাংলায় পারবে না কেন? কেননা দিনের কার্যসূচিও পরিষদের কার্যবিবরণীর অংশ।

২১ জানুয়ারির অধিবেশনে প্রস্তাবিত সংবিধান, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আলোচনা হয়। এ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় *ইসলামি প্রজাতন্ত্র* ঘোষণার কঠোর সমালোচনা করেন। খসড়া সংবিধানে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান কমিটি লেখা আছে। এর বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'মুসলিমলীগ ও যুক্তফ্রন্টের বন্ধুদের কাছে

জানতে চাই আপনারা যে পরিষদে ইসলামি সংবিধান প্রণয়ন কবতে যাচ্ছেন একজন অমুসলিম সেই পরিষদ সভাপতিত্ব করতে পারতেন কিনা! আপনারা পাকিস্তানি মুসলমানদের জন্য ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন। কিন্তু ভারতে, ইরাকে, ইন্দোনেশিয়ায় যে মুসলমানরা আছেন তাদের জন্যও কি এ সংবিধান প্রযোজ্য হবে? পাকিস্তান সরকার বিদেশের জন্য তার নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট দিয়ে থাকেন। সেই পাসপোর্ট কি পাকিস্তানি খৃষ্টান পাকিস্তানি মুসলমান বা পাকিস্তানি হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেওয়া হবে? বর্তমানে দেশে একটি পরিষদ আছে ইসলামি সংবিধান চালু হওয়ার পর কি আলাদা আলাদা পরিষদ হবে? একটি মুসলমানদের জন্য। একটি হিন্দুদের জন্য একটি খৃষ্টান বা বৌদ্ধদের জন্য?'

মুসলিমলীগের বন্ধুরা ইসলামের নামে সব কিছু চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ইসলাম তো ন্যায় বিচার ও সমতায় বিশ্বাসী। প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে দিতে হবে। যুক্তফ্রন্টের বন্ধুরা বলছেন তা সম্ভব নয়। তাহলে কি ইসলামের নামে জনগণকে ধোঁকা দিতে চাইছেন? ইসলাম ও রাসুলের নামে তারা গত ৭-৮ বছর ধরে জনগণকে শোষণ করেছেন। সংবিধানে ইসলামের মোড়ক লাগানো হয়েছে মাত্র, আদর্শকে নয়। প্রস্তাবিত সংবিধানে সরকার কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করার বিধান রাখা হয়েছে। এবং সেটি করা হয়েছে জনশৃঙ্খলা ও পাকিস্তানের স্বার্থের নাম করে। এ ধরনের বিধি-বিধান কোনো গণতান্ত্রিক দেশে চলতে পারে না। ইসলামে আছে কোনো ব্যক্তি বিচারের আগে বেহেশতে বা দোজখে যাবে না। কিন্তু ইসলামিক সংবিধানে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা আইনে পরিষদ সদস্য বালুচ নেতা আবদুস সামাদকে, সদস্য খন্দকার আজিজুর রহমান, আবদুল মান্নান প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবদুস সামাদ এক ইউনিট প্রথার বিরোধিতা করেছেন বলে তাকে পাকিস্তান বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি দলের বন্ধুরা ইসলামের নামে সংবিধান প্রণয়ন করছেন। কিন্তু তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই ইসলাম কোথায় সামন্তবাদ জমিদারি জায়গিরদারি তথা ১০ লাখ ১৫ লাখ একর জমির মালিকানার কথা আছে। পাকিস্তানে একজন সাধারণ কর্মির মাসিক বেতন ৪৫ টাকা অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের বেতন ধার্য হয়েছে ১২ হাজার টাকা। এ বৈষম্য কেন? এ সংবিধান প্রণীত হয়েছে সামন্ত প্রভুদের রক্ষা করার জন্য। আমি যখন এসব প্রশ্ন তুলছি তখন আমাকে কমিউনিষ্ট বলে গাল দেন।'

বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'আমি পূর্ববাংলার প্রকৃত অবস্থা এখানে তুলে ধরছি। সেখানে এবং পশ্চিমপাকিস্তানে আমার বন্ধুরা শরণার্থীরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের শিকার হচ্ছে। কিন্তু হিন্দু ও শিখদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি দখল করেছে ওপার থেকে আসা মুসলমান ভূ-স্বামীরা শরণার্থীরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসবাস করছে। তাদের কোনো আশ্রয় নেই, জমি নেই অর্থ নেই। এ সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি করা হবে। এ ধরনের অসার কথার কোনো মূল্য নেই। তারা সেটি কতো দিনে পারবেন নির্দিষ্ট করে বলুন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সংবিধানে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়েছে। আর

পাকিস্তানে সরকার ইচ্ছে করলে হাইকোর্টের যে কোনো বিচারককে ঢাকা থেকে লাহোর বা লাহোর থেকে ঢাকায় বদলি করে দিতে পারেন। এখন আমি ইসলামি ভাষা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোন্‌টি ইসলামি ভাষা? আরবি, উর্দু, ফারসি বা বাংলা? মুসলমানদের ভাষা কী? কে বিচার করবেন? আমার বন্ধুরা বলবেন উর্দু। আমি বলবো বাংলা। পারস্যবাসী বলবেন ফারসি। তুর্কীরা বলবেন তার্কিশ। অন্যরা বলবেন তাদের নিজ নিজ ভাষার কথা বলবেন। সংবিধানে দুটি সরকারি ভাষার কথা বলা হয়েছে। আবার এটাও উল্লেখ আছে যে, প্রাসঙ্গিক ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলে একটি জাতীয় ভাষা তৈরির চেষ্টা করবেন। এ পরিষদের একজন সদস্য যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রিও বলেছেন, জাতীয় ভাষার অর্থ রাষ্ট্রভাষা। এখনো আমাদের একটি রাষ্ট্রভাষার কী দরকার। এর মাধ্যমে আসলে পূর্ববাংলাও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে।

কেননা সরকারি ভাষাই জাতীয় ভাষা নয়। সরকারি ভাষা সরকারি ভাষাই। যদি সেটি না হবে তাহলে অনুচ্ছেদ ৩১-এ একটি জাতীয় ভাষা তৈরির কথা বলা হয় কেন? সংবিধানে দুটি সরকারি ভাষার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে একটি জাতীয় ভাষার কথা। জনগণকে এভাবে ধোকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে জনগোষ্ঠী তাদের ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে তাদের ধোকা দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমপাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বাংলার বিরুদ্ধে নয়। বাংলার বিরুদ্ধে হলো শাসকগোষ্ঠী। আমি এখানে দুটি কথা উল্লেখ করতে চাই। এক পাকিস্তানের পাসপোর্টে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু অক্ষরও রয়েছে। উর্দু থাকলে বাংলা থাকবে না কেন? দুটোই সরকারি ভাষা। অপরটি হলো সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ। সেখানে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় কর্মকর্তা ও জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলা উপেক্ষিত।

আরেকটি কথা। পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত সংবিধানে তার কোনো প্রমাণ আছে কি? এখানে সংসদীয় সরকারের কথা বলা হলেও প্রেসিডেন্টকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, সাধারণ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এখন আমরা আরেকটি প্রেসিডেন্সিয়াল সাম্রাজ্য তৈরি করতে যাচ্ছি। এখানে প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তিনি নিজে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হলেও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্টকে বরখাস্ত করতে পারবেন। তিনি মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করতে পারবেন। তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে তিনি সংবিধান স্থগিত রাখতে পারবেন। তিনি প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রি নিয়োগ করবেন। মন্ত্রিসভা তার পরামর্শ মতো কাজ করবে। মন্ত্রিসভার পরামর্শ মতো কাজ করবেন না। গণতান্ত্রিক সংবিধানে প্রেসিডেন্ট প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু এখানে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রিকে ডিসমিস করে দিতে পারবেন।

এবারে আমি নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে চাই। বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত পৃথিবীর কোনো সংবিধানে ভোটদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় নি। দেশের

কেউ গ্রহনীয় বা কেউ পরিত্যাজ্য হতে পারে না। কিন্তু সংবিধানে পৃথক ভোট পদ্ধতি বহাল রেখে সেই বর্ণবাদী প্রথাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ভোট দিতে পারবে না, নির্বাচিত করতে পারবে না। পূর্ববাংলার মানুষ এ পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ঘোর বিরোধী। আবু হোসেন সরকার এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন নি বলেই তার সরকারের পতন হয়েছে। আমি নিশ্চিত সংবিধানে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালুর পর যুক্তফ্রন্টের নেতারা পূর্ববাংলায় জনগণের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এমন কি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা একে ফজলুল হকও নির্বাচনে পরাজিত হবেন।

কতিপয় মাওলানা ছাড়া পূর্ববাংলার সকল মানুষ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে। যারা আজ যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছে তারাই এখানে এসে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে। অন্যান্য মুসলিম দেশে কী হচ্ছে। ভারতে ৪ কোটি মুসলমান যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, চীনা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকরা এক সঙ্গে ভোট দিচ্ছে। যেখানে সিরিয়ায়, মিশরে, ইরানে তারা যুক্ত নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে। ফতোয়া অনুযায়ী কি তারাও কাফির হয়ে যাবে?

আমরা যে পাসপোর্ট জমা করি তাতে পাকিস্তানি হিসেবেই পরিচয় দেওয়া থাকে। বলা হয় না পাকিস্তানি মুসলমান, পাকিস্তানি হিন্দু বা পাকিস্তানি খ্রিষ্টান। বর্তমানে সংবিধানের যে খসড়া প্রণীত হয়েছে পূর্ববাংলার মানুষ তা কখনো গ্রহণ করবে না। আমি ২১ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও মতামতের বিরুদ্ধে যদি এ সংবিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটি হবে আগুন নিয়ে খেলার শামিল। তার পরিণতি কী হবে আমরা জানি না।'

১৯৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি সংশোধনী আনেন, যার মর্মার্থ হলো : রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী, পুরুষ অথবা জন্মস্থান ভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি কোনো বৈষম্য দেখাতে পারবে না। তিনি ১৪৪ ধারা জারিসহ নাগরিকদের মৌল অধিকার বিরোধী ধারাসমূহও বাতিলের দাবি তোলেন। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলা ও পশ্চিমপাকিস্তানকে প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত না করে রাজ্য বা States হিসের চিহ্নিত করা দাবি জানান। তাঁর পক্ষে যুক্তি ছিলো ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রে এগুলো States হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত।

১৯৫৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শাসনতন্ত্র পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অধিবেশন মূলতবী করার জন্য স্পিকারের কাছে অনুরোধ জানান। এরপর আওয়ামী লীগ দলীয় আরেক সদস্য মুহাম্মদ আবদুল খালেক করাচি ও ঢাকাকে পাকিস্তানের রাজধানী করার প্রস্তাব করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে জাতীয় পরিষদে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র করার বিরোধিতা করে বলেন, 'আজ আমরা যদি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা

করি কাল ভারতের আরএসএসও হিন্দু মহাসভা পন্থীরা তাদের দেশকে 'ভারত হিন্দু প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা দিতে পারে। মাদ্রাজ, বোম্বে, দিল্লি, কলকাতা, বিহারও উত্তর প্রদেশের যে মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন কিন্তু পাকিস্তানে আসেন নি— সেই চার কোটি মুসলমানকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। শাসকগোষ্ঠী তাদের বিপদগ্রস্ত করে কী ফায়দা লুটতে চাইছেন? পাকিস্তানের জনগণ যখনই তাদের মৌলিক দাবি খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়ের দাবি তুলেছে তখনই শাসকগোষ্ঠী কাশ্মির বিপদে আছে বলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। আসলে তারা জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই কাশ্মির ইস্যু তোলেন। আজ তারা বলে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ ইসলামি শাসনতন্ত্রের বিরোধী। কিন্তু সেই শাসকতন্ত্র যদি ইসলামের মর্মবাণী সাম্য ন্যায় বিচার ও সম্পদের সমবণ্টনের ভিত্তিতে হয় আমরা অবশ্যই সমর্থন দেব। কিন্তু এটি হলো শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে, একটি প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র। আমরা একে সমর্থন দিতে পারি না। সরদার আমির খান শাসনতন্ত্রের উপর সংশোধনীতে পাকিস্তানের ভূখণ্ডগুলোকে নিয়ে ফেডারেল প্রজাতন্ত্র করার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের চরিত্র কী হবে তা বলেন নি। কেন আপনারা বলছেন না যে এ দেশের চরিত্র হবে সমাজতান্ত্রিক। কেন বলছেন না দেশের গরীব মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন করে দেবেন। আজ বাসায় যারা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তারাই প্রকৃত মুসলমান। এ ফেব্রুয়ারি মাসেও পূর্ববাংলায় খাদ্য সঙ্কট বিরাজ করছে। সরকার তাদের জন্য কী করছে?

আরেকটি কথা। আপনারা ইসলামি রাষ্ট্র তৈরি করতে চান। সেই রাষ্ট্র কি একজন হিন্দু একজন মুসলমান একজন খৃষ্টানকে ভিন্ন ভিন্ন চোখে দেখবে?' তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র কেন? মনে রাখবেন গরীব হিন্দু-মুসলমানে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন নেই ধনাঢ্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। কলকাতায় দাঙ্গার সময়ে ও ধনী মুসলমানরা ক্ষতিগস্ত হয় নি, সর্বস্ব হারিয়েছে গরীব মানুষেরা। ইসলামের নাম নিয়ে পাকিস্তানি জগণের সঙ্গে হাঙ্কি পাঙ্কি করবেন না।

এখন সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে আসা যাক। পাকিস্তান হওয়ার আগে ১৯৪৬ সালের দিল্লি সম্মেলনে কি আপনারা বলে দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানে হিন্দুরা থাকতে পারবে না। হিন্দুদের পাকিস্তানের বসবাসের পূর্ণ অধিকার আছে, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদর ও আছে। ইসলামের ইতিহাস দেখুন সেখানে সংখ্যালঘুদের সম অধিকার দেওয়া হতো। আর আজ সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে দেওয়া হলো। এভাবে তাদের অধিকার খর্ব করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। তারা এখানে বসবাস করছে। সরকারকে ট্যাক্স-খাজনা দিচ্ছে। অতএব সকল অধিকারও তারা ভোগ করবে। স্যার এখন আমি সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনতে চাই যে, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল নির্বাচন নীতিগতভাবে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে হবে।

ঢাকা ও করাচিতে দুটি পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন করি। কেন না বর্তমানে করাচি পাকিস্তানের রাজধানী। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস করে পূর্ববাংলায়। করাচিতে তাদের আসার কোনো সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, সচিবালয় সবকিছুই এখানে। ফলে দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় অবসান এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই ঢাকা ও করাচিতে দুটি পৃথক রাজধানী করার প্রস্তাব করছি।

১৯৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অনাগ্রহ ও অবহেলার উপর বক্তব রাখেন। পূর্বপাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় নি—এ অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'বহু বছর পার হয়ে গেলেও পূর্বপাকিস্তান একটি বুলেটও তৈরি করতে সক্ষম হয় নি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতেও বাঙালিদের নেওয়া হচ্ছে না। সিলেট সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সাথে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু তাদের পেছনে সেনা বাহিনী ছিলো না। পূর্ববাংলায় নদী ও বনজংগল আছে। বাঙালিরা সাতাঁর কাটতে পারে। এ কারণে সুযোগ পেলে তারা ভালো যোদ্ধা হতে পারবে। একজন বলেছেন যে, তারা লাহোর থেকেই পূর্বপাকিস্তানকে নিরাপত্তা দেবেন। এ ধরনের কথা-বার্তা দুর্ভাগ্যজনক। তারা লাহোর থেকে দিল্লী দখল করতে চান। কিন্তু সে অবস্থায় পূর্ববাংলার কী হবে? পাকিস্তানের যুদ্ধের ভার আমাদের বইতে হবে। পূর্ববাংলার ঘর-বাড়ি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। মা-বোনেরা হত্যাযজ্ঞের শিকার হবেন। দুঃখজনক হলো যে, গত দশ-এগারো বছরেও পূর্বপাকিস্তানে একটি মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। তারা বলছেন পূর্বপাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য সুবিধাজনক স্থান নয়। বাঙালিরা লম্বা ও বলবান নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'আধুনিক যুগে শারীরিক শক্তির উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে না। বাঙালিদের উচ্চতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কিন্তু জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও বার্মার মানুষ কীভাবে শক্তিশালী আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? ব্রিটিশরা বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নেয় নি। তাহলে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। আজ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালিদের একই আচরণ করছে। যদি কখনো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় ভারত পূর্ব ও পশ্চিমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তখন পূর্ববাংলার মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়বে। মনে রাখতে হবে এখান থেকে পূর্ববাংলার নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। আমাদের এক থাকতে হলে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে সমানাধিকার দিতে হবে।'

২১ মার্চ ১৯৫৬ সালে সংবিধান পরিষদের বাজেট অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কলিন ক্লার্কের রিপোর্টে পূর্ববাংলাকে শিল্পায়িত করার সুপারিশ করা হলেও সরকার সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। তারা পশ্চিমপাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, পূর্ববাংলাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।'

৮ বছর ধরেই এ অবস্থা চলছে। কেন তারা এটি করছে জানি না। মুসলিমলীগ সরকার হয়তো ভাবছে পূর্ববাংলার শিল্পায়ন করে কী লাভ? তারা কতোদিন আমাদের সঙ্গে থাকে? বৈদেশিক ঋণ নিয়ে পিআইডিসি ৬১টি শিল্প প্রকল্প শুরু করেছে। তার মধ্যে মাত্র ১৭টি করা হয়েছে পূর্ববাংলায়। উল্লিখিত ১৭টির মধ্যে ৩টির কাজ শুরুই হয় নি। আর পিআইডিসি'র প্রশাসনের কথা যদি বলতে হয় সেখানে পূর্ববাংলা থেকে কোনো প্রতিনিধি নেই। সংস্থার চেয়ারম্যান হয়েছেন পশ্চিমপাকিস্তান থেকে, সকল পরিচালক নেওয়া হয়েছে অবাঙালিদের মধ্য থেকে। সদর দফতরে ৯০ জন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র একজন বাঙালি, ৭০০ নিম্ন পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ৭ জন কেরানি ও ৫ জন পিওন নেওয়া হয়েছে পূর্ববাংলা থেকে। ১৫০ জনের বৃত্তির মধ্যে মাত্র ২ জন বাঙালি পেয়েছেন। যে কোনো পশ্চিমপাকিস্তানি পূর্ববাংলায় চাকরি করলে আঞ্চলিক ভাতা পান কিন্তু পূর্ববাংলার কেউ পশ্চিমপাকিস্তানে চাকুরি করলে সেই ভাতা পান না। বাঙালিদের শতকরা ১০ ভাগ পদও দেওয়া হচ্ছে না। আমরা বাঙালিদের ন্যায় সঙ্গত দাবি দাওয়ার কথা বললেই মুসলিমলীগের বন্ধুরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনেন।

নতুন সংবিধানে শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণের বিষয় কেন্দ্রের হাতে। বিদেশি ঋণ ছাড়া শিল্পগড়ে উঠবে কীভাবে? শিল্পের কাঁচামাল কীভাবে কিনবো? কয়লার কথায় যদি আসি, প্রতি বছর আমরা ৭ কোটি টাকার কয়লা আমদানি করি। কিন্তু একজন বাঙালি ব্যবসায়ীও সেই কয়লা আমদানির অনুমতি পান নি। নিউজপ্রিন্টের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। নিউজপ্রিন্টের সকল আমদানিকারক পাশ্চিমপাকিস্তানের। তারা পশ্চিমপাকিস্তানের প্রয়োজন মিটিয়ে যা থাকে তাই পূর্বপাকিস্তানে পাঠায়। কিন্তু পত্রিকার সংখ্যার দিক দেখলে পূর্বপাকিস্তানেই অধিক নিউজপ্রিন্ট প্রয়োজন। পশ্চিমপাকিস্তানে একটি পত্রিকা বের হয় ৩২ ও ৩৬ পাতা। কিন্তু বাংলায় কোনো পত্রিকা ৪ বা ৬ পাতার বেশি বের হয় না। এ বৈষম্য আর কতো দিন? ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোনো বিষয় বিতর্ক হলে পরদিনই তার লিখিত রূপ পার্লামেন্ট সচিবালয় থেকে সদস্যদের দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টে ৩ থেকে ৪ মাসের আগে পাওয়া যায় না। এভাবেই আমাদের প্রশাসন চলছে।'

অবশেষে পূর্ববাংলার ভাগ্য উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন,

'আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করতে হবে। সে জন্য ভারি শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে বহু মানুষের কাজের সংস্থান হবে। আমাদের ব্যবসায়ীরা ভারতে যান সুতা কিনতে। কেননা সরকার তাদের প্রয়োজনীয় সুতা সরবরাহ করছে না। মুসলিমলীগের বন্ধুরা ক্ষমতার কথা বলেন। সংবিধানে তারা দুই ইউনিটের জন্য ৫০ঃ৫০ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

বঙ্গবন্ধু ও উত্তাল মার্চ

জি.এম. সৈয়দের ভাষ্য

এক.

তারিখটি ছিলো ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

সিন্ধুর প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা জি.এম. সৈয়দ ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন কেবল আওয়ামীলীগ প্রধান নন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরও নেতা। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তথা বাঙালিরা সংখ্যাগিরিষ্ঠতা পাওয়ায় পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিক ও জেনারেলদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তাদের ধারণা ছিলো, কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। বাঙালিরা ৬ দফার পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে সেই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। নির্বাচনের পর পরই পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেন। তিনি একবার বলেন, 'পিপলস পার্টি ছাড়া নতুন সংবিধান রচিত হতে পারে না।' আরেকবার বলেন, 'জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার আগেই সংবিধানের ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসতে হবে।' জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, '৬ দফা এখন জনগণের সম্পত্তি। এর কোনো দফা রদবদল বা সংশোধন করার ক্ষমতা আমার নেই। ভবিষ্যৎ সংবিধান ৬ দফার ভিত্তিতেই রচিত হবে।'

এ প্রেক্ষাপটেই দুই অঞ্চলের দুই জাতীয়তাবাদী নেতার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। জি.এম. সৈয়দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বললেন, 'ভুট্টো সামরিক শাসকদের সঙ্গে চক্রান্ত আঁটছেন। এতো দিন তিনি পাঞ্জাবিদের পুতুল হিসেবে কাজ করেছেন। এখন সামরিক চক্রকে তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন। ওদের আসল উদ্দেশ্য আওয়ামীলীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না দেওয়া।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বললেন, *'জেনারেলদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি সজাগ আছেন। তিনি 'তার জনগণকে একাট্টা রাখতে এবং পাকিস্তানকে স্বাধীন জাতিসমূহের একটি সত্যিকার ইউনিয়নে পরিণত করতে সম্ভাব্য সব কিছু করবেন।'* শেখ সাহেব আরো যোগ করলেন, *'এ মুহূর্তে যদি আমি আমার জনগণকে ছেড়ে যাই তাহলে সেনাবাহিনী নির্বিচারে তাদের হত্যা করবে এবং ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।'*

তাকে সমর্থন জানিয়ে জি.এম. সৈয়দ বললেন, 'যদি আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে তাহলে আমরা এমন একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো যাতে নির্যাতিত সিন্ধি, বালুচ ও পাঠানদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। একটি বহুজাতিক ইউনিয়নের মধ্যে মর্যাদার সঙ্গে তারা বসবাস করতে পারবে।'

এরপরে জি.এম. সৈয়দের মন্তব্য ছিলো বেশ কড়া। সিন্ধু বাংলা থেকে ভিন্ন বলেই সিন্ধিরা তাদের জাতীয়তাবাদী চরিত্র বিসর্জন দিয়ে পাঞ্জাবিদের সেবাদাস ভুট্টোর

সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধলো। শত অত্যাচার নির্যাতনেও বাংলার মানুষ তাদের নেতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ত্যাগ করে নি।

জি.এম. সৈয়দ আরো জানিয়েছেন, 'এ বৈঠকে শেখ সাহেব আমাকে সিন্ধুর বাইরে গিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু হলে তার রেশ গিয়ে পড়বে সিন্ধুতেও। আমি মহানবীর মাজার জেয়ারত ও কা'বায় ওমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব চলে যাই। সেখান থেকে কয়েকটি চিঠিও লিখি। কাবুলে বসবাসরত আবদুল গাফ্ফার খানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। তাকে কয়েকটি চিঠিও লিখি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, সে যোগাযোগ শেষমেষ হয়ে ওঠে নি।' তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, 'এক কোটি লোকের দেশত্যাগ এবং হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি ঠেকাতে পারি নি।'

জি.এম. সৈয়দ জানান, 'কয়েক মাস পর স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসা মাত্র ইয়াহিয়া খানের বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে। আগেই আমার অনুপস্থিতিতে সহকর্মী শেখ আয়াজ, কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ও গোলাম মোহাম্মদ লেঘারি প্রমুখ গ্রেফতার হন। গোটা দেশ পরিণত হয় সন্ত্রাস ও নির্যাতনের চারণভূমিতে।'

ভুট্টো ও সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করতে পেরে জি.এম. সৈয়দ এর আগে পশ্চিমপাকিস্তানের উদারপন্থী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে সিন্ধু বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাঞ্জাবি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে। জি.এম. সৈয়দ ভালো করেই জানতেন যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো একজন সিন্ধি হয়েও সিন্ধুর জন্য কিছু করবেন না। তার লক্ষ্য পাঞ্জাবিদের সেবাদাস হয়ে মসনদ আহরণ। পূর্ববাংলায় গণহত্যা শুরু করার আগেই ভুট্টো কতিপয় সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে লারকানার দ্রিগ লেকে শিকার করতে যান। সেখানেই তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, বাঙালিরা নির্বাচনে জয়ী হলেও তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে না। বাঙালিরা সমগ্র পাকিস্তান শাসন করবে এটা ভুট্টো ও জেনারেলরা মানতে পারেন নি। তার চেয়ে বল প্রয়োগে বাঙালির বিদ্রোহ দমনই ছিলো তাদের কাছে অধিকতর ভালো।

'ভুট্টো ও সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্র যাতে কামিয়াব না হয় সে কারণে জি. এম. সৈয়দ মিত্রের সন্ধান করেন। তিনি বেলুচ ও পাঠান নেতাদের সাহায্য চাইলেন। প্রথমেই কথা বললেন ন্যাপ সভাপতি ওয়ালি খানের সঙ্গে। তাকে জানালেন, 'এ সঙ্কটময় মুহূর্তে আমাদের আওয়ামীলীগকে সমর্থন করা উচিত। আওয়ামীলীগের ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান পুনর্গঠিত হলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পাবে, পাঞ্জাবিদের কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে এবং সেনাশাসন চিরতরে বিদায় নেবে।'

কিন্তু ওয়ালি খান সরাসরি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। বললেন, 'আমি আওয়ামীলীগের ৬ দফা সমর্থন করতে পানি না। কেননা আওয়ামীলীগের ৬ দফায় প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পৃথক মুদ্রা রাখার কথা রয়েছে। এর ফলে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে টাকা পয়সার লেন-দেন করতে হলে রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে

করতে হবে।' ওয়ালি খান আরো যোগ করলেন, 'এতে পাঠানদের স্বার্থ হানি হবে। সিন্ধুতে ১০ লাখের মতো পাঠান বসবাস করে। এদের প্রত্যেকে যদি ৫ টাকা করেও আয় করে তাহলে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ লাখ টাকা। এসব পাঠান নাগরিকের পরিবার পরিজন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাস করে। ৬ দফা মেনে নিলে তাদের না খেয়ে মরতে হবে। ফলে আমি কীভাবে আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে সমর্থন করতে পারি?

ওয়ালি খানের প্রতিক্রিয়া জি.এম. সৈয়দকে দারুণভাবে হতাশ করে। তিনি বুঝতে পারলেন, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ওয়ালি খানকে অন্ধ করে দিয়েছে। আসলে ভুট্টোর মতো ন্যাপ নেতাও পাঞ্জাবিদের স্বার্থ রক্ষায় ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হয়তো এটি ছিলো সিন্ধুকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে পাঞ্জাবি-পাঠান আতাঁতের ফল।

সেনাবাহিনী জি.এম. সৈয়দ ও পশ্চিমপাকিস্তানি ভিন্ন মতাবলম্বী নেতাদেরও ধর-পাকড় আরম্ভ করে। এর বাইরে ছিলো সামরিক শাসকদের ফাই-ফরমাস খাটতে অভ্যস্ত জামা'আত, মুসলিমলীগ এবং মহাধুরন্ধের ভুট্টোর পি.পি.পি.।

৬ দফা প্রভাব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬ দফা শুধু পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেই উজ্জীবিত করে নি, পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশসমূহের মানুষকেও অনুপ্রাণিত করেছিলো। তারাও এর মধ্যে তাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেয়েছিলো। ১৯৬৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারিতে লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৬ দফা ঘোষণা করেন। এর আগে সেপ্টেম্বরে সংঘটিত হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময়ে সমগ্র পূর্ববাংলা ছিলো অরক্ষিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাঞ্জাব রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালালেও এক হাজার মাইল দূরের বাংলা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। শেখ সাহেব ৬ দফায় তাঁর প্রদেশের এ সমস্যাটি তুলে ধারার পাশাপাশি প্যারা মিলিটারি গঠনের প্রস্তাব করেন। এ প্যারা মিলিটারি থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রস্তাব যেমন পূর্ববাংলার মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলো তেমনি সিন্ধু বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষও স্বাগত জানিয়েছিলো। জি.এম. সৈয়দের ভাষ্য হচ্ছে, 'প্যারা মিলিটারি গঠনসহ ৬ দফায় বর্ণিত প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তসাশনের প্রস্তাবকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাই।' যদিও পাঞ্জাবি শাসকরা কখনো ৬ দফাকে ভালোভাবে দেখে নি। ৬ দফা ঘোষণার কিছুদিন পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। একই সময়ে জি.এম. সৈয়দ সিন্ধুতে এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললে আইয়ুব শাহী তাকেও গ্রেফতার করে।

জি.এম. সৈয়দ জানান, ৬ দফা ঘোষণা ও আইয়ুব কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের মাঝখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একবার পশ্চিমপাকিস্তান গিয়েছিলেন। তারিখটা ছিলো ১০ আগস্ট ১৯৬৬। সিন্ধু মুত্তাহিদা মাহাজ-এর উদ্যোগে করাচির হোটেল মেট্রোপোল-এ তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সিন্ধুর নেতা বাঙালি নেতাকে বলেছিলেন, 'আমরা আপনার ৬ দফাকে সমর্থন

করি। কেননা এতে প্রত্যেক প্রদেশের ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনের কথা আছে। এরই পাশাপাশি আমাদের এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলনেও আপনার সমর্থন চাই।'

তিনি আরো বললেন, 'আপনি জানেন, আমাদের সমস্যাটি বিভিন্ন সময়ে আপনার দলের কাছে পেশ করেছি। আপনাদের মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমার করাচি বাসভবনে বসে এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলনে আমাদের পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। ফলে আজ তাঁর প্রকৃত উত্তরসূরি হিসেবে আপনার কাছে আমাদের আবেদনটি রাখলাম। এখানে স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধান কোনোভাবেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অগণতান্ত্রিকভাবে গঠিত একটি পরিষদে এ আইন পাস হয়েছিলো। পূর্বপাকিস্তানও ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো (পশ্চিমপাকিস্তানে) এর ঐক্যের মাঝেই সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। আপনার প্রতি আছে ক্ষুদ্র প্রদেশসমূহের জনগণের দৃঢ় সমর্থন। পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনসহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকে ন্যায়সঙ্গত মনে করি। আমরা এবং আপনারা একই নৌকায়। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনাদের সমর্থন দিয়ে যাবো এবং আপনাদের কাছেও অনুরূপ সমর্থন আশা করবো।

এ অনুষ্ঠানেই আওয়ামীলীগ ও সিন্ধু মুত্তাহিদা মাহাজের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জি.এম. সৈয়দ ১৯৬৯ সালে বেলুচিস্তানে মুত্তাহিদ মাহাজ দল গঠনে সহায়তা করেন। তার চিন্তা ছিলো বাংলা ও সিন্ধুর মতো অন্যান্য প্রদেশেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া। পশ্চিমপাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে শাসক গোষ্ঠী এক ইউনিট ভেঙে দিতে বাধ্য হবে। বিভিন্ন অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমন ও সাংবিধানিক কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রেও এ ঐক্য সহায়ক হবে।

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের বিবরণ দিতে গিয়ে জি.এম. সৈয়দ লিখেছেন, 'আমরা প্রথম জনগণের বাক স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম। কেননা কারো বাক স্বাধীনতা বন্ধ করে দিলে সে স্থান পূরণ করে বুলেট। বুলেট শুধু বুলেটের জন্ম দেয়, ছোরা দেয় নতুন ছোরার। এ কারণে আমরা চেয়েছিলাম পার্লামেন্টের মাধ্যমে এক ইউনিট প্রথা বিলোপ করে সিন্ধুর জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হোক। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী আমাদের সেই কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয় নির্যাতনের মাধ্যমে। ১৯৬২ সালে চাপিয়ে দেওয়া শাসনতন্ত্র সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলো।

যে সুফিতত্ত্ব শান্তি ও ভালোবাসার বাণী প্রচার করেছে সেই সুফিতত্ত্ব প্রচারেও তারা বাঁধা দিয়েছে। এমন কি আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য ও তাদের দৃষ্টিতে ছিলো বেআইনি। সে সময়ে পরিস্থিতি কতোটা ভয়াবহ ছিলো তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই। সিন্ধুর অন্যতম জনপ্রিয় কবি শেখ আয়াজ আমাকে তার একটি বই উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। জবাবে আমি তাকে জানাই, আমাকে বই উৎসর্গ করবেন, তাতে আমার আনন্দিত হওয়ার। কথা। কিন্তু একই সঙ্গে বইটি নিষিদ্ধ হওয়া এবং আপনাকেও জেলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দমনপীড়নমূলক পরিবেশে সাংবিধানিক উপায়ে অধিকার আদায়ের কোনো পথই আর রইলো না। ছাত্র-তরুণ, লেখক-কবি বুদ্ধিজীবীরা রাজপথে নেমে এলে তাদেরকে পাইকারী হারে গ্রেফতার করা হয়। তরুণরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে। এক ইউনিটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সিন্ধুতে, সারা পাকিস্তানে।

এ সময়েই শাসকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। আওয়ামী লীগ নেতা ও তার সহেযোগীদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। সেনাবাহিনী মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে অন্তরীণ অবস্থায় হত্যা করে। পূর্ববাংলা জুড়ে আন্দোলনের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্র তরুণসহ সকল স্তরের মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। আইয়ুবের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাঞ্জাবি আমলা-মিলিটারি চক্র নকল হিরো হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মাঠে নামায়। এ ভুট্টো ছিলো আইয়ুব খানের মন্ত্রি ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এক সময় সে ফিল্ড মার্শালকে 'ড্যাডি' বলেও সম্বোধন করতো। প্রকৃতপক্ষে ষাটের আন্দোলন ছিলো জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন। পাঞ্জাবি আমলা চক্র সেটিকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার প্রাক্তন 'প্রভুর' বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

জি.এম. সৈয়দ বলেছেন, 'এ ভুট্টোই ১৯৬৫ সালে আইয়ুবকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে উস্কানি দেয়। ভুট্টো তাকে এটাও বোঝাতে সচেষ্ট হয় যে, বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত পাল্টা আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। অনায়াসেই কাশ্মীর পাকিস্তানের করায়ত্তে এসে যাবে। ভুট্টোর পরামর্শেই আইয়ুব খান প্রথম অভিযানে ভারত পাঞ্জাবের বিরাট এলাকা দখল করে নিলে ভুট্টোর আশ্বাস নিষ্ফল রোদনে পরিণত হয়। আইয়ুবের সেই ঘনিষ্ঠ সুহৃদ এখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের জঙ্গী নেতা।'

ঊনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থান

ঊনসত্তরের গণবিক্ষোভ গণবিদ্রোহে রূপ নেয়। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমপাকিস্তানের সর্বত্র আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্ত হলেন ২২ ফ্রেব্রুয়ারি। ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি ছেড়ে দেওয়া হয় জিয় সিন্ধ নেতা জি.এম. সৈয়দকে।

এর আগেই অবশ্য আইয়ুব গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার নেতারা বললেন, 'আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়া গোল টেবিল বৈঠক হবে অর্থহীন। অতএব তাকে ছেড়ে দিতে হবে।' আইয়ুব প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগের তরুণ নেতারা এতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি একজন মুক্ত মানুষ হিসেবেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে চাই। বাংলার মানুষের অধিকারের কথা বলতে চাই।' শেষ পর্যন্ত আইয়ুব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য

হন। অবশ্য এ ছাড়া তার আর কোনো উপায়ও ছিলো না।

এ দিকে জি.এম. সৈয়দের মুক্তিদান নিয়েও সরকার চালবাহানা করে। হায়দারাবাদে লাখ লাখ লোকের সমাবেশ সিন্ধুর জনপ্রিয় নেতা শেখ আয়াজ ঘোষণা করেন, জি.এম. সৈয়দকে অন্তরীণ রেখে কোনো গোলটেবিল বৈঠক হলে সিন্ধুর জনগণ তা মেনে নেবে না। ফলে ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি মুক্তি পান জি.এম. সৈয়দ।

জি.এম. সৈয়দ ৯ মার্চ হায়দারাবাদে মুত্তাহিদা মাহাজের বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠক সিন্ধুর অপর জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবুদল মজিদ বলেন, ১৮৪৩ সালে বৃটিশ সরকার সিন্ধু দখল করার পর '১৮৪৭ সালে বোম্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সিন্ধুবাসী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে এখানে প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সিন্ধুর প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এক ইউনিট প্রথা চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই পরিষদ এবং সরকার টিকে ছিলো। সিন্ধুর জনপ্রতিনিধিরা সেদিন জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য এক ইউনিটের পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। সেই বৈঠকে গৃহীত ৬ দফা প্রস্তাব বলা হয়েছিলো :

১. এক ইউনিট ভেঙে দিতে হবে;
২. ক্ষমতালিপ্সু ও লোভী রাজনীতিকদের জাতীয় রাজনীতি থেকে যতো দূর সম্ভব দূরে রাখা,
৩. নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী লোকদের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব অর্পণ,
৪. যারা এক ইউনিটবিরোধী আন্দোলনে শরিক হবে তাদের সহায়তা কামনা,
৫. মানবিক দুর্বলতা ও ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা,
৬. সিন্ধুর মুক্তি লাভের পর মাহাজের তিনটি লক্ষ্য হবে; জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র।

এ সম্মেলনেই জি.এম. সৈয়দকে মুত্তাহিদা মাহাজের সভাপতি নির্বাচিত করে এবং আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে দলের হয়ে তাকে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব দেয়।

এদিকে ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে লোকের উপস্থিতিতে আওয়ামীলীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়। এ সংবর্ধনার জবাবে তিনি ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমদ পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে অভিষিক্ত করেন।

চার.

এদিকে পশ্চিমপাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন। যদিও তিনি পরবর্তীকালে তার প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। পশ্চিমপাকিস্তানের তিনটি ছোট প্রদেশ ও পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠী নানা চক্রান্ত আঁটতে থাকে। তারা পূর্ববঙ্গে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীকে এবং পশ্চিমপাকিস্তানে ভুট্টোকে নিয়োগ করে। কিন্তু পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগ

জনপ্রিতার শীর্ষে। তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে পশ্চিমপাকিস্তানে এ চক্রান্ত পুরোপরি সফল হয়। পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক চক্রের পুতুল হিসেবে কাজ করতে থাকে ভুট্টো। দুর্ভাগ্যজনক যে, মুত্তাহিদা মাহাজেরের তরুণ সমর্থকদেরও সে তার দলে টেনে নিতে সক্ষম হয়।

ইয়াহিয়া খান এক অধ্যাদেশ বলে পশ্চিমপাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা ভেঙে দিলে তার পুরো সুযোগটি নেয় পি.পি.পি নেতা। আমাদের দাবি ছিলো দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে এক ইউনিট বহাল রেখে সিন্ধু থেকে যে সম্পদ ও জমি পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক চক্র দখল করেছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অধ্যাদেশটি এমনভাবে জারি করা হলো যাতে মনে হয় ভুট্টোর দাবির মুখেই ইয়াহিয়া খান এটি দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং ভুট্টো এর পুরো সুফল ঘরে তুলে নিলো। জাতীয়তাবাদীরা সিন্ধুতে একটি আসনও পায় নি।

এ সময়ে জি.এম. সৈয়দ সিন্ধুর আঞ্চলিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, 'বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সর্বশেষ বেতার-টিভি ভাষণেও সিন্ধু জাতীয়তাবাদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। কিন্তু 'তারপরেও জি.এম. সৈয়দের দল মুত্তাহিদা মাহাজ সিন্ধুতে কোনো আসন লাভে ব্যর্থ হয়। এরপর জয়সিন্ধ আন্দোলনের নেতা জানান, তারপরেও আমার আশা ছিলো আওয়ামীলীগ জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে বালুচ ও পাঠানদের নিয়ে হয়তো সকল প্রদেশের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা যাবে। আমি আওয়ামীলীগ বালুচ ও পাঠান নেতাদের সঙ্গে কথাও বলি। কিন্তু ততোদিন পাঞ্জাবি শাসকরা পূর্ববাংলা ছেড়ে দেওয়া এবং সিন্ধুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ভুট্টোকে দিয়ে ১৯৭০ সালেই তারা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে লেগে যায়। আমি এখনো বলছি শুরু থেকেই পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলো। এটা আমার কথা নয়। আমি এখানে (আদালতে) পাঞ্জাবি বুদ্ধিজীবী, কবি ও আমলা ফজল আহমেদ কবির দেওয়া তথ্য-প্রমাণ হাজির করছি। ফজল আহমেদ কবির পূর্ববাংলায় ২০ বছর চাকরি করেছেন। পাঞ্জাবিরা পূর্ববাংলাকে যখন দখলকৃত ভূমি হিসেবে দেখতে লাগলো তখন থেকেই সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের উপলব্ধি হয়। এর ব্যাপারে বিস্তারিত বললে দুটি বই হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারগুলোর বিমাতা সুলভ আচরণের কারণেই পাকিস্তানের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ ঘটেছে। এগুলো ছিলো ফজলে আহমদ কবিরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। তিনি আরো জানাচ্ছেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু তিন বছর পরই পাঞ্জাবি কর্মকর্তারা বলতে শুরু করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা এক সময় না এক সময় নিজেদের সংগঠিত করবে। যার অনিবার্য ফল হবে ক্ষমতা হারানো।

পাকিস্তান ভাঙার সময়ে এ কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ মানসিকতা ধীরে ধীরে বাঙালিদের মধ্যে পৃথক হওয়ার চিন্তাকে উস্কে দেয় এবং তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় পূর্বপাকিস্তানে ফজলে আহমেদ কবির ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলা। তার পরামর্শ চাইলে তিনি সরাসরি এসব কথা বলেন।

জবাবে পাঞ্জাবি কর্মকর্তারা তাকে বলেছিলেন যে, সে ধরনের ঘটনা হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং তা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার বীজই রোপণ করবে। ফজলে কবির এ আমলাচক্রের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সে সৎ পরামর্শ কে শোনে? বাঙালিকে পৃথক করে দেওয়ার পরিকল্পনা এগুতে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই পশ্চিমপাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন করা হয়েছিলো।'

(সাপ্তাহিক জিন্দেগি, লাহোর, ফেব্রুয়ারি ১৯৭১,
মোহাম্মদ মুসা ভুট্টোর নিবন্ধ, জাদিদ সিন্ধ কে মশায়েল কাহাল)।

এ পরিকল্পনা সফল করা তথা ক্ষমতার লোভে সিন্ধুর রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টো যে সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের ইতিহাসে তার সমতুল্য নজির নেই। এ ঘটনা ৩০ লাখ লোকের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ধরনের গণহত্যা বিশ্বযুদ্ধে ঘটলেও ইসলামের নামে মাত্র কয়েক মাসে এতো সংখ্যক মুসলামানের জীবনহানি চরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

দেশে আবার সন্ত্রাস ও নিপীড়নের ঘটনা ঘটাতে থাকলো এবারেও জুলফিকার আরী ভুট্টোর পরামর্শে পাঞ্জাবি সামরিক বেসামরিক চক্র ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এ যুদ্ধে পরিসমাপ্তি হলো পূর্বাঞ্চলে জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবি আমলাচক্র যে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলো এ আত্মসমর্পণ ছিলো তারই আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।

যদিও এর আগে ইয়াহিয়া খান বাঙালি নেতা নুরুল আমিনের নেতৃত্বে তথাকথিত মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। এ মন্ত্রিসভায় ভুট্টো ছিলেন একই সঙ্গে উপপ্রধানমন্ত্রি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রি। যদিও মন্ত্রিসভার গঠনের আগে জাতীয় সংসদের কোনো অধিবেশন ডাকা হয় নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতিসংঘে গিয়ে পূর্ববাংলায় সামরিক অভিযান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারকে নৈতিক ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। কিন্তু বিশ্ব জনমত ছিলো এ বর্বরতা ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানকে এক রাখার সর্বশেষ সুযোগ ছিলো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত পোল্যান্ডের প্রস্তাবকে গ্রহণ করা।

এ প্রস্তাবে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছিলো। কিন্তু ভুট্টো সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে পাকিস্তানকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেশে ফিরে ২০ ডিসেম্বর খণ্ডিত দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। তার ক্ষমতারোহণে তখন জেনারেল গুলহাসানা ও আরো কয়েকজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা সহায়তা করেছিলেন। তিনিই পৃথিবীর প্রথম সিভিলিয়ান চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেশন-এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সিন্ধি, পাঠান ও বালুচ তাদের বলিষ্ঠ বন্ধু বাংলাকে হারালো।

খণ্ডিত পাকিস্তান

এ প্রসঙ্গে জি.এম. সৈয়দ বলেন, 'খণ্ডিত পাকিস্তানের (পশ্চিম পাকিস্তানের) দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের ভেতরে ও বাইরে নিজের ইমেজ বিল্ডআপে সচেষ্ট হন। যুদ্ধের পরাজয় ও বাংলা হারানোর পুরো দায়-দায়িত্ব চাপান ইয়াহিয়া খানের উপর। ওয়ালি খানের নেতৃত্বাধীন ন্যাপসহ রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এক পর্যায়ে তিনি বাংলার নেতা আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৮ জানুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে সময়েও ভুট্টো আমাকে ছেড়ে দেন নি।'



চিত্র : ১৭। বৃদ্ধ পিতার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি আরো বলেন, 'কিছুদিন পর অবশ্য আমিও মুক্তি পেয়ে যাই। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সমগ্র সিন্ধু থেকে শ্রমিক ও অন্য পেশাজীবীরা যোগ দেন। সেই অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্টেকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, দেশের বাকি অংশ রক্ষা করতে হলেও সাংবিধানিক কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে।

সেই বক্তৃতায় আমি পূর্ববাংলা হারানোর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, এখনো সময় আছে। বাকি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে সাংবিধানিক কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে। বিগত ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অবশ্যই রাজনীতিতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা উচিত। সে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে :

এক.

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ধারণার পরিবর্তে পাকিস্তান ৫টি দেশের সমন্বয়েগঠিত একটি দেশ হিসেবে মেনে নিতে হবে। যাদের প্রত্যেকের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে। আর পূর্ববাংলার জনগণ যদি স্বাধীন থাকতে চায় তাহলে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

দেওয়া প্রয়োজন। বাকি ৪টি প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেওয়াসহ একটি নতুন ফেডারেশন গঠন করা যেতে পারে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও যোগাযোগ। আর সব বিষয় ন্যস্ত হবে ইউনিট সরকারের কাছে। যদি আমরা এক কাজ না করতে পারি তাহলে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে বৈকি!

দুই.

ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে আমাদের মন পরিষ্কার করতে হবে। পৃথিবীর কোথাও ধর্মীয় ব্যবস্থা বহাল নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা দেখি না। পূর্ববর্তী সরকারগুলো এ ব্যাপারে শুধু বাগাড়ম্বর করে গেছে। তাদের কথা ও কাজে কোনো মিল ছিলো না। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে সেকুলার সংবিধান রয়েছে। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই তাহলে প্রগতিশীল দল ব্যক্তিবর্গের টিকে থাকা কঠিন হবে। প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানাতে চাই তিনি যেনো এ ব্যাপারে মনস্থির করেন এবং দেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো উপহার দেন। সে ক্ষেত্রে তিনি প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন পাবেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বার্থান্বেষী মহল শুরু থেকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দিয়ে এসেছে। এ কারণেই নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা যায় নি। এ কুচক্রীমহল যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছে সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রথমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদে ব্যবহৃত হয়েছেন, পরবর্তীকালে সরাসরি একনায়কতন্ত্র দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কখনো নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, কখনো মৌলিক গণতন্ত্র, কখনো বা শক্তিশালী কেন্দ্রের মাধ্যমে।

তিন.

এ প্রথমবারের মতো জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসনের সুযোগ পেয়েছে। এবারও যদি স্বার্থান্বেষী মহল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তাহলে জনগণের হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে পথ ব্যর্থ করা যেতে পারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে। কোনো কারণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বিলম্ব হলেও দ্রুত প্রাদেশিক সরকারসমূহ গঠন করা প্রয়োজন। নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে পিপলস পার্টির সরকার গঠন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হবে। প্রত্যেক প্রদেশের গভর্নর ক্ষমতাসীন দলের হতে হবে। দেশ আপাতত ১৯৪৭ সালের ভারত অধ্যাদেশ অনুযায়ী চলবে। পরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগেই বলেছি কেন্দ্রের হাতে শুধু তিনটি বিষয় থাকবে।

চার.

ইতিহাস সাক্ষী যে, স্বার্থান্বেষী মহল গত ২৪ বছর সংবিধান প্রণয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দিয়ে আসছে। বর্তমানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পেয়েছি। এ মহল তাকেও সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে। কোনো দেশই কয়েক মাসে সাংবিধানিক সংস্কার সম্পন্ন করতে পারে না। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমাজতান্ত্রিক

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন। দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে সংস্কার কর্মসূচি চলছে। যেসব কারণে শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে সেগুলো হলো—

ক. শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনের ওপর সশস্ত্র বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেয়।

খ. মুসলিম জাতির ধারণার সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে শোষণ ও অধিকার খর্ব করার সুযোগ পায়।

গ. ইসলামি ব্যবস্থা নিয়ে বাগাড়ম্বরে জনগণের দৃষ্টি তাদের প্রকৃত সমস্যা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয় এবং স্বার্থান্বেষী মহলকে উৎসাহ যোগায়।

ঘ. প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংঘাত অব্যাহত থাকলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সুযোগ থাকে। প্রেসিডেন্ট যদি তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে তার উচিত হবে ভারতের সঙ্গে মীমাংসায় আসা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ ছাড়া পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। জনগণের ওপর মোল্লা ও পীরদের যে আধিপত্য আছে তা ভেঙে দিতে হবে।

ঙ. ভারত ও আফগানিস্তানের সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারগুলো শত্রুতা জিইয়ে রেখেছিলো এবং এর জন্য বৃহৎ সেনাবাহিনী পুষতে হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আসতে হয়েছে। এ শত্রুতায় আমাদের তিন তিনবার যুদ্ধে শামিল হতে হয়েছে। বৃহৎ সামরিক বাহিনী প্রশাসনের ওপর অন্যায় প্রভাব সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

পাঁচ.

সেই দীর্ঘ বক্তৃতায় জি.এম. সৈয়দ বার বার সিন্ধুর ন্যায়সঙ্গত অধিকার, স্বায়ত্ব শাসন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা বলেছিলেন। বিগত ২৪ বছর ধরে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশকে পাঞ্জাবিরা শোষণ করে আসছে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস হলো ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এ পাঞ্জাবিরা ভারতের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলো।

যে মুহূর্তে ভারতের মাটিতে হাজার হাজার পাকিস্তানি সেনা বন্দি রয়েছে, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ভারতের দখলে রয়েছে সে মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো জাতীয় ঐক্য। এ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সমতা। পাকিস্তানভুক্ত প্রদেশগুলোর স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র প্রদেশগুলো যাতে না ভাবতে পারে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে হবে। আমি মনে করি সময় বদলে গেছে। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শাসকগোষ্ঠীর মন মানসিকতারও

পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আসুন, আমাদের যতো সমস্যা, যতো বিরোধ শান্তিপূর্ণ ও সমতার ভিত্তিতে সমাধান করি। সেটাই কেবল বাকি পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে।

এরপর জি.এম. সৈয়দ আরো বলেন, 'সেই বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে শাসকগোষ্ঠী তার কাছে কৈফিয়ত দাবি করে। পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি এক চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয় : ১. ১৭ জানুয়ারি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় আপনি দ্বি-জাতি তত্ত্বকে 'সাময়িক ও অকার্যকর' বলে অভিহিত করেছেন, ২. পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের জনগণ ৫টি পৃথক জাতিতে বিভক্ত এবং সেই পাঁচ প্রদেশের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করা উচিত, ৩. আপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'খুদ্দাম-ই-সিন্ধ' নামে একটি সংঘটনও গড়ে তুলেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো জনমত গঠন করা এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্য লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

এ পত্রে আরো অভিযোগ আনা হয় যে, সরকার এটাও জানতে পেরেছে যে, অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতিতে কয়েকজন বক্তা সিন্ধ-এর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সরকার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ যারা করবে সেনাবাহিনী তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে এবং সেই প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের রক্তে সিন্ধু নদীর পানি লাল করে দেওয়া হবে।

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের বিদ্যমান আইনে এসব কর্মকাণ্ড অমার্জনীয় অপরাধ এবং যারাই রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করবে এবং হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমরা আপনার কাছে প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যাসত্য জানতে চাইছি।

জি.এম. সৈয়দ জানান 'এ চিঠির বিস্তারিত জবাব দিই এবং স্পষ্ট ভাষায় জানাই যে, আমি এমন কিছু করি নি বা বলি নি যাতে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট হতে পারে। বরং আমি বলতে চেয়েছি যে, জনগণের অধিকার রক্ষার এটাই সর্বশেষ সুযোগ। শুরু থেকেই আমি বলে এসেছি পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠাই নতুন সম্পর্কের সূচনা ঘটাবে। কিন্তু আজ ১৯৭২ সালেই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয় নি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা নাকচ করা হয়েছিলো। আমার নামে বহুবার দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিলো। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী কখনোই তা প্রমাণ করতে পারে নি। একজন সিন্ধি হিসেবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, এর সংস্কৃতি, এ ভাষা ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।

আমি আমার রাজনৈতিক সুহৃদ আবদুল মজিদ সিন্ধির প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি একই মতো পোষণ করতেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে আমরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খানকে লেখা চিঠিতেও অনুরূপ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম। এরপর তার উত্তরসূরি খাজা নাজিমউদ্দিনকেও অনুরূপ চিঠি লিখি। বাঙালি হয়েও তিনি পাঞ্জাবি আমলা মিলিটারি চক্রের হাতে জিম্মি ছিলেন এবং তাদের স্বার্থেই কাজ করেছেন। খাজা নাজিমউদ্দিন বিদায় নেওয়ার পর পাঞ্জাবি আমলা-মিলিটারিরা কেন্দ্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। রাজনীতিকরা হয়ে পড়েন তাদের হাতের পুতুল। ১৯৫৩ সালের শেষ দিকে পাঞ্জাবে কাদিয়ানি বিরোধী দাঙ্গার সুযোগে লাহোরে মার্শাল ল' জারি করা হয়। যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিলো। দাঙ্গার কারণে অনুসন্ধানে সে সময়ে সুপ্রীম কোর্টের দুই বিচারকের সমন্বয়ে একটি তদন্ত টিম গঠিত হয়। তদন্ত টিমের অভিমত ছিলো যে, খাজা নাজিমউদ্দিনকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দাঙ্গা লাগানো হয়েছিলো। পরবর্তীকালে ইস্কান্দার মির্জা ও গোলাম মোহাম্মদ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন। তারা নিজ দেশকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। ইস্কান্দার মির্জা ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানই ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানের ওয়ান ইউনিট প্রথা চালুর মূল হোতা। যা ছিলো পাকিস্তানের সর্বনাশের প্রধান কারণ।'

ষষ্ঠ অধ্যায় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া

গণমাধ্যম ও বিশ্বজনমত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ভেতরে ও বহির্বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত ও আলোড়িত ব্যক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। তার আহুত অসহযোগ আন্দোলন আর অসহযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না, সে আন্দোলন রূপ নেয় বিশাল গণবিদ্রোহে। সেই বিদ্রোহকালীন অবস্থায়ও জনগণকে শান্ত রাখা এবং সামনে চলার নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশবাসী তো বটেই বিদেশি রাষ্ট্রনেতা, লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন একজন ব্যক্তি প্রশাসন পুলিশ ও মিলিটারি ছাড়াই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করছেন। তার প্রতিটি আদেশ নির্দেশ জনগণ সানন্দে মেনে নিচ্ছেন, তার কথায় লাখ লাখ তরুণ জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা ওয়ালি খান সে সময় ঢাকায় এসেছিলেন। পাকিস্তান ফিরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'মহাত্মা গান্ধী আজ বেঁচে থাকলে বিস্মিত হতেন।'

সে সময়ে সত্যি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন বিস্ময়। বিদেশি সাংবাদিক যারাই পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঢাকায় এসেছিলেন তারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন বঙ্গভবন নয়, সচিবালয় নয় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের দোতলা বাড়িটি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশ পরিচালনা করছেন। মহল্লার অপরিচিত কোনো রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে হাইকোর্টের বিচারকরা পর্যন্ত সেখানে এসে তাঁর পরামর্শ নিচ্ছেন। সে সময়ে একটি কথা বেশ প্রচলিত হয়েছিলো 'All roads lead to 32 no'. এমন কি পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান, পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও মার্চের বাংলাদেশ দেখে বুঝে নিয়েছিলেন বাঙালিকে আর পদানত রাখা যাবে না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনিবার্য। তারপরেও বর্বর পাকিস্তানি শাসকরা কামান ও ট্যাংকের মাধ্যমে স্বাধীনতা গুড়িয়ে দিতে চাইলো। সেটি আহম্মকি ছাড়া কিছু ছিলো না। একটা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন শাসকদের বিরুদ্ধে যায় তখন তাকে দমিয়ে রাখা যায় না। পাকিস্তানি মারণাস্ত্র হয়তো বিজয়কে কিছুটা বিলম্বিত করছে, লাখো লাখো মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য পাকিস্তানকে ও কম খেসারত দিতে হয় নি।

২৬ মার্চ ঢাকা থেকে ফিরে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছিলেন 'God save the Pakistan'. কিন্তু তার আগেই পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছিলো পাকিস্তান বাহিনীর ট্যাংকের নিচে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ

অনুষ্ঠানে তাজউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছিলেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত। অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে।'

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তী ৯ মাস তিনি ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানে কারারুদ্ধ। কিন্তু সেই কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনেক বেশি ভীতি ও শঙ্কার কারণ ছিলো ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের কাছে। ২৬ মার্চ বেতার টিভিতে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে, পাকিস্তানের শত্রু, হিসেবে চিহ্নিত করেন। নিষিদ্ধ করেন তাঁর দল আওয়ামীলীগকে। তার এ ঘোষণার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়েছিলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে যে পৈশাচিক গণহত্যা চালিয়েছে দেশ-বিদেশের পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর বিশ্ব সম্প্রদায় পাকিস্তান ও তার শাসকদের ধিক্কার দিতে থাকে। তাদের একটাই প্রশ্ন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেন পার্লামেন্টে বসতে দেওয়া হলো না? কেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলো না? কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে? এসব প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই পাকিস্তানিদের জানা ছিলো না। তাই জাতিসংঘে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা ও রাজনীতিকদের কাছে পাঠানো তাদের ব্যাখ্যা ছিলো আজব কল্প-কাহিনী এবং মিথ্যাচারে ভরা।

সে সময় বিশ্বজনমত, রাষ্টনেতা এবং গণমাধ্যম সমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কী চোখে দেখেছে, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মূল্যায়ন করেছে এ পর্বে তার কিছু বিবরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অতর্কিত অভিযান ও গণহত্যার প্রতিবাদ করে ৩১ মার্চ ভারতীয় লোকসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় :

'পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে লোকসভা গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। পূর্ববাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিমপাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সেখানে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের বদলে পাকিস্তান সরকার তাদের উপর গণহত্যা চাপিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকার কেবল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায় নি তারা পূর্ববাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করেছে। এ লোকসভা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও সংহতি প্রকাশ করছে এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অবিলম্বে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর বল প্রয়োগ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।'

ভারতীয় সরকার বা নেতারা তখনোও পুরোপুরি জানেন না বাংলাদেশে গণহত্যা কতো ব্যাপকতর। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কেও অবহিত নন। একারণেই গণতন্ত্রের সংগ্রামের কথা বলেছেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার দেশের সমর্থন কামনা করেন। এ বৈঠকেই ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার খবর তাজউদ্দিন আহমদকে দেন।

স্বভাবত ভারতের প্রতিক্রিয়া ও নিন্দা প্রস্তাবকে পাকিস্তান সরকার গ্রাহ্যে আনে নি। তারা বরাবরই ভারতকে 'শত্রু' হিসেবে বিবেচনা করেছে। কিন্তু এপ্রিলের ২ তারিখে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস পদগোর্নি যখন পূর্ববাংলার গণহত্যা ও নির্যাতন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে ইয়াহিয়ার কাছে কড়া ভাষায় চিঠি লেখেন তখন পাকিস্তানের কিছুটা টনক নড়ে। দুই সুপার পাওয়ারের একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েতের সঙ্গে আছে পাকিস্তানের বিভিন্ন যৌথ প্রকল্প। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপের মধ্যে রাখার জন্য ইসলামাবাদ মস্কোর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতো। ইয়াহিয়া খানকে লেখা পদগোর্নির চিঠিতে বলা হয়,

'ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক বল প্রয়োগ করেছেন—এ খবর সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। ... অগণিত মানুষের প্রাণহানি নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের খবরে সোভিয়েত জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবুর রহমন ও অন্যান্য রাজনীতিককে বন্দি করায় নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। পূর্বপাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য সেখানকার মানুষের উপর নিপীড়ণের অবসান ঘটানোর জন্য এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।'

আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। বিশেষ করে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ও তার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন জবর দখলকারী পাকিস্তান শাসকদের সমর্থক। কিন্তু এডওয়ার্ড কেনেডিসহ ডেমোক্রেট দলীয় বহু সিনেটর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। সহযোগিতা করেছে সে দেশের সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ। একাত্তরে ঢাকায় মার্কিন কনসুলেট জেনারেল ছিলেন আর্থার কে ব্লাড। তিনি সে সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন পররাষ্ট্র দফতরে তাতে স্পষ্টত বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি জোরালো সমর্থন ছিলো। রিপোর্টের একাংশে বলা হয় :

'পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা এখন অপরিহার্য। অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যে যে আন্দোলন শুরু করেছিলো, পূর্বপাকিস্তানি জনসাধারণের উপর সামগ্রিক লাঞ্ছনার জন্য শিগগিরই তা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপান্তরিত হবে—বাংলাদেশে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। এখানকার বর্তমান সংঘর্ষের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি ভাষা ও সামাজিক চালিকাশক্তিগুলোর প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগের নীতিমালা গত নির্বাচনে জনগণের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে সমর্থিত হয়েছে। এ ঘটনা অর্থনৈতিক নীতির উপর প্রদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত ক্ষমতার সংশোধনকেই জোরদার করেছে—যার প্রতিক্রিয়ায় ইয়াহিয়া সরকার একটি আতঙ্কের রাজত্ব স্থাপন করতে যাচ্ছে, এতে পুরো চেহারা ধীরে ধীরে সবার কাছেই উন্মোচিত হবে।'

এ রিপোর্টের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করা। আর্থার কে ব্লাড তার রিপোর্টে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর ব্যাপারে ভুল পদক্ষেপ নিলে এ অঞ্চলে সোভিয়েত ও চীনা প্রভাব আরো জোরদার হবে। রিপোর্টটি লেখা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, তখনও চীনের নীতি পরিষ্কার ছিলো না বলে আর্থার কে ব্লাডের রিপোর্টে চীনের কথা রয়েছে। পরবর্তীকালে চীনের নীতি মোটেই বাংলাদেশের পক্ষে ছিলো না।

সে সময়ে পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ফারল্যান্ড। সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব ছিলো। শুরুতে তিনিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকদের একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তার সে চেষ্টা সফল হয় নি। তবে ফারল্যান্ড দাবি করেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে না ঝোলানোর ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া কি প্রভাবিত হয়েছিলেন? এ সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন ফারল্যান্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

'When history books are written on the war, it will be shown that U.S. Policy and our local efforts in Pakistan kept Mujib alive. After Mujib's arrest, I talked frequently with Yahya and often mentioned Mujib ... I counselled Yahya not to kill this man. Yahya was not so convinced that he intended to spare Mujib forever. When Yahy aleft office in disgrace at the end of the war, he left behind the death warrant for Mujib. The date was blank. So his successors could till it in at their convience and blame the execution on Yahya. Yahyas's successors wisely refused to use the docu-ment.'

(সূত্র : Jack Anderson Papers)

আমরা জানি যে, বিশ্ববিখ্যাত লেখক বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এমন কি তিনি একদল সহযোদ্ধা নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ করারও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আন্দোলনে আঁদ্রে মালরোর বক্তব্যও ছিলো দ্ব্যর্থহীন। এ ছাড়া রিচার্ড নিকসনকে এক চিঠিতে তিনি পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সমর্থন না করার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন,

'আপনার বিমানবাহী জাহাজ কলকাতাকে হুমকি দিতে সক্ষম হলেও যুক্তরাষ্ট্র ঐ সব সমবেত মৃত্যুকামী জনগণের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করে পেরে উঠতে পারবে না। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী আপনার সেনাবাহিনী যেখানে ভিয়েতনামে নগ্নপদ যোদ্ধাদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে ১,২০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী একটি দেশকে কোনো দিন দাবিয়ে রাখতে পারবে?'

প্রথম থেকেই পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার ও বিরোধী রাজনীতিকরা ছিলেন সন্দেহভাজন। কমন্ওয়েল্থ এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে তারা পাকিস্তান সঙ্কটের

রাজনৈতিক সমাধান আশা করেছিলেন। স্বভাবতই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিলো তাদের কাম্য। পশ্চিমপাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন প্রভাবশালী ব্রিটিশ রাজনীতিকরা। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন কমন্স সভার সদস্য লর্ড পিটার শোর-এর বিবৃতিটি ছিলো ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। পিটার শোর বলেছেন,

'সত্যি কথা বলতে কি, পাকিস্তান ভেঙে গেছে। ভৌগোলিকতায় যেমন তারা এক হাজার মাইল দূরত্বে ছিলো তেমনি তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার দিক থেকেও সেই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। পূর্ববাংলা থেকে প্রতিমাসে ১০ লাখেরও বেশি লোক পালিয়ে যাচ্ছে— সেখানে পশ্চিমপাকিস্তান সরকার চাপ বা অন্য কোনো উপায়ে পাকিস্তানের দু অংশকে একই রাজনৈতিক ছাতার মধ্যে রাখতে পারবে বলে সে রকম কোনো সম্ভাবনা আমি আর দেখি না।'

অস্ট্রেলিয়াও বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে নিশ্চুপ ছিলো না। বিশেষ করে ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পর বিভিন্ন ফোরামে ও দেশের জাতীয় সংসদে অস্ট্রেলিয়ান নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। ২২ মে এপ্রিল সংসদ সদস্য ব্রায়ানটের প্রশ্নের জবাবে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রি উইলিয়াম ম্যাক সোহান একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির ভাষ্য ছিলো নিম্নরূপ :

'প্রাণহানিতে অবশ্যই আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমি সংসদকে জানাতে পারি ঠিক কতোটুকু আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি, বিশেষ করে আমরা উল্লেখ করছি যে, রক্তপাত ঘটেছে। কারণ, সম্প্রতি পশ্চিমপাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানে নির্বাচন হয়েছে। আমরা অবশ্যই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিবৃতিকে স্বাগতম জানাই যে, যতো দ্রুত সম্ভব তিনি বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। আমরা আশা করি আর কোনো প্রাণহানি ঘটবে না এবং আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হবে, ভদ্রভাবে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।'

অস্ট্রেলিয়া গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিকভাবে তারা বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান চেয়েছিলো এ কারণে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের বিবৃতি আস্থায় এনে আওয়ামীলীগ নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ক্ষমতা কেড়েই নিতে জানে, ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে জানে না।

আমেরিকান সিনেটের অনেক সদস্যের ন্যায় মি ওয়ালডিও ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিশেষ করে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর যে বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তিনি তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করে বলেছেন,

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলো পড়ে আমি মর্মাহত ও বিষাদে আক্রান্ত হয়েছি। এ সব রিপোর্টে পূর্বপাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে জনসাধারণের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে।'

নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রি ক্যাইথ ইল্‌ইয়্‌ক ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'নিউ

জিল্যান্ড পূর্বপাকিস্তানের ট্র্যাজেডি বিষয়ে নিরব বা উদাসীন কোনোটাই নয়।' পরিস্থিতির মানবিক দিক বিবেচনা করে তিনি দ্রুত রক্তপাত বন্ধ এবং আলাপ আলোচনার ও সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতাদের প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানান। এ ছাড়া ১৭ মে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশনে শরণার্থী সমস্যা সংক্রান্ত ভারত যে প্রস্তাব উত্থাপন করে নিউ জিল্যান্ড তা সমর্থন করে। সেই অধিবেশনে জাতিসংঘ নিউ জিল্যান্ডের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেছেন, 'এটা হলো মানবিক দিক, রক্তপাত ও যন্ত্রণাই নিউ জিল্যান্ডবাসীকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে, তবে উপমহাদেশে শান্তির জন্য এর প্রয়োগে আমরা ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হচ্ছি।'

আরেকটি আশ্চর্য ঘটনা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দূরপ্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের দেশগুলো নৈতিক ও মানবিক সমর্থন দিলেও নিশ্চুপ ছিলো মধ্যপ্রাচ্য ও ভারত ছাড়া এ অঞ্চলে আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলো। বার্মা (মায়ানমার) ও শ্রীলংকা পুরোপুরি পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিলো। ভারত পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিলে শ্রীলংকাই তাদের রাজধানীকে বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ পথে পশ্চিমপাকিস্তান থেকে শুধু বেসামরিক যাত্রী ও মালামালই আসে নি, এসেছে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র। ভুটানের পররাষ্ট্রনীতি ছিলো অনেকটা ভারতের সমার্থক। নেপাল ও ভারতের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ছিলো। রাজা বীরেন্দ্র দেশের ভেতরে বা বাইরে যে-কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন। এ কারণে তার বশংবদ সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু নেপালের জনগণ পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলো। তারই প্রতিধ্বনি পাই নেপালের তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা বি.বি. কৈরালার বক্তব্যে। নয়া দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বলেন,

'আজ আমরা সমবেত হচ্ছি বাংলাদেশে সংঘটিত মহান ট্রাজেডির ছায়াতলে। নিরস্ত্র সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি বর্বর সামরিক বাহিনী দ্বারা অপমানিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামের একটা বীরোচিত দিকও রয়েছে—তারা পাকিস্তানের শক্তিমান সামরিক রাজত্বের মোকাবেলা করছে। বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে নেপালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছি। সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যাই হোক, সমগ্র জনতা আন্তরিকভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করছে।'

বিখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ এক সময় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি উপমহাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। একাত্তরে বাংলাদেশের ঘটনাবলি তাকেও উদ্বিগ্ন না করে পারে নি। পাকিস্তানিদের প্রতি কোনো রকম সাহায্য না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসে তিনি লেখেন,

"It is to hope that the two great Islamic communities of the sub-continent can still find some relationship such as that between two parts of a commonwealth which will allow then to live in independent companionship. But there thrust be full autonomy and self government for East Bengal. Accordingly no action of ours should encourage or seem to encourage military domination of the east by the west."

মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আগস্ট মাসে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি কারাগারে আটক বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বিচার হবে সামরিক আদালতে এবং তা অতি গোপনে। এর আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণায় বিশ্ব নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ২ আগস্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে প্রচারিত প্রেসনোটে বলা হয়,

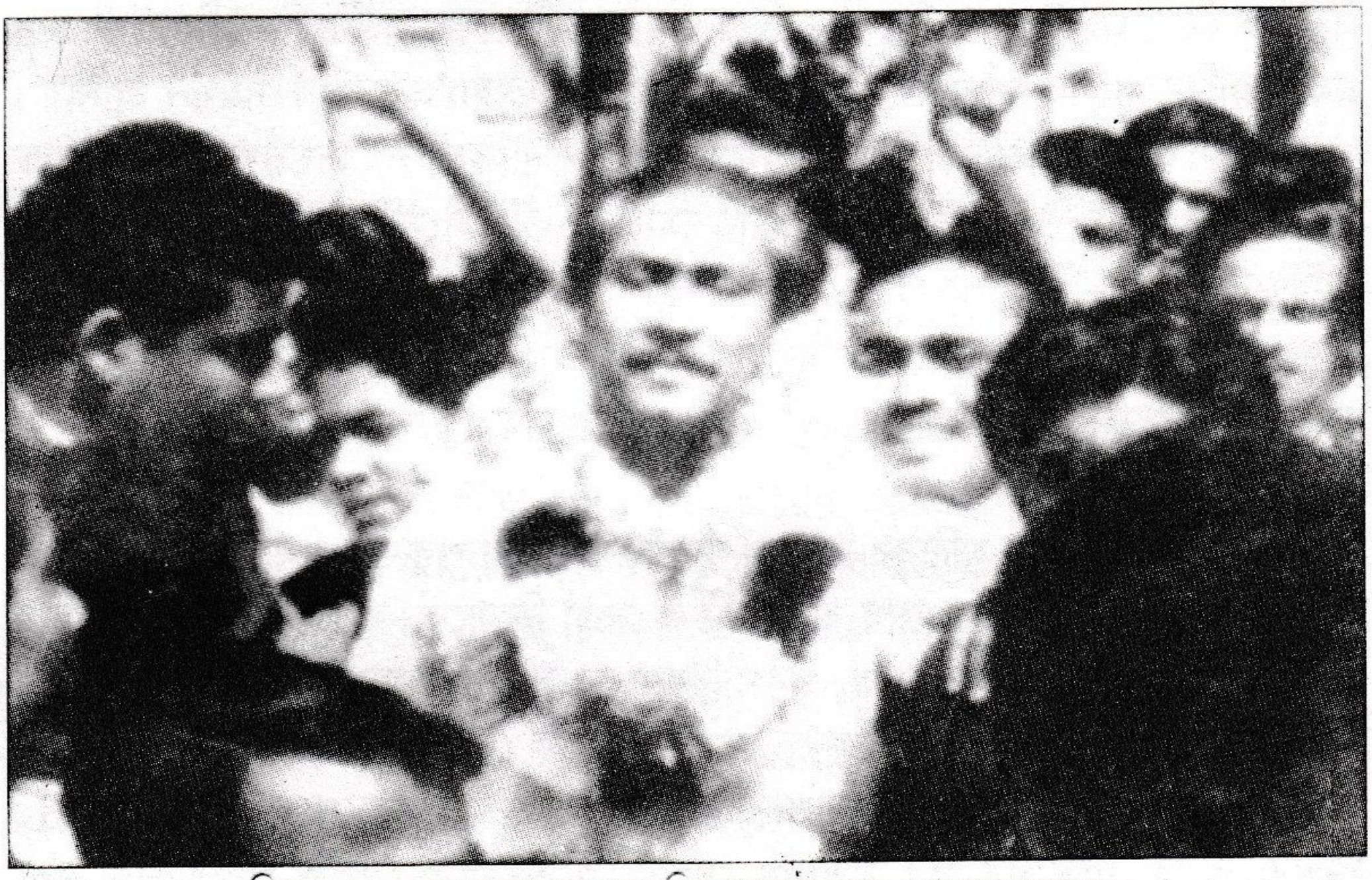
'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। ১১ আগস্ট রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার কাজ শুরু হবে এবং কার্যবিবরণী সেখানে রাখা হবে। অভিযুক্তকে তাঁর পক্ষে সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে এবং নিজ পছন্দ অনুযায়ী কোসুলী নিয়োগের (অবশ্যই তাঁকে পাকিস্তানি নাগরিক হতে হবে) সুযোগসহ নিয়ম অনুযায়ী অন্য সকল সুবিধা দেওয়া হবে।'

এ খবর ঘোষণার পরপরই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রি শরণ সিং দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, *'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠান মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং গোটা বিশ্বে নিন্দিত হওয়ার দাবি রাখে।'* ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায় একটা কিছু করার জন্য ২৪টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের কাছে চিঠি লেখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, *'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে-কোনো বিচারের সংক্ষিপ্ত আয়োজন পূর্ববাংলার সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত করবে।'*

জাতিসংঘ মহাসচিব উ. থান্ট এক বিবৃতিতে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্যে যা ঘটবে পাকিস্তানের বাইরে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।' জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরিকল্পিত বিচারের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আরো অনেক দেশের নেতৃবৃন্দ। ভারতসহ কয়েকটি দেশের পার্লামেন্টে তাঁর মুক্তি দাবি করে প্রস্তাবও গ্রহণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রি চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, সেপ্টেম্বরে বেরিয়ে পড়লেন ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে। সেখানে বন্ধু দেশগুলোর কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার বন্ধের জোরালো দাবি জানালেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানি কারাগারে। বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিতভাবে তাদের নেতাকে ফিরে পেতে চাইছিলো। এ সময় টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইন্দিরা গান্ধী জানান,

'I don't think we can put many pressure. We have appealed to all the world governments through our embassions, and I have written personally to everybody, I think, we sencerely hope that my will exert some pressure. I saw this morning that American government is claiming some credit for the cease fire, so I hope that they will look at this aspect.'

জ্যাক এন্ডারসন পেপার সাক্ষ্য দেয় যুদ্ধবিরতির ন্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ইয়াহিয়া খান সে চাপকে আমলে নেন নি। জুলফিকার আলী ভুট্টো রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ভেবেছেন যে, দেশ চালাতে হলে আমেরিকাকে অখুশি করা যাবে না। পাকিস্তানের ভাঙন ও যুদ্ধের পরাজয়ের দায় ইয়াহিয়া খানের উপর চাপিয়ে দিয়ে খণ্ডিত পাকিস্তানের নতুন শাসক ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে নিজের অপরাধ আড়াল করতে চাইলেন। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ মুক্তি পেলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।



চিত্র : ১৮। জনতার দেওয়া বিজয়মালা পরে আছেন বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একাধিক ফ্রন্ট ছিলো। প্রথম ফ্রন্ট দেশের অভ্যন্তরে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ। দ্বিতীয় ফ্রন্টে ছিলো পাকিস্তানিদের অপপ্রচারের জবাবে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' এবং সে সময় মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা। কিন্তু এর বাইরে সারা বিশ্বে যে ফ্রন্টটি সচল ও সক্রিয় ছিলো তা হলো 'বিশ্ব গণমাধ্যম'। রাষ্টীয়ভাবে খুব কম দেশই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি সমর্থন সহযোগিতা করেছে। বেশির ভাগ দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে ইয়াহিয়ার সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ করলেও তা করেছে কূটনীতির ভাষায়। কিন্তু বিশ্ব জনমতের প্রধান বাহন সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেছে। ধিক্কার জানিয়েছে পাকিস্তানি শাসকচক্রের গণহত্যা এবং সেনা অভিযানকে। একই সঙ্গে তাদের নিবন্ধে, রিপোর্টে ঘুরে-ফিরে এসেছে বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম। দেশের মানুষের কাছে যেমন তেমনি বিদেশিদের কাছেও বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একাত্তরে। এখানে কয়েকজন সাংবাদিকের সে সময়কার সাহসী মন্তব্য ও রিপোর্ট তুলে ধরা হলো,

মাতৃভূমিকে পশ্চিমপাকিস্তানের একটি উপনিবেশ দেশকে স্বাধীনতার জন্য বর্তমানের চমকপ্রদ নাটকীয় যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার ঘটনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একদিনের ইতিহাস নয়। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি তার লক্ষ্য ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগই তোলা যাক, তাঁকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী বলা যাবে না।'

(সিরিল্ ডন্, টাইম ম্যাগাজিন, ১৯৭১)

'তিন সপ্তাহ আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর সে দেশে প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো জাতির জন্য একটি নতুন সংবিধান উপহার দেওয়া এবং জাতীয় সংসদ গঠন। পূর্বপাকিস্তানের পক্ষে তারা অভূতপূর্ব সমর্থন জানায়। ৫১ বছর বয়স্ক আওয়ামীলীগ প্রধান এবং পূর্বপাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনমতের আগ্নেয় উদ্যোক্তা পাকিস্তানের মোট ৩১৩টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের ১৬৭টিতে জয়লাভ করেন। এটি মুজিবের নীতিমালার বিপুল সমর্থনের প্রকাশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে এ বিজয়ের মানে মুজিবই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি। কিন্তু ব্যাপারটি ইয়াহিয়া প্রত্যাশা করেন নি।'

(টাইম ম্যাগাজিন, ২ আগস্ট, ১৯৭১)

'বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বিশ্বব্যাপী তাঁর পরিচয় রয়েছে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। অধিকাংশ কূটনীতিবিদ এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্বপাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো এর পরিচালনার নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেওয়া—যে কাজের জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেনাশাসক তাঁকে বন্দি করে রেখেছে গোপন স্থানে। সম্ভবত তাঁকে বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরাও—যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, বন্দি করে (গৃহবন্দি) রাখা রয়েছে। এ দমননীতি শুধু তাঁর আওয়ামীলীগের উপর নয়, সামরিক কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজন যে-কোনো রাজনীতিকের উপরই চাপিয়ে দিচ্ছে।'

(ম্যালকম এমব্রাউন্, নিউ ইয়র্ক টাইম্স, অক্টোবর ১১, ১৯৭১)

কিন্তু এ ভীতি বা বিদ্বেষ আশ্চর্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কড়া হুকুমে এবং ঐকান্তিক ব্যবস্থায় মিইয়ে যায়। আমরা একটি অভূতপূর্ব এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। একজন রাজনৈতিক নেতার নির্দেশাবলি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিচ্ছে। এ নির্দেশাবলি প্রয়োগের জন্য এ নেতার কোনোই বাহিনী বা প্রশাসন ছিলো না। আওয়ামীলীগের অসংগঠিত কর্মীগোষ্ঠী এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কোথাও অনুনয় করছে, আবার কোথাও নেতার হুকুম মানতে বলছে; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত এ নির্দেশ মানার পেছনে ছিলো পারস্পরিক বিশ্বাস এবং বাঙালি জাতির ও নেতার মধ্যে একটি অলিখিত অথচ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠার অঙ্গীকার।' *পেগি ডারডিন, নিউ ইয়র্ক টাইমস ১৮৭১* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ এর টাইম এর মূল্যায়ন ছিলো :

`The history of Indian sub-continent for the past half century has been dominated by leaders who were controversiah as they were charismatic :

Mahatma Gandhi, Mohammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru. Another name now seems likly to join that list : Sheikh Mujibur Rahman (Mujib), the Prime Minister of Bangladesh. To his critics, Mujib is vituperalive, imtrustworthy rabble-rowser. To most of the people of his new nation, he is a patriot-hero whose imprisonmant by West Pakistan has only enhanced his appeal. He is a great man before. Says an Bangladesh official, but those bastards have made him even greater."

অহসযোগ আন্দোলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভুট্টোর তুলনামূলক আলোচনা করে টাইম লিখেছিলো :

'Bhutto is pro-chinise and anti Indian : Mujib product of a middle class village family; is pro-western and would like to make place with India. More important, most of west Pakistan's capitalists, bourucrats and army officers support Bhutto who opposes Mujib's six points because they would destroy Pakistan's unity and his own ambitions.'

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, টাইমস-এর পিটার হ্যাজেলহস্টিকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের কিছু শহরে রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে যে বিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে তা আসলে চায়ের কাপে ঝড় মাত্র। ঢাকার বিক্ষোভকারীদের উপর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে যে হত্যা ও সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে এবং নেতাদের অনেককে জেলে নেওয়া হচ্ছে—তা বিক্ষোভের মাত্রাকে কমিয়ে আনবে এবং আরো যুক্তিসঙ্গত আপোস মীমাংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করবে।'

ভুট্টো মোটেই সত্য বলেন নি। তিনি জানতেন বাঙালিদের আন্দোলনের শক্তি কী প্রচণ্ড। কোনো ট্যাঙ্ক মেশিনগান দিয়েও তা দমন করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে তার পূর্ববর্তী মূল্যায়ন ছিলো :

'বাংলায় একটি পরিবেশ সূচিত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা একজন নায়ক খুঁজছিলো। পারিপার্শ্বিকতা এ ভূমিকা পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বেছে নিয়েছিলো। তিনি একটি বিরল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর মাঝে অগ্নিস্ফুলিংগের ন্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করার অসাধারণ ক্ষমতা থাকলেও মহান বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ দ্রুত উত্থান বিগত দুই সরকারের ভুল হিসাব ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই তা সম্ভব হয়েছিলো।'

সামরিক চক্রের সঙ্গে ভুট্টোর আঁতাত বহুদিনের। বিশেষ করে প্রভাবশালী কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে তার সখ্য ও সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। এ সম্পর্কে জি. ডব্লিউ. চৌধুরী তার 'Last days of United Pakistan' গ্রন্থে লিখেছেন,

'Bhutta-Peerzada alliance had a long history both were sacked by Ayub, and common hostility towards Ayub had made them good friends since 1966. Bhutta was also coming close to other members of the military junta such as Lieut. General Gul Hasan, Maj-General Omar who was a close friend and colleague of chief of the army, general Hamid, who had already started dreaming of becoming the third military President of the country, following Yahya just as Yahya had followed Ayub.'

একজন বামপন্থী কারাবাসীর উদ্ধৃতি দিয়ে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কর্মরত ও বাঙালির সুহৃদ সাংবাদিক এ.এল. খতিব জানান :

এমন কি কারাগারের মধ্যে ও তিনি ছিলেন নেতা। তিনি নিজেকে কখনো অন্যের উপর বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দিতেন না। তিনি আমাদের উদ্যমকে জিইয়ে রেখেছিলেন এবং আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহারে তাঁর একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। তিনি যখন কারাগার থেকে মুক্ত হলেন তখন কারাগারের সব কর্মচারী খুশি হতেন। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদেও ছিলেন। তিনি এতোটা দয়াবান ও স্নেহশীল ছিলেন।'

এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমেদের জীবনী কিংবা সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের জবানিতে। তারা দু জনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে জেল খেটেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাসে ভিন্ন মেরুর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভুট্টোর তুলনামূলক আলোচনায় Daily Telegraph এর Nicholas Tomaline জানান :

`A real heavy is Mr. Zulfiqar Ali Bhutto, West Pakistan's political leader, There is evidance that Mr. Zulfiqar Ali Bhutto deliberately sabotaged the negotiations between general Yahya and Sheikh Mujibur Rahman. He did so product West Pakistan interest—perhaps with a connivance of the army but it was also obvious that he did not welcome the prospect of playing second tiddle to Sheikh Mujib in a United Pakistan.'

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার অব্যবহিত পর আমেরিকার প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজউইক-এর সংবাদে বলা হয় :

"গত সপ্তাহে (মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁর কোনো কোনো সমালোচক বলেছিলেন, তিনি শুধু উগ্রপন্থী সমর্থকদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেছেন। ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে তিনি তলিয়ে যাওয়া থেকে শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এক অর্থে বলা চলে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে লড়াইয়ের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে মুজিব এক নতুন বাঙালি 'জাতি'-র সংগ্রামী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মুজিব ঢেউয়ের চূড়ায় অবস্থান করছেন বটে, কিন্তু তা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়।'

সিডনি শনবার্গের পর্যবেক্ষণ

মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গের বিশ্লেষণ হচ্ছে,

'বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগ যে তাদের ওপর পশ্চিমপাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ এক প্রজন্ম আগের ব্রিটিশ শোষণের চেয়েও নিকৃষ্ট। তিক্ততা চরম পরিণতি অর্জন করেছে দুটো ঘটনার ভেতর দিয়ে। প্রথমটি হলো গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও সরকারের গাছাড়া রিলিফ প্রচেষ্টা, বাঙালিদের দুর্ভাগ্যে পশ্চিমাদের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের স্বরূপ যা নাটকীয়ভাবে তুলে ধরলো। এক মাস পরে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানের জন্য অধিক স্বশাসন দাবিদার আওয়ামীলীগের নির্বাচনী প্রচারে এটা বাড়তি ভোট যুক্ত করলো।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো খোদ নির্বাচন—পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম সর্বজনীন ও স্বাধীন ভোট গ্রহণ। এ নির্বাচন সম্ভব করে তোলার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব খানের দশকব্যাপী শক্ত শাসনের অবসান ঘটেছিলো রক্তাক্ত দাঙ্গা ও প্রতিবাদ আন্দোলনে এবং বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা ছিলো ক্ষমতা অধিগ্রহণকারী ইয়াহিয়া খানের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। ... পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি আসন বাদে সব আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ, জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের (ইয়াহিয়ার আরেকটি ছাড়) কারণে তারা অর্জন করে জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাঙালিদের কেউ-কেউ মনে করেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই জেনারেলরা সামরিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আসল ব্যাপার সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। যাই হোক না কেন ঝড়ের কালো মেঘের আনাগোনার শুরু তখন থেকেই। পশ্চিমপাকিস্তানের অগ্রণী রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি দাবি তুলতে শুরু করে যে আওয়ামী লীগ তাদের স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচি কাটছাঁট করুক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সমর্থক উগ্রপন্থি ছাত্র-শ্রমিকদের চাপের মুখে এবং সম্ভবত সামরিক রক্তপাত ঘটাবার বিপদ সম্পর্কে কাঁচা ধারণা থেকে—আপোসরফায় রাজি ছিলেন না। তাঁর ভয় ছিলো সেটা করলে পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেনো-না-কোনোভাবে বাঙালিদের ঠকিয়ে ন্যায্যভাবে অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করবে।

এরপর পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো জাতীয় সংসদের আশু অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার জানান। নতুন সংবিধান রচনার জন্য ৩ মার্চ এ অধিবেশন বসার কথা ছিলো এবং আকস্মিকভাবে ইয়াহিয়া তা স্থগিত ঘোষণা করেন। পূর্বপাকিস্তান জুড়ে প্রতিবাদ ও সংঘর্ষের ঢেউ বয়ে যায়, বাঙালি জনসমাবেশের ওপর যথেষ্ট গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী, হতাহত হয়ে বহুজন এবং এরপর সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা এর জবাব দেয়। আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করে কার্যত একধরনের আওয়ামীলীগ সরকার প্রতিষ্ঠায়।'

'নিউজউইক' পরিবেশিত সংবাদে আরো বলা হয় :

"মুজিব মৌলিক চিন্তার অধিকারী বলে ভান করেন না। তিনি একজন রাজনীতির কবি, প্রকৌশলী নন। শিল্প কৌশলের প্রতি উৎসাহের পরিবর্তে শিল্পকলার প্রতি ঝোঁক বাঙালিদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কাজেই সকল শ্রেণি ও আদর্শের অনুসারীদের একতাবদ্ধ করার জন্য সম্ভবত তাঁর 'স্টাইল' (পদ্ধতি) সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিলো।"

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাস পর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'- এ প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়,

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় একটি চালু সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সারা দেশে গেরিলাদের অস্ত্র সমর্পণ, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের ভারত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ধাপে ধাপে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার-এসব নতুন বাঙালি প্রশাসনের জনপ্রিয়তা ও কার্যকারিতা প্রমাণ করে।"

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর'-এ প্রকাশিত এক সংবাদ সমীক্ষায় বলা হয়,

"বিজয় দিবসের আসন্ন প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বলা চলে, যারা বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকবে না বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো, তারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে।"

ডিসেম্বর মাসে জার্মানির প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য ওয়েল্ট'-এর সংবাদে বলা হয় :

"ঢাকা, চট্টগ্রাম অথবা কুমিল্লায়, এমন কি রাতের বেলাও পথচারীরা কোনো রকমের বাধাগ্রস্ত না হয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে। এসব শহরের রাস্তা-ঘাট জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট কিংবা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তা-ঘাটের তুলনায় অধিকতর বিপজ্জনক নয়। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা মুজিব। তিনিই রাষ্ট্রের সমন্বয়কারী শক্তি।"

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যার পরদিন 'দি টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বলা হয় :

"সব কিছু সত্ত্বেও শেখ মুজিব স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ জন্য তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশ কখনো বাস্তবে পরিণত হতো না"।

(দ্য টাইমস্, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিলো :

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গের মৃত্যু সংবাদ যদি সমর্থিত হয় তাহলে এ দেশে তা ব্যাপকভাবে দুঃখজনক বলে বিবেচিত হবে। মুজিব বহুল পরিচিত এবং শ্রদ্ধেয় স্টেটস্ম্যান (রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি) ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।"

(দ্য গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫)

বি.বি.সি. টেলিভিশনের দূরপ্রাচ্য সংবাদদাতা ব্রায়ান ব্যারন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার কয়েকদিন পর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে ঢাকা পৌঁছান। তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিনদিন আটক থাকার পর তাদের সবাইকে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে লিখিত তাঁর সংবাদ বিবরণীতে বলা হয়, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারিভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং জনসাধারণের হৃদয়ে উচ্চতম আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। এটা যখন ঘটবে, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর বুলেট-বিক্ষত বাসগৃহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারক-চিহ্ন এবং তাঁর কবরস্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত হবে।

(বঙ্গবন্ধু ও তার আমল–আবদুল মতিন)

একাত্তরের ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা যেমন বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছিলো তেমনি ১০ মাস পর তার মুক্তির বিষয়টিও তাদের নজর কেড়েছিলো। বিশ্ব গণমাধ্যমের কাছে তিনি ছিলেন বিজয়ী বীর। সুদানের 'লল আইয়াম, পত্রিকা ১০ জানুয়ারি লিখেছিলো,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার

অধিকার যার রয়েছে। (কারাগার থেকে) তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে পাক-ভারত যুদ্ধ এ অঞ্চলে যে ট্রাজেডি ঘটিয়ে চলেছে সে-সময়ে প্রকৃত সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে। এখানে ৭৪ মিলিয়ন বাঙালি তাদের অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের জন্যে সংগ্রামরত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর থেকেই তাদের এ সংগ্রাম চলছে। অসংখ্য মানুষ এখানে গুলিতে নিহত হয়েছে; জীবন দিয়েছে ক্ষুধা ও রোগ-ভোগে। শেখ, যাকে বাংলার মানুষ 'মুজিব, নামে ডেকে থাকে, তাঁর কারামুক্তির ভেতর দিয়ে ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির আশা পূর্ণ হয়েছে। জিন্দাবাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাঁর দেশ গৌরবান্বিত হোক।'

একদিন পর অষ্ট্রেলীয় দৈনিক দ্য মাদারি লিখলো,

'প্রবল আবেগ উচ্ছ্বাস ও উল্লাসে বিহ্বল এক জনতার সম্ভাষণের ভেতর দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বৃটেনের কাছ থেকে ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার ঘটনার পর এ আবেগ বিহ্বল ঘটনা উপমহাদেশে ঘটে নি। দেশে ফেরার সাথে সাথে সম্ভাষণের পাশাপাশি তাকে তাঁর নবলব্ধ স্বাধীন দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার সমস্যাসমূহেরও মুখোমুখি হতে হবে। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকেই উপেক্ষার শিকার। পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকরা এ দেশটির অর্থনীতিকে সবল করার জন্যে যে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োজন কার্যত তাঁর কিছুই করে নি। বাংলাদেশে যে গণবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর একটা প্রধান কারণই ছিলো পশ্চিমপাকিস্তানি শাসকদের নিজের প্রয়োজনে সম্পদ তুলে রাখা ও পূর্বপাকিস্তানের রক্ত শুষে খাবার অব্যাহত নীতি।'

১০ জানুয়ারি বিখ্যাত 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর ভাষ্য ছিলো :

'স্বাধীনতার অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে সে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা। মুজিবের দায়িত্ব হবে পরিপূর্ণভাবে একটি স্বাধীন ও সংহত দেশ হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত তাঁর দেশের—শক্তিসমূহকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে উদ্যোগী হওয়া। বর্তমানের উল্লাস যখন থেমে যাবে এবং দেশ গড়ার কঠিন দায়িত্ব সামনে বসে, তখনি বাংলাদেশ সে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে।

গতকাল পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর লন্ডনে অবতরণের পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নবগঠিত বাংলাদেশের জন্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আবেদন জানান। যে দেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান স্বীকৃতি বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ। আশা করা হচ্ছে এটি একটি ক্ষণস্থায়ী এবং যুক্তিপূর্ণ পরিস্থিতি। কিন্তু যেভাবে কোনো কোনো দেশ শীতলতার সাথে দেশটির স্বীকৃতির প্রশ্নটি বিবেচনা করেছে তা যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না।'

ব্রিটিশ সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকারেনহাস যিনি পাকিস্তান মর্নিং নিউজে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেন,

'জুলফিকার আলী ভুট্টোর চতুরতার সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে, তার ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সামরিক চক্রের স্বার্থের মিল রয়েছে। সুতরাং তিনি যদি হাতের চাল ঠিক মতো চালতে পারেন তাহলে দেশের শীর্ষপদে আরোহন করতে পারবেন। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি ভুট্টো শুরু থেকে ইয়াহিয়ার সব কৌশল জানতেন। তিনি ভুল ধারণা পোষণ করতেন যে, এসব কিছুই তার স্বার্থে লাগানো যাবে না এবং অবশেষে

প্রেসিডেন্টকেও পর্যুদস্ত করতে পারবেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং নিজের সম্পর্কে অতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ভুট্টো বুঝতে পারেন নি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পতন ঘটানোর জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যেভাবে প্রতারিত করছেন তা একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন করবে এবং প্রেসিডেন্টের কু-মতলব হাসিল হলে তিনি আর ভুট্টোকে ব্যবহার করবেন না।'



চিত্র : ১৯। শিশু শেখ রাসেল। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তার পিতার অপেক্ষায় বিমানবন্দরে।

৩ মার্চের প্রস্তাবিত অধিবেশনের আগে পেশোয়ারে এক পার্টিতে ভুট্টো নাকি সমবেতদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ভুট্টো আরেকবার ঘোড়ার জিনে পা বা খুনি ক্ষমতাসীনরাও তাই চান। মুজিবকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমিই পাকিস্তানের হবু প্রধানমন্ত্রি।' ভুট্টো ওয়ালি খানকেও তার পক্ষে আনতে চাইলেন। ওয়ালি খান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলে ভুট্টো তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, '৩ মার্চের অধিবেশনে তিনি যোগ দিচ্ছেন না।' ভুট্টোর এ কথার সমর্থন মিলে সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জি.এম. সৈয়দের ভাষ্যে। জি.এম. সৈয়দ জানিয়েছেন, 'শেষ পর্যন্ত ওয়ালি খান ৬ দফাকে সমর্থন করেন নি। তার ভয় ছিলো তাতে পাঠানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেশির ভাগ পাঠান শ্রমিক পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কর্মরত।'

এন্থনি ম্যাস্কারেন্হাস্ তাঁর বইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যক্রম ও বক্তৃতা বিবৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে,

'ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো পরস্পরকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আবার ভুট্টো ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তারা দু জনই প্রকাশ্য আলাপ-আলোচনার বাইরে একটি অলিখিত চুক্তিতে আসতে চেয়েছেন— সেটি হলো বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হলেন দাবিদার জুলফিকার আলী ভুট্টো। ইয়াহিয়ার সহযোগী জেনারেলরা অনেক আগে থেকে ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানোর ষড়যন্ত্র করে আসছিলেন। তাদের ভয় ছিলো কোনো বাঙালি নেতা ক্ষমতায় আসলে এবং বাংলাদেশ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

পেলে সামরিক বাহিনীর বাজেটই শুধু হ্রাস পাবে না, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেক কমে যাবে।

অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা ছিলো স্পষ্ট। হয় ৬ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে অন্যথায় এক সঙ্গে থাকার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আপাতত ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকদের কিছুটা সময় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক এবং রাজনীতিকরা সেই সুযোগটা হাতছাড়া করেছেন। গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতার কারণে। আরেকটি বিষয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার দায় নিতে চান নি। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিলো, আমরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন সংখ্যালঘিষ্ঠদের থেকে আলাদা হবে?'

এন্থনি ম্যাসকারেনহাস আরো জানিয়েছেন,

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। একটি বিষয় তিনি জোর দিতেন তাহলো গণতন্ত্রের প্রয়োজন। পরিষদের বাইরে কোনো গোপন শালায় সংবিধান প্রণীত হওয়া উচিত নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ মনোভাবও কখনো দেখান নি যে, তিনি সংখ্যাশক্তির বলে সংসদকে রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে সংবিধান পাস করিয়ে দেবেন।'

পাকিস্তানি কারাগারে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ব গণমাধ্যমের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তেমনি কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর। নবীন রাষ্ট্রের মুক্ত নেতা হিসেবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও গণমাধ্যমসমূহ তাকে অভিনন্দিত করেছেন। আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করেও দিয়েছেন।

১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ সাপ্তাহিক নিউজউইক লিখেছে,

'Thus Mujib may have to prove himself to his people all over again. He will have his undeniable charisma and over whelming prestige working for him. Still some Bengalis believe that those politicians who for made the Bangladesh government in exile during the absence will not lightly give up their power. They may try to set Mujib up as the Bangladeshi (Friend of Bangladesh) and then shuttle him off into a figurehead role. But those who know him best are convinced that unless prison has broken the man in spirit, Mujib will not be contend with anythimgs less than a central role in the tanion he was instrumental in creating.'

বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও পাকিস্তানি নেতা ভুট্টোর মধ্যে মিল ও অমিল দুটোই আছে। মিলের কথাটা আগে বলে নিই। তারা দু জনেই ছিলেন ব্যতিক্রমীভাবে সুবক্তা, বাগ্মিতায় সহজেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারতেন। তারা দু জনেই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের দুই স্থপতি—পূর্ববাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পশ্চিমপাকিস্তানে ভুট্টো জনগণকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হন বাংলাদেশের স্রষ্টা, আর ভুট্টো বনে যান খণ্ডিত পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্তা। সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো তারা দু

জনই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করলেও শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেষ পর্যায়ে সেই সংসদীয় গণতন্ত্র পরিহার করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। আর ভুট্টো জবরদস্তি করে জিততে চাইলেন ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে। তারা দু জনই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি ছিলেন হৃদয়হীন। দু জনের জীবনের উত্থান যেমন সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে, আবার সামরিক শাসক ও কুচক্রীদের হাতেই দু জনকে জীবন দিতে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম ১৯২০ সালে। ভুট্টোর জন্ম ১৯২৩ সালে। জন্মের মতো তাদের মৃত্যুও কাছাকাছি সময়ে। ১৯৭৫ সালে কতিপয় পথভ্রষ্ট সেনা অফিসারের চক্রান্তে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তার মাত্র চার বছর পর ১৯৭৯ সালে এক হত্যা মামলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ভুট্টোকে হত্যা করে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক।

১৯৭১ সালে সাবেক গভর্নর হাউসে (বর্তমান সুগন্ধা) সামরিক চক্রের সঙ্গে জোটবাঁধা ভুট্টোকে সতর্ক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করো না। ওরা প্রথমে আমাকে ধ্বংস করবে, তারপর তোমাকে মেরে ফেলবে।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী এমন নির্মম সত্য হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি।

তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভুট্টোর চরিত্রের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল যথেষ্ট আছে। ভুট্টো ছিলেন অসম্ভব ধূর্ত, ক্ষমতালিপ্সু। ক্ষমতালিপ্সার কারণেই তিনি অক্সফোর্ড থেকে দেশে ফিরে এসে স্বাধীন আইন ব্যবসা না করে সামরিক শাসকের পরামর্শকের ভূমিকায় নেমে পড়েন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবিদের বরাবরই প্রাধান্য ছিলো। সে কারণে সিন্ধি হয়েও ভুট্টো নিজেকে কখনো সিন্ধি বলে পরিচয় দিতেন না; পাঞ্জাবিদের সখ্য ও সেবাই ছিলো তার পছন্দের। ভুট্টো ক্ষমতায় গিয়ে রাজনীতি করেছেন, ক্ষমতাসীন দলের সেক্রেটারি হয়েছেন, জেনারেল আইয়ুবকে ফিল্ড মার্শাল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার চেয়ে জরুরি হলো ভুট্টো জেনারেল আইয়ুবের শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন অভিনব মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে। এ মৌলিক গণতন্ত্রের জন্য আইয়ুবকে সর্বাধিক নিন্দা কুড়াতে হলেও তার উদ্ভাবক ছিলেন লারকানার জমিদার তনয় জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনিই আইয়ুবকে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন, আবারো সেই যুদ্ধের পরাজয়ের দায়-দায়িত্ব সমস্তটাই আইয়ুবের উপর চাপিয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন। শাসনকালের প্রথম পর্বে তিনি আইয়ুবকে যেসব পরামর্শ দিয়েছেন পরবর্তীকালে তার প্রত্যেকটি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

ভুট্টো যখন উপলব্ধি করলেন আইয়ুবের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী, তার কাছ থেকে নতুন কিছু পাওয়ার নেই তখনই তিনি আইয়ুবের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। ভুট্টো ভালো করেই জানতেন পাকিস্তানে ক্ষমতার উৎস সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর বড় অংশ পাঞ্জাবি। অতএব আইয়ুবকে ত্যাগ করলেও ভুট্টো সেনাবাহিনীকে ত্যাগ করলেন না। আইয়ুবের কনিষ্ঠ অফিসার ও কমান্ডারদের সঙ্গে দহরম-মহরম শুরু করলেন।

অনেকে বলেন, 'ভুট্টো, আসলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীরই তৈরি।' পূর্ববাংলার স্বাধিকারকামী মানুষের বিরুদ্ধে নবপ্রজন্মের একজন বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয় ব্যক্তির প্রয়োজন ছিলো—কেননা পূর্বপ্রজন্মের নেতারা ইতোমধ্যে বাতিল হয়ে গেছেন।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর জন্ম বাংলার গ্রামে গোপালগঞ্জের টুংগিপাড়ায়। এ জন্য তিনি গ্রাম-বাংলাকে চিনেছেন, গ্রামের মানুষকে চিনেছেন। পড়াশুনার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, ছাত্রবয়সে মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্তও হয়েছিলেন। তাঁর পেছনেও তার একটি যুক্তি আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মনে করতেন, 'আমি যে সম্প্রদায়ের মানুষ সেই সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মধ্যে থেকেই তাদের দাবি ও অধিকার আদায় করা সম্ভব। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়।' চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশির ভাগ মুসলমান তরুণ ছিলো মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সদস্য।

অন্যদিকে ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবনেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে কদাচিৎ মিল ছিলো। একজন সিন্ধুর ভূ-স্বামী পুত্র। আরেকজন সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত সন্তান। ভুট্টো রাজনীতিতে এসেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, মুজিব রাজনীতিতে এসেছেন জীবন সংগ্রামের অংশ হিসেবে। কিন্তু দু জনেরই মৃত্যু হয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর সঙ্গে আপোষ না করে মারা গেছেন, আর ভুট্টো আপোষ করেও তাদের হাতে জীবন দিয়েছেন।

গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কেরা সর্বগুণের অধিকারী হয়েও নিজের অজ্ঞাত এমন কোনো ভুল করেন যা তাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও কি তেমন কোনো ভুল করেছিলেন? তবে ইতিহাস অবশ্যই তা বিচার করবে। কারণ ইতিহাস কাউকে ছাড় দেয় না।

সপ্তম অধ্যায় : পশ্চিমপাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

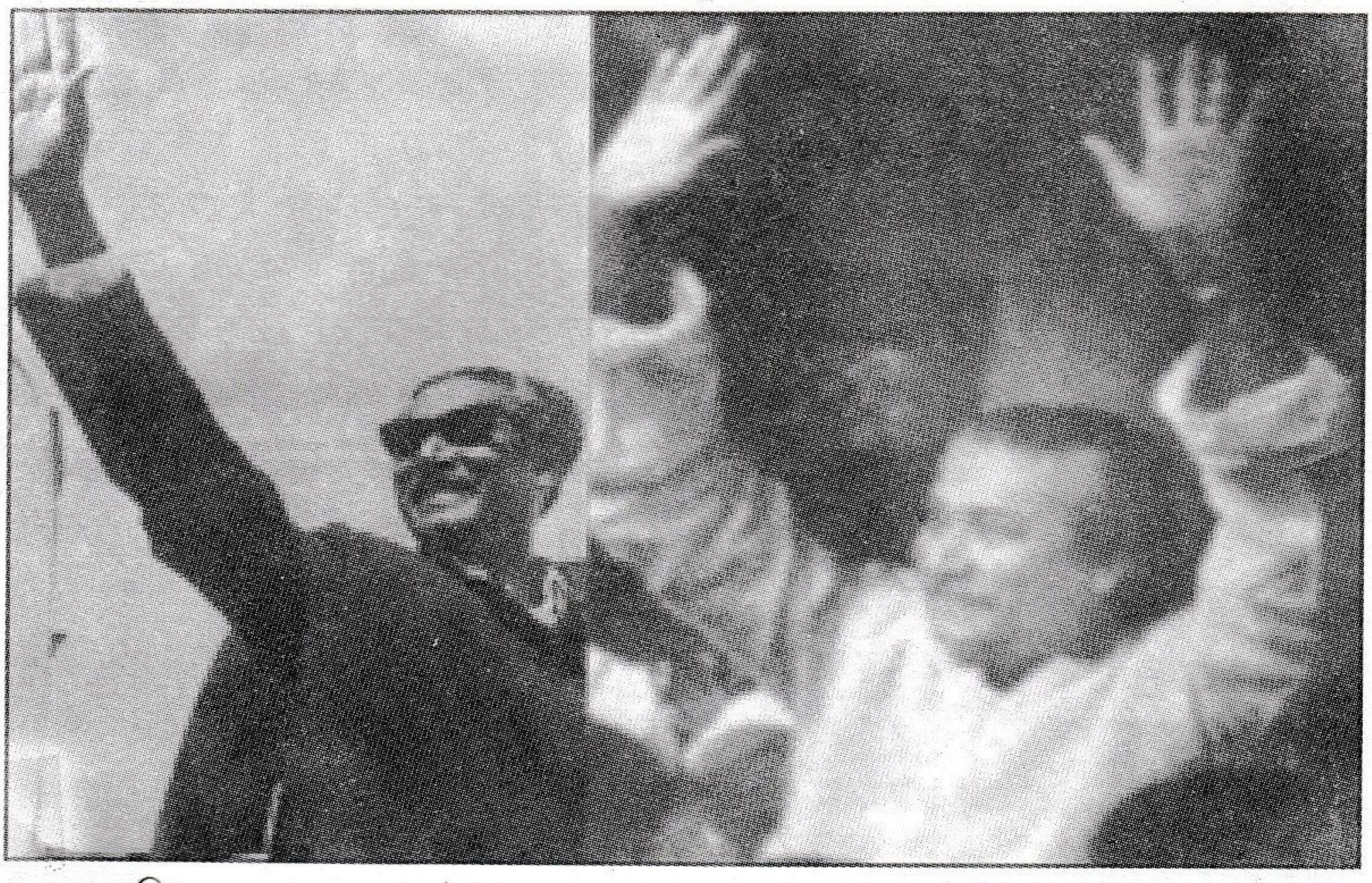
এক.

একথা সত্য যে, আজো পাকিস্তানিরা তাদের মতো করে একাত্তরের ঘটনার ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ইতিহাস লিখছে এবং সেই ইতিহাসগ্রন্থ পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যাপক হারে প্রচারও করছে। যার উদ্দেশ্য একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী যে গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালিয়েছে তা আড়াল করা। বেশির ভাগ পাকিস্তানি লেখকের সাক্ষ্য হচ্ছে একাত্তরে বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয় নি। গণধর্ষণ হয় নি। মানুষের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন হয় নি। মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নি। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু লোকের যোগসাজশে ভারতই সেখানে আগ্রাসন চালিয়েছে। ফলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরপর মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন এ রকম উল্লেখযোগ্য কয়েকজন একাত্তরের পূর্বাপর ঘটনা বিবৃত করেছেন। জেনারেল নিয়াজি বই লিখেছেন, রাও ফরমান আলী লিখেছেন, সিদ্দিক সালেক লিখেছেন। লিখেছেন বেসামরিক আমলা হাসান জহিরও। এদের সকলের লেখার একটা কমন প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, বাঙালির প্রতি অন্যায় অবিচার হয়েছে তবে তা এমন নয় যাতে তারা স্বাধীনতার চিন্তা করতে পারে। তারা আরো বলতে চেয়েছেন যে, একাত্তরে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান বা গণধর্ষণ হয় নি। রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী যেটুকু প্রয়োজন অভিযান চালিয়েছে, তার বেশি নয়। বরং পহেলা মার্চের পর বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের লোকরাই বাড়াবাড়ি করেছেন। কেউ কেউ পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলীর উপর দোষ চাপিয়েছেন। কিন্তু সমরনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান কিংবা তার বরকন্দাজ হিসেবে এখানে নিয়োজিত জেনারেল নিয়াজি কিংবা রাও ফরমান আলীরা নাকি ছিলেন একেবারেই অহিংস প্রকৃতির জীব।

পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলারা যখন কথা বলেছেন, তখনো প্রত্যেকে নিজের সাফাই গেয়েছেন, পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব জাহির করেছেন। এমন কি প্রয়াত বেনজির ভুট্টো যিনি একাত্তরের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তিনিও গণহত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন নি। ছাপাখানার বদৌলতে পাকিস্তানি এসব ইতিহাস রচয়িতাদের বইগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। এদেশের অনেক ইতিহাসবিদ ও পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের অপকীর্তি তুলে ধরেছেন তার বিভিন্ন লেখায়, সাক্ষাৎকারে। পাকিস্তানি নেতা আমলা বা সামরিক কর্মকর্তা-কেউই নিজের দোষ স্বীকার করেন নি। প্রত্যেকের বইয়ে একাত্তরের ঘটনাবলিতে অন্যকে দায়ী করে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছেন নিজেকে।

কিন্তু এ সুলভ ইতিহাসের বাইরে পাকিস্তানিরা তাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে দুর্লভ ইতিহাস শেখাচ্ছেন তা কেবল অভিনব নয়, বিস্ময়করও। পাকিস্তান টেক্সট বুক বোর্ড প্রণীত এসব ইতিহাসে বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়কেই স্বীকার করে নি। এটি নাকি ছিলো স্থানীয় হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ও ভারতের আগ্রাসনের ফসল। বাংলাদেশকে অস্বীকার করতে গিয়ে এ ইতিহাস প্রণেতারা পাকিস্তানের '৭২ পূর্ব সকল ইতিহাসকেই ছাঁটাই করে দিয়েছেন। তারা ছাঁটাই করেছেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা। তারা ছাঁটাই করেছেন গুপ্ত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের কীর্তিও। এমন কি তাদের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামও কোনো গুরুত্ব পায় নি। পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের চোখে ইতিহাসের তিন নায়ক মুহাম্মদ বিন কাশিম, যিনি ভারতবর্ষ জয় করেছেন, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, যিনি পাকিস্তান অর্জন করেছেন এবং জেনারেল মোহাম্মদ জিয়াউল হক যিনি পাকিস্তানকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলেছেন। এর মাঝে বা আগে-পিছে কিছু নেই।



চিত্র : ২০। জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে সদা হাসি-খুশি থাকতেন বঙ্গবন্ধু।

পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের এ নব আবিষ্কার আমাদের দৃষ্টির বাইরেই থেকে যেতো যদি না মার্কিন তরুণ গবেষক ইভেত্তি সি রঁজ্যা আমাদের সামনে এসব তুলে না ধরতেন। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ আয়োজিত এক সেমিনারে রঁজ্যা 'পাকিস্তানের ইতিহাসবিদ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ১৩ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এ নিবন্ধটি আসলে তার দুই বছরাধিককালের গবেষণার নির্যাস। তার গবেষণায় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানিদের যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও মনগড়া ব্যাখ্যা উঠে এসেছে তা আমাদের শুধু বিস্মিত করে না, বিক্ষুব্ধও করে। একটি স্বাধীন দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এ ধরনের কুৎসামূলক বক্তব্য কোনো দেশের ইতিহাসবিদ দিতে পারেন ভাবতেও কষ্ট হয়। করাচিস্থ ইরতিকা ইনস্টিটিউটের গবেষক রাহাত সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইভেত্তি রঁজ্যা বলেন,

'স্কুল পর্যায়ে ইতিহাসের শিক্ষকরা সজাগ যে, পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে যা পড়ানো হয় তা শুধু স্ববিরোধীই নয়, অনেকাংশে অসত্যও। পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধের সময়ে কী ঘটেছে তার কোনো উল্লেখ নেই। কেউ এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ফাঁস করলে তাকে অবশ্যই চাকরি হারাতে হবে।'

রাহাত সাইদ আরো বলেছেন, শিক্ষকরা যে সত্যের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, তা তাদের অজানা নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই।

কায়েদে আজম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এ.এইচ. নায়ার জানান, 'অতীতের পুনর্মূল্যায়ন বা সমালোচনা নয়, আনুগত্যের সঙ্গে সবকিছুকে (রাষ্ট্রের) স্বীকার করাকেই পাকিস্তানি আদর্শ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' একাত্তরের ঘটনাবলি সম্পর্কে ইভেত্তি রঁজা জানান,

'পাকিস্তানি পাঠ্যবই ও ধর্মীয় নেতারা যে একাত্তরের পুরো ঘটনাটিকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে জোরেশোরে প্রচার করে, মানুষ সেটা বিশ্বাসও করে। কেননা বেশিরভাগ পত্রিকা বিশেষ করে উর্দু ভাষার পত্রিকাগুলো তাদের কাছে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যই প্রচার করেছে। পাকিস্তানের কোনো পত্রিকায়ই একাত্তরের সামরিক বাহিনীর অভিযান ও সহিংসতা সম্পর্কে কিছুই লেখে নি। এ সময়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা সম্পর্কেও পাকিস্তানের মানুষ কিছু জানতো না। ফলে ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে তখন সেটিকে তারা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীর ছল-চাতুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই চিহ্নিত করে।'

আরো মজার ঘটনা হচ্ছে, আগে এক দশক আগে কারগিলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের অভিযানকে পাকিস্তানি পত্রপত্রিকা একাত্তরের প্রতিশোধ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তানি যুদ্ধ কিংবা একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কখনোই পাকিস্তানি জনগণকে প্রকৃত তথ্য জানতে দেওয়া হয় নি। যদিও ইদানিং কোনো কোনো পত্রিকায় দেশ ভাগ হয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি পত্রিকা শিরোনাম দিয়েছে, "নেওয়াজ শরীফের নীতি সিন্ধুকে আরেকটি বাংলাদেশে পরিণত করবে।"

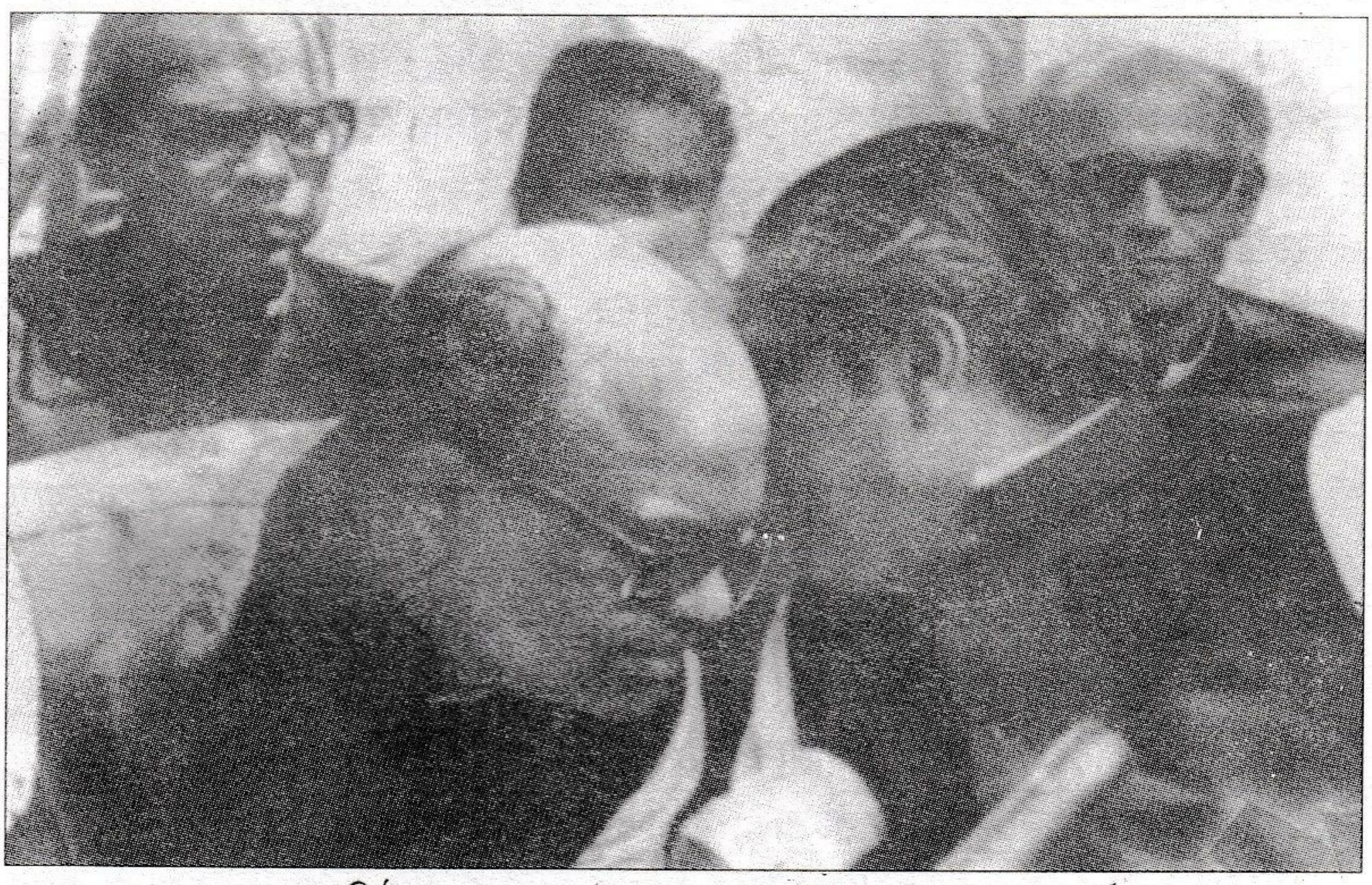
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নীতি হলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেটুকু রাখা এবং তার বাইরের সব কিছু ছেঁটে ফেলা। লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক এভারিল পাওয়েল্ বলেছেন, 'একটি ঐতিহাসিক গন্তব্যে পৌঁছার জন্যই পাকিস্তানি ইতিহাস 'নবায়ন' করা হচ্ছে। রাজনীতির এ বিকৃতির কারণে বঞ্চিত হচ্ছে সেখানকার কারিকুলাম এবং শিক্ষার্থীরা। ইতিহাসের এ ভ্রান্তি কীভাবে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের বিবরণ।

ঘটনার ৪৫ বছর পরও পাঠ্যবইয়ে সাধারণ নাগরিকদের কাছে '৬৫ সালের কল্পিত ঘটনাই প্রচার করা হচ্ছে। এমন কি যে সামরিক অভিযান এ যুদ্ধের সূচনা ঘটায় সেই জিব্রাল্টায় পাকিস্তানি বাহিনীর অপরিকল্পিত অপারেশন ভারতকে লাহোর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ের ভাষ্য হলো ভারত বিনা উস্কানিতে

একতরফা আক্রমণ চালায় এবং একজন পাকিস্তানি সৈন্য ১০ জন ভারতীয় সৈন্যকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।'

পাকিস্তানের বহু মানুষ এখনো বিশ্বাস করে কারগিলেও পাকিস্তান জয়ী হওয়ার পথে ছিলো এবং কাপুরুষোচিত ভারতীয় বাহিনী আগে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা এ ধারণাই দিচ্ছিলো যে, কারগিলে পাকিস্তানের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আকস্মিক আলোচনার প্রস্তাব তাদের সেই আশাকে গুড়িয়ে দেয়। এ জন্য বরাবরের মতো তারা এক শ্রেণীর পাকিস্তানি নেতাকে দোষারোপ করেন। এ নেতাদের কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় হাতছাড়া হয়ে গেলো।

১৯৭১ সালে জেনারেল নিয়াজী, যিনি বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর প্রধান ছিলেন, দাবি করেছেন তার বাহিনী গঙ্গা পার হয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অগ্রাভিযান চালিয়ে দিল্লি দখল করে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে করিডোর স্থাপন করবে। তার ভাষায়, 'আমি সামরিক শক্তিবলে এ করিডোর স্থাপন করে কায়েদে আজমের স্বপ্ন সফল করবো।' একইভাবে কারগিল যুদ্ধের সময়েও পাকিস্তান সমর্থিত মুজাহিদ নেতা বলেছেন, 'প্রথমে আমরা কারগিল দখলে নেব, তারপর শ্রীনগর, তারপর দিল্লি অভিমুখে আমাদের বিজয় অভিযান চলবে।' অথচ সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী কীভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন।



২১। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ও বন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসরামের সাথে পরামর্শ করছেন।

ইভেত্তি রঁজ্যার মতে, 'পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ের আরেকটি বড় সমস্যা হলো পাকিস্তান আন্দোলন পথে বাঁধা, আন্দোলনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বিপরীত অবস্থানের কিছুকে তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়। স্বাভাবিকভাবেই তারা ভারতে বৌদ্ধিক আমল, গুপ্ত আমলের উপর জোর দেয় নি। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং সাবেক পূর্বপাকিস্তানের বা পূর্ববাংলার প্রসঙ্গও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।' ১৯৯৯ সালে

রাব্বানী ও সাঈদ প্রণীত পাঠ্যবইয়ে দেশের (পাকিস্তানের) পূর্বাংশের বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে 'ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট ও সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ পর্যায়ের এ পাঠ্যবইয়ে বলা হয়,

'স্বাধীনতার পর থেকে পূর্বপাকিস্তানের নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে জিম্মি ছিলো, যারা হিন্দু শিক্ষকদের যোগসাজশে রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত করেছে এবং পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রদের মধ্যে বিষাক্ত প্রচারণা চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ হলো সেই বিষাক্ত প্রচারণার ফল, যা বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিবর্গ ও হিন্দুপন্থী শিক্ষকরা পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছে।'

রজাঁর আরো জানিয়েছেন, 'অধিকাংশ পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে আওয়ামীলীগের ৬ দফার কোনো উল্লেখ নেই, নেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনী রায় বানচালের কথাও।' বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে পাকিস্তানি সকল পাঠ্যবইয়ে অভিন্ন ভাষ্য হলো : 'চির শত্রু ভারতই পূর্বপাকিস্তানিদের প্রভাবিত করে হিন্দু সংখ্যালঘুদের দলভুক্ত করে বিনা উস্কানিতে সামরিক অভিযান চালিয়ে মাতৃভূমিকে বিভক্ত করেছে।' পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে দেশভাগের জন্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের দায়ী করা হলেও বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের পাঠ্যবইয়ে রয়ে গেছেন উপেক্ষিত।

পাকিস্তানি ইতিহাসবিদদের মতে, 'পাঠ্যপুস্তকে পাকিস্তানি আদর্শকে টিকিয়ে রাখার যথেষ্ট উপাদান না থাকার কারণেই ১৯৭১ সালের বিপর্যয় ঘটেছে।

ড. মোহাম্মদ সরওয়ারের ভাষ্য হচ্ছে,

> *'চৌকস রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত চালাকি ও কূটকৌশলের মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে নিজের পক্ষে নিয়েছে। বিশেষ করে সত্তরের দশকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই আদর্শের সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠে। যার পরিণতিতে পাকিস্তানকে পূর্বাংশে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ট্র্যাজেডি বহন করতে হয়। আদর্শের বন্ধনকে সুদৃঢ় করেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা ঠেকানো যেতো, কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি।'*

যেসব ইতিহাসবিদ বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং চব্বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমপাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা করেছেন, তারাও বিচ্ছিন্নতাকে সহজভাবে মানতে পারেন নি। জেনারেল ইয়াকুব খানের উদ্ধৃতি দিয়ে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যবই রচয়িতা আকবর এস আহমদ লিখেছেন,

> *'পঁচিশে মার্চের সেনা অভিযানের পূর্বে পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে মূল্যবান ও ভঙ্গুর চীনা মিং ফুলদানির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা মুজিবুর রহমান সেই ফুলদানির উপরই বসেছিলেন। সেই ফুলদানি থেকে তাকে তাড়াতে হবে, কিন্তু কোনোভাবেই যেনো ফুলদানিটি ভেঙে না যায়।'*
>
> *তার কয়েক মাসের মধ্যে তার (ইয়াকুব খান) সহকর্মীরা সেই কাজটিই করলেন। তারা সজোরে আঘাত করে ফুলদানিটি ভেঙে ফেললেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অক্ষত থেকে গেলেন।'*

১৯৯৭ সালের পাকিস্তানি পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের এ মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি নির্দয়ভাবে খর্ব করা হয়েছে। আকবর এস. আহমদের বইয়ে ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার নির্বাচনের কথা আছে, কিন্তু জাতীয় পরিষদ বাতিল করা কিংবা ভুট্টোর রাজনৈতিক চাল সম্পর্কে কোনো কথা নেই। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ভারতের চালাকি ও বাঙালিত্বের পুনরুদ্ধার প্রবণতাকে দায়ী করা হয়েছে। আহমেদ বিভিন্ন পত্রপত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা উল্লেখ করে বলেছে, বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান সমস্যার সমাধান হয় নি। কিন্তু তিনি করাচির শহরে হরহামেশা প্রকাশ্য বন্দুকযুদ্ধ ও গোটা পাকিস্তানের নৈরাজ্যকর অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলেন নি।

জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি ও রাও ফরমান আলীর ভাষ্য

পাকিস্তান ইস্টার্ন কামান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং ১৬ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণকারী সেনাপতি লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজিও একাত্তরের সময়কার ঘটনাবলি নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এ বইয়েরও প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলি ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান। ঢাউস আকারের 'The Betrayal of East Pakistan' শিরোনামের বইটিতে নিয়াজি পাকিস্তান ভাঙার জন্য মূলত ভুট্টোকে দায়ী করেছেন। এ বইয়ে তিনিও অন্যান্য পাকিস্তানি লেখকের মতো পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গিটিই তুলে ধরেছেন। তারপরও নিয়াজির বইয়ে, ১৯৭১ সালে ক্ষমতা নিয়ে পিণ্ডি ও লারকানায় যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র হয়েছিলো তার অনেক কিছুই বিবৃত হয়েছে। বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় 'যে ঘটনাপ্রবাহ বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে গেছে'-এ প্রসঙ্গে এ. কে. নিয়াজি লিখেছেন,

'নির্বাচন (সত্তর)-এর পরপরই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপজ্জনক দিকে মোড় নেয়। পাকিস্তানের দুই অংশে কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় ক্ষমতা নিয়ে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোর মধে লড়াইটা জোরদার হয়। অনমনীয় মনোভাব এবং মানিয়ে চলতে না পারার বিষয়টি ইতোপূর্বের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। দুই অংশের নেতারা বিরোধের দিকে অগ্রসর হন। রাজনীতিতে আপোস-সমঝোতার সদিচ্ছা ও মানিয়ে চলার সুযোগ তিরোহিত হয়।

ভুট্টো বিরোধী শিবিরে বসতে রাজি ছিলেন না। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান প্রণয়নের পরামর্শ দিলেন। ভুট্টো এমন আচরণ করতে থাকলেন যেনো তাঁর দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সরকার গঠনের কাছাকাছি রয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অধিক আস্থাশীল হয়ে উঠলেন। ৬ দফার প্রশ্নে তিনি আরো কঠোর অবস্থান নিলেন। জনাব ভুট্টো মুজিবের বিজয়কে স্বীকৃতি দিলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু-পাকিস্তানের ক্ষমতার দূর্গ। অতএব সংবিধান প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে তাঁর দলের পূর্ণ সহযোগিতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর ফলে জাতির গতিপথ বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করলো। মুজিব ছিলেন অবাধ্য, ভুট্টো ক্ষমতার বুভূক্ষু। ইয়াহিয়া পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রি হিসেবে অভিহিত

করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নরম করতে চাইলেন। কিন্তু মুজিব ফাঁকা কথায় নিবৃত্ত হওয়ার লোক নন। তিনি ইয়াহিয়াকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বপ্ন দেখছেন। আশাহত ইয়াহিয়া ভুট্টোর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। নিজস্ব পারিষদবর্গসহ তিনি লারকানায় গেলেন হাঁস শিকারে, এই লারকানায়ই ষড়যন্ত্রের নীলনকশা প্রণীত হয়।'

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বানচাল করার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে দিয়ে এ.এ.কে. নিয়াজি লিখেছেন,

'১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। পরদিন পি.পি.পি. কর্মীরা লাহোরে, আওয়ামীলীগ অফিসে হামলা চালায় এবং দলের পতাকা পুড়িয়ে দেয়। পরে ইয়াহিয়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার ঘোষণা দিলে ভুট্টো তাতে সায় দেন নি। তিনি ঘোষণা করলেন, একটি পার্টির তৈরি সংবিধান অনুমোদন করতে আমরা জাতীয় পরিষদে যেতে এবং নাজেহাল হয়ে ফিরে আসতে পারি না। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো লাহোরে তাঁর সমর্থকদের জানিয়ে দেন, সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সমর্থন করলে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করা হবে। তিনি আরো বলেন যে, হয় পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা মেনে নাও অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে তাঁর বিচার করা হোক।

২২ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদে প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ বৈঠকে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার এবং সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল ইয়াকুব খান উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকেই সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদি ৬ দফা সংশোধনে ব্যর্থ হন তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর ইয়াকুব খান সদর দপ্তরে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। জেনারেল হামিদ পূর্বপাকিস্তানে আরো এক ব্রিগেড সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব করলে তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সেখানে রয়েছে। কিন্তু ঢাকা ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং ব্রিগেড পাঠানোর অনুরোধ জানান। এরপর দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য ঢাকা পৌঁছামাত্র ইয়াকুব খান পুনরায় জেনারেল হামিদকে টেলিফোন করে জানান যে, সৈন্য সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিক্ষুব্ধ এবং নতুন করে সৈন্য আগমন বন্ধ রাখা হোক। জেনারেল হামিদ সাধারণত ঠাণ্ডা মেজাজের হলেও এবারে আর ধৈর্য রাখতে পারেন নি। তিনি ইয়াকুবকে সুদৃঢ় থাকতে বলেন এবং তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। ঘটনাবলির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সতর্ক ছিলো; এমন কি তারা ৬ দফার ব্যাপারে নমনীয় হতেও রাজি হয়েছিলো। ২৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নর আহসান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন, নতুন তারিখ নির্ধারণ না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হবে না। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পুনরায় হুমকি দিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে তিনি জোরদার আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, তাঁর দলের কোনো সদস্য অধিবেশনে যোগ দিলে তার ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে। ভুট্টো দাবি করলেন যে, 'হয় পরিষদের অধিবেশন বিলম্ব করতে হবে অথবা সংবিধান রচনার জন্য ১২০ দিন যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা তুলে নিতে হবে।'

এটা ছিলো ফাঁকা হুমকি। কেননা আওয়ামীলীগ ছোট দলগুলোর সহায়তায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন নিয়ে যে-কোনো সময় সংবিধান পাশ করতে পারতো। ১ মার্চ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হলো। অজুহাত খাড়া করা হলো পি.পি.পি. সদস্যদের বয়কট ও ভারত কর্তৃক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা।



২২। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর তিন বাহিনীর প্রধানদের সাথে করমর্দন করছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর চাতুর্যের কারণেই অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেলো। ১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে লে. জেনারেল ইয়াকুব অ্যাড্‌মিরাল্ আহসানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। চারদিনের মাথায় তিনি গভর্নর এবং ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। ইয়াকুব বললেন, *'আমি পাকিস্তানি ভাইদের খুন করতে পারবো না।'* বাঙালিরা উৎফুল্ল ও পশ্চিমপকিস্তান হতাশ হয়ে পড়লো। তাঁর সিদ্ধান্তের পরিণাম ছিলো সুদূরপ্রসারী। ইয়াকুব বাঙালিদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও গণহত্যা দেখার পরও নিশ্চুপ ছিলেন। পদত্যাগের পর ইয়াকুব করাচি চলে যান এবং স্টেশন সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হন। ইয়াকুবকে মেজর জেনারেল পদে পদাবনতি করে পেনশন বন্ধ করে দেওয়া হয় (পরবর্তীকালে তিনি বিদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্রমন্ত্রি পর্যন্ত হয়েছিলেন)।

এদিকে সেনাবাহিনীর ওপর চাপ উত্তরোত্তর বাড়ছিলো। আওয়ামীলীগ তার পরিকল্পনামতো এগুতে থাকে। যেমন : ১. সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি সকল বস্তুগত সহায়তা দিতে অস্বীকৃতি ২. সেনাবাহিনীর চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি ৩. সকল সেনানিবাসে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করা ৪. সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তায় নিয়োজিত সকল বেসামরিক কর্মচারীদের কাজ-কর্ম বন্ধ রাখা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, 'পাকিস্তান কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। সমাধানের আর কোনো আশা নেই।' পশ্চিমপাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য করে তিনি

বললেন, 'আমি তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেব এবং নতজানু করিয়ে ছাড়বো।' মুজিব বিকল্প শাসকে পরিণত হলেন এবং তাঁর বাড়ি রাষ্ট্রপতি ভবনে রূপ নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশসমূহ অমান্য করা হয়। ৭ মার্চ ইয়াকুবের স্থলে জেনারেল টিক্কা খান গভর্নর হয়ে এলেও তাঁকে স্বাগত জানানো হয় নি। বরং বিমানবন্দরে জুতার মালা দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তার চেয়েও বড় ঘটনা হলো হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে গভর্নর হিসেবে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকার করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পর টিক্কা খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, যদিও বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্বসূরি ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। টিক্কার আশু কর্তব্য ছিলো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করা, চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির নিরাপত্তা, লালমণিরহাট ও ঈশ্বরদীসহ বিমানঘাঁটিগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং শহরগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়া। এর মধ্যে কয়েকটি সেনানিবাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারেন নি। তাঁর প্রধান দায়িত্ব বাঙালি সেনাসদস্যদের নিরস্ত্রীকরণের কাজটিও বেমালুম ভুলে যান। ফলে কয়েকটি সেনানিবাস ও তার সংলগ্ন শহর ছাড়া গোটা প্রদেশেই আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। টিক্কার আরেকটি ভুল পদক্ষেপ ছিলো পূর্বপাকিস্তান থেকে সকল বিদেশি সাংবাদিকদের জোর করে বের করে দেওয়া। এঁদের মধ্যে কয়েক জনকে শারীরিকভাবে নাজেহাল করা হয়, ব্যাগেজ ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং ক্যামেরা থেকে ফিল্ম তুলে নেওয়া হয়। নিয়াজি বলেন,

'১৪ মার্চ ভুট্টো দু জন প্রধানমন্ত্রি নিযুক্ত করার পরমর্শ দেন। পশ্চিমের জন্য তিনি এবং পূর্বাঞ্চলের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তাঁর 'উধার তোম ইধার হাম' তত্ত্বের অর্থ হলো স্পষ্টত দুই পাকিস্তান। ১৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্বপাকিস্তানে গেলেন। ভুট্টোও সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তিন পক্ষের মধ্যে আলোচনা হলো। এর মাধ্যমে তাঁরা অযথা সময়ক্ষেপণ করলেন। কেননা আওয়ামীলীগ পয়েন্ট অব নো রিটার্নে চলে গিয়েছিলো। ২২ মার্চ মুজিব ইয়াহিয়ার প্রতি ভুট্টোর তত্ত্ব অনুযায়ী দুই অংশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেন।

২৩ মার্চ সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন থাকে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন ও সোভিয়েত কনস্যুলেট অফিসেও বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। মুজিব কর্নেল ওসমানীকে (সাবেক সেনা কর্মকর্তা) সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য কমান্ডার নিযুক্ত করেন। মেজর জেনারেল (অব.) মজিদের তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ভারত থেকে পূর্বপাকিস্তানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো হয়। পূর্বপাকিস্তান পুলিশ ও বিদ্রোহীরা ছিলো পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সমর্থনে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়। ২৫–২৬ মার্চ রাতে জেনারেল টিক্কা খান বাঙালিদের উপর আক্রমণ করলেন। ঘুমন্ত ও শান্তিপূর্ণ রাত আর্তনাদ করে উঠলো ও আগুনের লেলিহান শিখায় রূপ নিলো। নিজের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জনগণের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় সেটি না করে তিনি শত্রুর মতো সর্বাত্মক অভিযানে লিপ্ত হলেন। ফলে তিনি সব কিছুই হারালেন। তাঁর

সামরিক অভিযান ছিলো বুখারা ও বাগদাদে হালাকু খান, চেঙ্গিস খানের এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের অভিযানের চেয়ে নির্মম।
জেনারেল টিক্কার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করা। সেটি না করে তিনি বাঙালি নেতাদের জেলখানায় ঢোকালেন, বেসামরিক লোকদের নির্বিচারে হত্যা করলেন এবং পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করলেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি টিক্কার নির্দেশ ছিলো 'আমি মাটি চাই, মানুষ নয়'। তার এ আদেশ পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি ও ব্রিগেডিয়ার জাহানজেন আরবাব ঢাকায় পালন করেছিলেন। রাও ফরমান আলির ডায়েরিতে লেখা হয়েছিলো, বাঙালির রক্তে দেশ লালে রঞ্জিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর হাউস দখল করে নেওয়ার পর বাঙালিরা এ ডায়েরি উদ্ধার করে। ভুট্টো আমাকে এ ডায়েরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে জানাই ভারতে বন্দি থাকার সময়ে আমিও এ ডায়েরির কথা শুনেছি। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের বেসামরিক ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় ছিলো না। ২৫/২৬ মার্চ রাতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার আগেই ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের আগে তিনি টিক্কা খানকে বলে যান 'ওদের নিশ্চিহ্ন করে দাও।' টিক্কা কী করেছেন তা দেখার জন্য ভুট্টো, ঢাকায়ই থেকে যান। ভুট্টো দেখলেন ঢাকা জ্বলছে, জনগণ আর্তনাদ করছে, জিনিসপত্র পোড়ার শব্দ হচ্ছে, ট্যাঙ্ক চলাচলের আওয়াজ কানে আসছে, উপর্যুপরি বন্দুকের গুলি ও বুলেট ছোঁড়া হচ্ছে। অভিযোগ আছে ভুট্টো সাহেব টিক্কা, রাও ফরমান ও আরবাবকে এ কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'ভবিষ্যৎ নিশ্চিত' বলে তিনি তাদের আশ্বস্তও করেছেন। ভুট্টো তাঁর কথা রেখেছিলেন। টিক্কা খান সেনাবাহিনর প্রধান, ফরমান ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং ব্রিগেডিয়ার আরবাব লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। ২৬ মার্চ করাচি ফিরে ভুট্টো বলেছিলেন, 'আল্লাহ্'র মেহেরবানি, পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।'

জেনারেল ফরমান আলি

জেনারেল ফরমান আলি, একাত্তরে যিনি ঢাকায় বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি অন্যসব পাকিস্তানির ন্যায় নিজের ভূমিকার সাফাই গেয়েছেন, অভিযুক্ত করেছেন অন্য জেনারেল ও রাজনীতিকদের। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভুট্টোর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য হলো :

'এটা খুবই পরিষ্কার হয়েছিলো যে পূর্ব ও পশ্চিমপাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক মত-পার্থক্য দূর করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতাসীন তথা পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের দিক থেকে তেমন কোনো মনোভাব দেখানো হয় নি। অন্যদিকে মত-পার্থক্য বাড়িয়ে দেওয়ার এবং উভয়পক্ষকে মুখোমুখি সংঘাতে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো। আমি জেনারেল ইয়াকুবের কাছে আমাদের আলোচনার ওপর একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করেছিলাম। রিপোর্টটি প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রেসিডেন্টের চারদিকে থাকা পূর্বপাকিস্তান-বিরোধী উপদেষ্টারা তাকে বিদ্যমান সুযোগকে কাজে লাগাতে দেন নি। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের মার্চে বিলম্বিত চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু কতিপয়

কারণে তা নিষ্ফল হয়ে যায়। ... সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ যে সমস্যাটি সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছুদিন পর সেটাই সমাধানের বাইরে চলে যায় এবং ফলে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বিমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরমপন্থিরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানোর সুযোগ পেয়েছিলো। এটা একই সময়ে ভুট্টোর স্বার্থকেও সিদ্ধি করেছিলো। ...

প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা সফর করেন। মুজিব ও তাঁর টিমের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তিনি ৬ দফার একটি একটি করে দফার ব্যাপারে ব্যাখ্যা চান। এতে প্রতিভাত হয়ে যে, মুজিবের টিম-সদস্যদের অনেকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রস্তাবনা থেকে সুসংবদ্ধ ফেডারেল পদ্ধতি পর্যন্ত নানা রকম ব্যাখ্যা রয়েছে। মুজিবের ব্যক্তিগত মনোভাবের কঠোরতায় প্রেসিডেন্ট নিরাশ হয়েছিলেন। অথচ নির্বাচনের আগে মুজিব অনুগত ও খুবই সহযোগিতাপূর্ণ ছিলেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে পূর্বপাকিস্তানের দাবির প্রশ্নে তিনি নমনীয়তা দেখানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই একই মুজিব এবার সর্বজনবিদিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার আড়াল নিয়ে এবং জনগণের দাবির মূল সুরকে ব্যবহার করে আক্রমণাত্মক ও কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া একে বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে মনে করলেন।

প্রেসিডেন্ট করাচি গেলেন এবং সেখান থেকে জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ১৭ জানুয়ারি তিনি সরাসরি লারকানা যান। এটাও পূর্বপাকিস্তানের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় আমন্ত্রণ জানানোর পরও যেখানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনে যেতে রাজি হন নি, সেখানে এবার তিনি মুজিবের শত্রুর বাড়ি লারকানায় গেছেন বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে—এমন ধরনের কথা তখন বলাবলি হচ্ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কঠোরতায় বিরক্ত প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে নিয়েছিলেন এবং ভুট্টোর সৃষ্ট পরিস্থিতির মূল্যায়ন গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদ্দেশ্যকে, এমন কি পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্যকেও তাঁরা সন্দেহ করে বসলেন।'

ইয়াহিয়া-ভুট্টো সমঝোতা সম্পর্কে ফরমানের বক্তব্য হচ্ছে,

'আমি লারকানায় উপস্থিত ছিলাম না। ফলে সেখানে কী ঘটেছিলো আমি জানি না। কিন্তু পরবর্তীকালে জেনারেল ওমর আমাকে বলেছিলেন যে, ভুট্টোর তত্ত্বকেই গ্রহণ করা হয়েছিলো। তার তত্ত্বটি কী ছিলো? জেনারেল ওমরের মতে, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে প্রেসিডেন্ট মুজিবের আনুগত্য পরীক্ষা করলেন। মুলত বিকরণকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যদি মেনে নেন তা হলে তিনি অনুগত পাকিস্তানি হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর যদি মেনে না নেন তা হলে তাঁকে স্পষ্টতই একজন অবাধ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।' ভুট্টোর সমালোচকরা বলেন, এর ঠিক উল্টোটি যদি করা হতো, অর্থাৎ যদি ঘোষিত তারিখ ৩ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো, তা হলে জনাব ভুট্টো নিজে কি প্রমাণিত হতেন—অনুগত না অবাধ্য পাকিস্তানি?

অষ্টম অধ্যায় : পরিশিষ্ট

আওয়ামীলীগের ৬ দফা

১. পাকিস্তান হইবে একটি 'ফেডারেশন' বা 'যুক্তরাষ্ট্র'। এ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা বা অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আলোচনা অবকাশ নেই, ইহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমপাকিস্তান এ উভয় অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিমপাকিস্তানের প্রদেশসমূহকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। সরকার হইবে 'পার্লামেন্টারি' ধরনের, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিন আইনসভা হইবে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

২. যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা দুইটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে— যথা: দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকিবে নিরঙ্কুশ।

৩. সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে।

অথবা,

বিশেষ ব্যবহার শর্তাধীনে মুদ্রা ও অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে। এ ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন "স্টেট ব্যাংকের" পরিচালনার অধীনে দুই অঞ্চলে দুইটি "রিজার্ভ ব্যাংক" থাকিবে। এ আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংকগুলো আঞ্চলিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবে এবং যাহাতে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হতে না পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

৪. শাসনসম্বন্ধীয় কার্যনির্বাহের সুবিধার জন্যে এবং নানা প্রকার জটিলতা এড়াইবার জন্যে কর ও শুল্ক ধার্যের দায়িত্ব অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর উপরই ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে কোনো ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন নাই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অবশ্য প্রাপ্য হইবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্বয়ংক্রিয় নিয়মে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মিটাইবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে

নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বীয় স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দান করিতে হইবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে।

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

[১৯৭১ সালের ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেন যে, একমাত্র ঢাকা ও আশপাশেই সেনাবাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ৩০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২০০ জন আহত হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে ক্রুদ্ধ জনতা পাকিস্তানি পতাকা ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে। ৫ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সেনা কর্তৃপক্ষ বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক শান্তি বজায় রাখার আহ্বানের ফলে পূর্বপাকিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদ ২৫ মার্চ '৭১ তারিখে অধিবেশনে মিলিত হবে। তিনি উক্ত ঘোষণার সঙ্গে আরো বলেন, সশস্ত্রবাহিনী যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবে। জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঘোষণা করেন, তাঁর দল এ অধিবেশনে যোগ দেবে। ঐ দিনই কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।
আওয়ামীলীগ ওয়ার্কিং কমিটি ৬ মার্চ এক বৈঠকে মিলিত হয়। অধিবেশন সারা রাত ধরে চলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। অন্যূন ১০ লাখ মানুষ তাদের নেতার কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণের জন্যে জনসভায় জমায়েত হয়। উপস্থিত জনতার প্রায় সকলেই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাশা করেছিলো। বঙ্গবন্ধু দেরিতে সভাস্থলে পৌঁছেন। তিনি প্রায় ১৮ মিনিট বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাধীনতার পর তাঁর ঐ বক্তৃতার মূল্যায়নে প্রমাণিত হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ হলো ৭ মার্চের ভাষণ। ঢাকা বেতার থেকে তাঁর এ ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার কথা থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত হতে পারে নি। তবে ঢাকা বেতার ভাষণটি সভায় ধারণ করে পরদিন প্রচার করে।]

ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বলবো, আমি বাঙালি,
বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা

[১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ অপরাহ্নে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দর জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায়। বিমানবন্দর থেকে সারা পথ প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্য দিয়ে রেসকোর্স ময়দানের দিকে অগ্রসর হন। জাতির জনক একটি খোলা ট্রাকে অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রে পৌঁছতে

সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। রেসকোর্সে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

'যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।



২৩। জেল থেকে বের হলেই বঙ্গবন্ধু-পত্নী এভাবেই তাঁকে আনন্দে বরণ করে নিতেন।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিলো। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিলো আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মান, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এ রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোলো।' আজ আবার বলছি আপনারা একথা বজায় রাখুন। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এ স্বাধীতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশ রূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।

গত ১০ মাসে সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি—বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালোবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করো নি।' কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি—আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্যে। তোমরা রক্ত দিয়েছো । তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

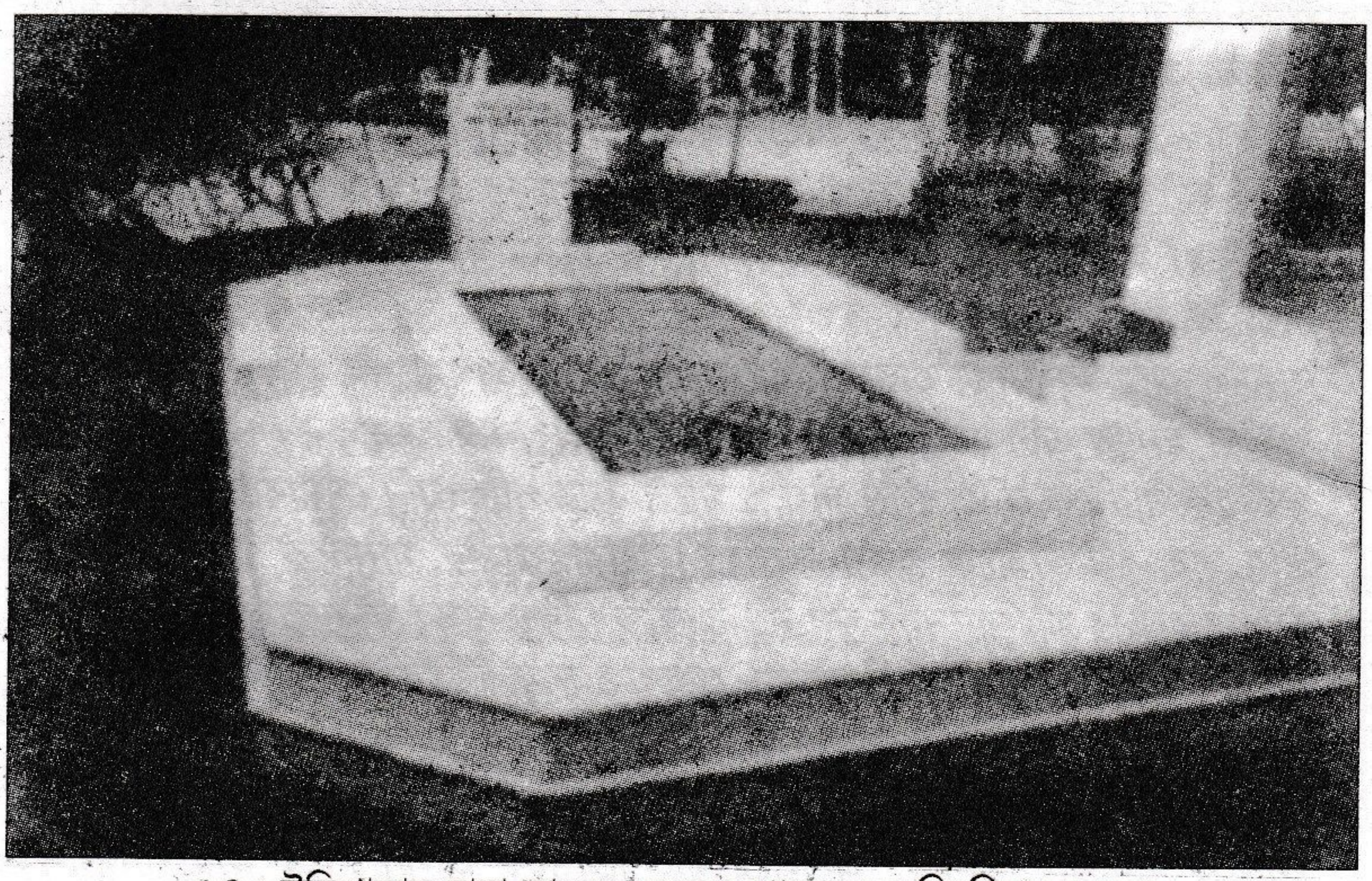
তোমরা বাংলায় যারা কথা বলো না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না; তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই; বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই না, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।

অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারবো না। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশ মতো সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

পশ্চিমপাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন। আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারবো না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এতো বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এতো বেসাময়িক লোক মরে নাই।



২৪। টুঙ্গিপাড়ায় বাবা-মায়ের কবরের পাশে শুয়ে চিরনিদ্রায় বঙ্গবন্ধু।

সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রি ইন্দিরা গান্ধীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি জানাই আমার শ্রদ্ধা। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাতনী। তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে রাজনীতি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমার মুক্তির জন্যে আবেদন করেছেন। আমার সাথে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলবো, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রায় ১ কোটি লোক যাঁরা পাকিস্তান সেনাবহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং বাকি যাঁরা দেশে রয়ে গিয়েছিলো, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণীর জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই মুক্তি বাহিনীকে, গেরিলা বাহিনীকে, কর্মী বাহিনীকে। আমি সালাম জানাই সংগ্রামী শ্রেণীকে, কৃষককুলকে, বৃদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই— ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন এটা মেনে নিন। আপনারাও স্বাধীনভাবে থাকুন।

গত ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ-ভারত ভাই ভাই।'

----- o -----

References

1. *A Tale of Millions—Maj. Rafiqul Islam, Beeruttom, Onanna, Dhaka.*
2. *Armed Quest for Independence—Col. Sawkat Ali (Retd.), Agami Prokasani, Dhaka.*
3. *Bangladesh at War—Maj. Gen. K.M. Safiullah, Agami Prokasani, Dhaka.*
4. *Bangladesh : From Mujib to Ershad : An Interpretive Study—Laurence Gering, USA.*
5. *Freedom Struggle : A Prolouge & An Epilogue—Prof. Panna Kaiser, Agami Prokasani, Dhaka.*
6. *Friends, Not Masters—Field Marshal Ayub Khan, Pakistan (1967)*
7. *From Memory—Feroz Khan Noon, Pakistan.*
8. *Japan and the Emargency of Bangladesh—Dr. Sukumar Biswas, Agami Prokasani, Dhaka.*
9. *Last Days of United Pakistan—G.W. Chowdhury*
10. *Life Under Captivity in Pakistan : 1971—Helen Quader, Agami Prokasani, Dhaka.*
11. *Mujib Nagar Goverment Document 1971— Dr. Sukumar Biswas, Mawla Brothers, Dhaka. Published 2005.*
12. *Song of Blood And Sword—Fatema Bhutto, London (2010)*
13. *Starting With a Clean State—Zulfiqar Ali Bhutto, Pakistan*
14. *The Great Tragedy—Zulfiqar Ali Bhutto, Pakistan*
15. *Unfinished Revolution—Laurence Leafsuj*
16. *Al Ayyam—Khartum, Sudan (1971)*
17. *Associate Franch Press (AFP), 1971*
18. *The Daily Washington Post— Washington, U.S.A. (1971)*
19. *The Daily Observer—London, U.K. (1971)*
20. *The Daily Dawn—Karachi, West Pakistan (1971)*
21. *The Daily News—Karachi, West Pakistan (1971)*
22. *Newsweek—Hongkong (1971)*
23. *La Figaro—Paris, Franch (1971)*
24. *Reuters—London, UK (1971)*
25. *Straight Eco—Penung*
26. *Straight Time—Kualalampur, Malyasia (1971)*
27. *UPI, Islamabad, West Pakistan, 1971*
28. *The Daily Stateman—New Delhi, India (1971)*
29. *The Times of India—New Delhi, India (1971)*
30. *The Daily Indian Express—New Delhi, India (1971)*
31. *The Guardian—London U.K. (1971)*
32. *The Christian Science Monitor—Boston, USA (1971)*
33. *The Hindustan Times—New Delhi, India (1971)*
34. *Tribune the Geneva—Geneva, Swisgerland, (1971)*

35. *La Nasian, Buens Airs, Argentina (1971)*
36. *The Sunday Times, Gambia (1971)*
37. *The London Times—London, U.K. (1971)*
38. *Trinidad Gawnion—Port of Spain (1971)*
39. *Tribune African—South Africa (1971)*
40. *The Canbera Times—Canbera, Australia (1971)*
41. *Samiksha, Nepalee Week, Kathmandu, Nepal (1971)*
42. *The Evening Star—Washinton, USA (1971)*
43. *The New York Time—New York, USA (1971)*
44. *The Rising Nepal—Kathmandu, Nepal (1971)*
45. *New Herald—Kathmandu, Nepal (1971)*
46. *The Advocate Brunei—Tasmania (1971)*
47. *The West Australian—Parth, Australia (1971)*
48. *The Sunday Mail—Kualalampur, Malysia (1971)*
49. *The Gambia Daily Mail—Gambia (1971)*
50. *Daily Telegraph—London, U.K. (1971)*
51. *Letter of Carolean to Zulfi—U.S.A. (October 13, 1951)*
52. *How Dhaka Inside Story—Gabin Young (1971)*
53. *Jack Anderson Papers (1971), U.S.A.*
৫৪. *দৈনিক যুগান্তর—কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (১০৭১)*
৫৫. *সাপ্তাহিক জিন্দেগী—লাহোর, পশ্চিমপাকিস্তান (১৯৭১)*
৫৬. *মাসিক কালি ও কলম—কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ)*
৫৭. *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দশ দিন—মূল : আহমদ সেলিম, সম্পাদনা : আবদুল হাই সিকদার, কাকলী, ঢাকা।*
৫৮. *অন্যরকম বাংলাদেশ—আসাদুজ্জামান আসাদ, কাকলী, ঢাকা।*
৫৯. *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জল বঙ্গবন্ধু তার পরিবার ও আমি—মমিনুল হক খোকা, ঢাকা।*
৬০. *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা—ড. সুকুমার বিশ্বাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।*
৬১. *আমি ও আমার মুক্তিযুদ্ধ—অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।*
৬২. *আমি বিজয় দেখেছি—এম.আর. আখতার মুকুল, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।*
৬৩. *আমি মুজিব বলছি—কৃত্তিবাস ওঝা, অনন্যা, ঢাকা।*
৬৪. *আপন আয়নায় একাত্তর—সফিক উল্লাহ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।*
৬৫. *আমার কিছু কথা—শেখ মুজিবুর রহমান, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।*
৬৬. *আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম—এ.আর. মল্লিক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।*
৬৭. *আমাদের মুক্তিযুদ্ধ—আমীরুল ইসলাম সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা, ।*
৬৮. *আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা (নতুন সংস্করণ)—মোহাম্মদ এমদাদুল হক, সূচীপত্র, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।*
৬৯. *আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ—তাহের উদ্দিন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।*
৭০. *আর এক জীবন—পিএন হাকসার সুপ্রিয়া বারি অনূদিত, ইউপিএল, ঢাকা।*

৭১. ইতিহাস নির্মাতার মৃত্যু—আসাদুজ্জামান আসাদ, কাকলী, ঢাকা।
৭২. ইতিহাস নির্মাণের ধারা—বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ইউপিএল, ঢাকা।
৭৩. একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক—মে.জে. মঈনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম (অব.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।
৭৪. একজন বঙ্গবন্ধুর গল্প—আবু হানিফ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা।
৭৫. একাত্তর—শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৭৬. একাত্তর : নির্যাতনের কড়চা—আতোয়ার রহমান, ইউপিএল, ঢাকা।
৭৭. একাত্তর স্মরণে—ডা. বেলায়েত হোসেন, অনন্যা পরিবেশনা।
৭৮. একাত্তরের স্মৃতি—বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউপিএল, ঢাকা।
৭৯. একাত্তরের একাত্তর—অজয় দাশ গুপ্ত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৮০. একাত্তরের দশ মাস—রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কাকলী, ঢাকা।
৮১. একাত্তরে মুজিবনগর—বিবি বিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৮২. একাত্তরের বিজয়—শামসুল আলম সাইদ, কাকলী, ঢাকা।
৮৩. একাত্তরের যুদ্ধে জয় পরাজয়—কর্নেল (অব.) এম.এ. হামিদ পিএসসি, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
৮৪. একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে—বদরুদ্দীন উমর, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
৮৫. একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা—বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা।
৮৬. একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সিআইএ—মাসুদুল হক, মীরা প্রকাশন। প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
৮৭. একাত্তরের কাহিনী—হেলেনা খান, মীরা প্রকাশন। প্রকাশকাল ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।
৮৮. একাত্তরের বিজয় গাথা—মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৮৯. একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম—বেদুঈন সামাদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
৯০. একাত্তরের সন্ধানে—আসাদুজ্জামান আসাদ, কাকলী, ঢাকা।
৯১. একাত্তরের ডায়েরি—মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯২. একাত্তরের নয় মাস— রাবেয়া খাতুন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৩. এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—সিকদার আবুল বাশার, কাকলী, ঢাকা।
৯৪. ওঙ্কার—আহমদ ছফা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
৯৫. উত্তাল মার্চ ১৯৭১—আহমেদ ফারুক হাসান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৬. ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলি—নিগার চৌধুরী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৭. কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—অমর সাহা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৯৮. কালের ভেলায়—বাসন্তী গুহঠাকুরতা, ইউপিএল, ঢাকা।
৯৯. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ১ম খণ্ড—রিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।
১০০. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ৩য় খণ্ড—হাসিনা আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা।
১০১. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৪র্থ খণ্ড—হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

১০২. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৬ষ্ঠ খণ্ড—আহমেদ মাহফুজুল হক সম্পাদিত। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
১০৩. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৭ম খণ্ড—মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০৪. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৮ম খণ্ড—মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০৫. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ৯ম খণ্ড—হাসিনা আহমেদ সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০৬. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ১০ম খণ্ড—মাহবুবুর রহমান সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০৭. চরমপত্র—এম.আর. আখতার মুকুল, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
১০৮. ছহি মুক্তিযুদ্ধপনা—বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।
১০৯. ছোটদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—লুৎফর রহমান, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা।
১১০. জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা—মেজর কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া সম্পাদিত, অনন্যা পরিবেশনা।
১১১. জাগ্রত বাংলাদেশ—আহমদ ছফা, মুক্তধারা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৮।
১১২. জাতির পিতা ও পতাকা কাহিনী—আতিকুর রহমান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১১৩. ঢাকা অ্যালবাম ১৯৪৮-১৯৭১—ড. মুনতাসীর মামুন ও হাশেম খান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০।
১১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য : ১৯৭১ (জগন্নাথ হল)—রতন লাল চক্রবর্তী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১১৫. দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গন ১৯৭১—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।
১১৬. দিনলিপি একাত্তর—কাজী ফজলুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
১১৭. নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল— অনুবাদ : সিদ্দিক মালিক ও মাসুদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।
১১৮. নেকড়ে অরণ্য—শওকত ওসমান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১১৯. পাকিস্তান থেকে পলায়ন—লে.ক. এম.এ. হামিদ, পি.এস.সি, অনন্যা, ঢাকা।
১২০. পাকিস্তান যখন ভাঙলো—এটিএম শামসুদ্দীন অনূদিত, ইউপিএল, ঢাকা।
১২১. পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর—মহিউদ্দিন আহমেদ ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, ইউপিএল, ঢাকা।
১২২. পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি—মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১২৩. পেছন ফিরে দেখা—শাহ এএমএস কিবরিয়া, ঢাকা।
১২৪. প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ বাংলাদেশ—মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা।
১২৫. ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস—অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
১২৬. বঙ্গবন্ধু—এম.আর. আখতার মুকুল, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
১২৭. বঙ্গবন্ধু, বাঙালী ও বাংলাদেশ—আনু মাহমুদ, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

১২৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাঙালী—কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউপিএল, ঢাকা।
১২৯. বঙ্গবন্ধু ও তার আমল– আবদুল মতিন, ঢাকা।
১৩০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ—এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, ইউপিএল, ঢাকা।
১৩১. বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ—সিকদার আবুল বাশার, কাকলী, ঢাকা।
১৩২. বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ—সিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত, কাকলী, ঢাকা।
১৩৩. বাংলার স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু—মিঞা লুৎফর রহমান, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা।
১৩৪. বাংলাদেশ গড়লো যাঁরা—সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, কাকলী, ঢাকা।
১৩৫. বাংলাদেশ ১৯৭১ (১ম-৪র্থ খণ্ড)—আফসান চৌধুরী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
১৩৬. বাংলাদেশ : থ্রেট অব ওয়ার—অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩৭. বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব– আবুল মাল আবদুল মুহিত, ঢাকা।
১৩৮. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১—এইচ.টি. ইমাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৩৯. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস—ড. সুকুমার বিশ্বাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৪০. বাংলাদেশের অভ্যুদয় : রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট—আমিনুর রহমান সুলতান, কাকলী, ঢাকা।
১৪১. বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য—রেহমান সোবহান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
১৪২. বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলি, ঢাকা।
১৪৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল—মোহাম্মদ সেলিম, ইউপিএল, ঢাকা।
১৪৪. বাংলাদেশের জন্ম—রাও ফরমান আলী খান, অনুবাদ : শাহ আহমদ রেজা, ইউপিএল, ঢাকা।
১৪৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার ইতিহাস—ড. মোহাম্মদ হান্নান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১৪৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস—ড. মোহাম্মদ হান্নান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১৪৭. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস—সালাউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।
১৪৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ইতিহাস চর্চার গতিধারা—কাজী জাহেদ ইকবাল, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১৪৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা—সোহরাব হাসান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
১৫০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা—তপন কুমার দে, কাকলী, ঢাকা।
১৫১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সি.পি.আই.এম ও গণশক্তি—ড. সুকুমার বিশ্বাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
১৫২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস—মাহমুদ ইকবাল, সূচীপত্র, ঢাকা।
১৫৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির—আসাদুজ্জামান আসাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১৫৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান—বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৫৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা—সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।
১৫৬. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিল—রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সম্পাদিত, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১৫৭. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামীলীগ : প্রাসঙ্গিক দলিল—ড. আবুল কাশেম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১৫৮. বাঙালি হত্যা ও পাকিস্তানের ভাঙন—মাসুদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।
১৫৯. বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম—আহমদ ফজলুর রহমান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৬০. বিজয়ের স্বপ্ন সোপান—অজয় দাশ গুপ্ত সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৬১. বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—মেজর কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া, অনন্যা, ঢাকা।
১৬২. বিদ্রোহী মার্চ—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, অনন্যা, ঢাকা।
১৬৩. ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ—আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১৬৪. ভুলে যাওয়া রাজনৈতিক মঞ্চের আত্মকথন—জায়নাব আখতার ও নিলুফার সুলতানা সম্পাদিত, ইউপিএল, ঢাকা।
১৬৫. মাইনর টাইগার্স ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—লে.ক. তৌফিক-ই-এলাহী, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।
১৬৬. মজিবুরের বাড়ি—মুনতাসীর মামুন, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
১৬৭. মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দি ইতিহাস—শাহরিয়ার কবির, অনন্যা, ঢাকা।
১৬৮. মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি—আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, অনন্যা, ঢাকা।
১৬৯. মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, অনন্যা, ঢাকা।
১৭০. মুক্তির জন্য যুদ্ধ—মুনশী ইব্রাহীম, অনন্যা, ঢাকা।
১৭১. মুক্তি সংগ্রাম—আবুল কাশেম ফজলুল হক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।
১৭২. মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত কথা—আতিকুর রহমান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৩. মুক্তি সংগ্রাম এবং আমরা—আবু জাফর কান, ঢাকা।
১৭৪. মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা—আবুল হাসানাত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৫. মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে—অধ্যাপিকা পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৬. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ— মে.জে. কে.এম. শফিউল্লাহ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৭. মুক্তির সোপান তলে—রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৮. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর—রাজিব আহমেদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৭৯. মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল—ড. কামাল হোসেন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।
১৮০. মুজিব-ভুট্টো-মুক্তিযুদ্ধ—সোহরাব হাসান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

১৮১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি—ফরিদ কবির সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রকাশকাল ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
১৮২. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের জয় পরাজয়—বদরুদ্দীন ওমর, একুশে বাংলা প্রকাশন। প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।
১৮৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিরোধী শক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী, ঢাকা।
১৮৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী, ঢাকা।
১৮৫. যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস—আবুল হাসেম চৌধুরী, কাকলী, ঢাকা।
১৮৬. মুক্তির সংগ্রামে বাংলা—আসাদুজ্জামান আসাদ, কাকলী, ঢাকা।
১৮৭. মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনী—আসাদুজ্জামান আসাদ, কাকলী, ঢাকা।
১৮৮. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ—মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
১৮৯. মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি ১—মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা।
১৯০. মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি ২—মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা।
১৯১. মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি ৩—মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা।
১৯২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১৯৩. মৃত্যুদূত : এক দুর্ধর্ষ ঠগের আত্মকাহিনী—নাজিমুদ্দিন আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা।
১৯৪. ম্যাসাগার- এন্থনি মারকারেনহাস, যুক্তরাষ্ট্র।
১৯৫. রক্তঝরা একাত্তর—আবু কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১৯৬. রাইফেল রোটি আওরাত—আনোয়ার পাশা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
১৯৭. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে—রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম, অনন্যা, ঢাকা।
১৯৮. সেই সব পাকিস্তানী—মুনতাসীর মামুন, ইউপিএল, ঢাকা।
১৯৯. সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : বার্থ অব এ ন্যাশন্—লে. জেনারেল জেএফআর জেকব, ইউপিএল, ঢাকা।
২০০. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়—মে.জে. সুখওয়ান্ত সিংহ অনুবাদ : মাসুদুল হক, মীরা প্রকাশন। প্রকাশকাল ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
২০১. স্বাধীনতা '৭১—কাদের সিদ্দিকী, বীরোত্তম, অনন্যা, ঢাকা।
২০২. স্বাধীনতা (১ম খণ্ড)—মেজর কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া সম্পাদিত, অনন্যা পরিবেশনা।
২০৩. স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি—আসাদুজ্জামান আসাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২০৪. স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু—এম. আনিসুজ্জামান, কাকলী, ঢাকা।
২০৫. স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতি—এম. আনিসুজ্জামান, কাকলী, ঢাকা।
২০৬. শতাব্দীর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অজানা অধ্যায়—শহীদুল ইসলাম মিন্টু সম্পাদিত, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
২০৭. শিল্প সাহিত্যে শেখ মুজিব—সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, নিউ শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।
২০৮. শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম—মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, কাকলী, ঢাকা।
২০৯. ১৯৭১ প্রসঙ্গ : মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—ডা. এম.এ. হাসান, অনন্যা, ঢাকা। প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

নির্ঘণ্ট

অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম ১৯৫
অপারেশন সার্চ লাইট ২১৬
আই আই চুন্দ্রীগড় ১৭৪
আওয়ামী মুসলিমলীগ ২১
আখতার সোলায়মান ১৪০
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ২৫, ৫৩, ১২২, ১৩৩, ১৩৫, ১৫০
আজিজ আহমদ ১৪২,১৮৯
আতাউর রহমান ২৩৫
আতাউর রহমান খান ২১
আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল ২৮৮
আন্দ্রে গ্রোমিকো ১৯৪
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ১১৪
আবদুল মালেক ১৪১
আবদুস সামাদ আজাদ ৮৮
আবদুস সালাম খান ২১
আবু সাঈদ চৌধুরী ৪৫
আবু হোসেন সরকার ২৩
আবুল মাল আবদুল মুহিত ১১৬
আমির বেগম ১৬৫
আর এন চোং ১৯৪
আর্থার কে ব্লাড ২৫৯
আর্থার বোটমলি ৬৮
আলতাফ গওহর ১৯৩
আলজেরিয়া ১২৬
আল মর্তুজা ১৫৫
আসগর খান ১৫৭
আসাদ ৩৫
ইউসুফ আলী ৪৪
ইন্দোনেশিয়া ২৩৯, ২৮৭
ইভেত্তি রজা ২৭৫
ইলা মিত্র ১২০

ইসকান্দার মির্জা ২৩
ইসলামাবাদ ৬২,৭৩
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৮১
ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট ৪২, ২৮১
উ থান্ট ৬০, ২৬২
এ এ খান নিয়াজি ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৭৮
এন্থনি মাসকারেনহাস ১৩৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১
এনায়েতুল্লাহ খান ১৩৭
এ কে ব্রোহী ৬৭, ৭১
এডওয়ার্ড হিথ ৮০, ৮৪, ৮৭, ১৪৭
এসেম্বলি ৩৯
ওয়ান ইউনিট প্রথা ২৫৬
ওয়ারেন হেস্টিংস ৭১
ওয়ালি খান ২৫২
ওয়াহিদুজ্জামান ২২
কংগ্রেস ১৫
কামাল আতাতুর্ক ১০৯
কামাল হোসেন ৩৭
কায়েদে আওয়াম ১৫৬
কেশর সিং রামজি ৬৮
কোলকাতা ১৪
ক্যাইথ ইলইয়ক ২৬০
ক্যাপটেন মনসুর আলী ২৯
ক্লোভিস মাকসুদ ৬৯
খন্দকার মুশতাক আহমদ ২৮
খাজা নাজিম উদ্দিন ১৬
খোকা ভাই ১৫
গান্ধী ১৩২
গিরিশচন্দ্র ১৩
গুলজারি লাল নন্দ ১৮৭
গুল হাসানা ২৫০
গোপালগঞ্জ ১৩, ১৫, ২০, ২২, ৫১, ২৭৩
গোয়ালন্দ ১২
চার্লস এইচ পার্সি ৬৮
চেনওয়াই ১৯১

ছয় দফা ২৪, ২৪৫
জন এফ কেনেডি ১৮৫
জন কেনেথ গলব্রেথ ২৬১
জহুর আহমদ চৌধুরী ২৮
জয় পাকিস্তান ১৩০
জয়বাংলা ২১৫
জাকার্তা ১৮৯
জামাতে ইসলাম ১১৮
জি এম সৈয়দ ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬
জি ডব্লিউ চৌধুরী ২১৯
জিয়াউর রহমান ১৭৭
জেনারেল মুসা ১৯১
জোহা ৩৫
জ্যাক এন্ডারসন ফারল্যান্ড ২৫৯
টাঙ্গাইল ১৮
টিক্কা খান ৪১
টুঙ্গিপাড়া ১১, ৪৬, ২৭৩
ডেভিড ফ্রস্ট ৯৭-১১১
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ২৯
তাজউদ্দীন আহমদ ২৫, ৮৩, ১১৫
তাসখন্দ চুক্তি ১৯৬
তেকড়ি শেখ ১২
দুর্ভিক্ষ ২১
দৈনিক ইত্তেফাক ২৯
দ্রিগ লেক ২৪৪
নবাবজাদা লতিফুর রহমান ১৭
নিউ ইয়র্ক ১৯৩, ২৩০, ২৩২
নিক্সন ২৩১,২৫৯
নিখিল ভারত মুসলিমলীগ ১৫
নৌকা ৩৪, ৩৫
পনেরো আগস্ট ১২৭
পাক ভারত যুদ্ধ ১১২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ ১৯
পি.আই.ডি.সি. ২৪২
পিটার হ্যাজেল্ হস্টি ২৬৫

পূর্বপাকিস্তান ১৮
পূর্ববাংলা ১৮
ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৭
ফজলে আহমেদ কবির ২৪৯
ফজলুল হক ১৪,১১৭
ফজিলতুন্নেসা ১৫
ফরিদপুর ১১
বাংলা একাডেমী ১৯
বাংলাদেশ ৪৯
বাকশাল ৪৫, ১৩৬
বার্মা (মায়ানমার) ২৬১
বায়েজিদ বোস্তামি ১২
বেকার হোস্টেল ১৫
বেগম নাহিদ ১৭৮
বেবী সেরনিয়াবাত ৪৬
বেনজির ভুট্টো ২৩৩
ভারত সরকার ২৮৬
ভেটো ১৮৬
মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ১১৮
মওলানা ভাসানী ২১,১১৮
মমতাজ ভুট্টো ১৯৫
মহিম বাবু ২০
মাদারিপুর ১১, ১৩
মিশন হাই স্কুল ২০
মিসর ১২৬
মীর মর্তুজা ১৭৬
মুজিবনগর সরকার ৪২
মোস্তফা খান ২১৬, ২২০
মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী ১২২
মোহাম্মদ আলী ১৭
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৫, ১৮, ১৯, ২৩৫
ম্যাল্‌কম এম্‌ব্রাউন্‌ ২৬৪
যুক্তফ্রন্ট ২২
রাওয়ালপিণ্ডি ১৯৫
রাজা বীরেন্দ্র ২৬১

রাহাত সাঈদ ২৭৫
রিজার্ভ ব্যাংক ২৮৪
রেজাউর করিম খান ৫৮
রেডিও পাকিস্তান ৫০
রেসকোর্স ময়দান ৩৮, ৪৪
রোজী কামাল ৪৬
লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ২০৮
লাখাদ ১৮২
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৮৫
লাহোর ৩২
লিয়াকত আলী খান ২২
লোকসভা ২৫৭
শামসুল হক ১৮
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ২৯
শ্রীকৃষ্ণ মেনন ৫০
শেখ আউয়াল ১২
শেখ আবদুল হামিদ ১২
শেখ আবু নাসের ৪৬
শেখ আয়াজ ২৪৬
শেখ কামাল ৪৬
শেখ কায়সার রশিদ ২১৯
শেখ জহির উদ্দিন ১২
শেখ জামাল ৪৬
শেখ জান মাহমুদ ১২
শেখ ফজলুল হক মনি ৪৬
শেখ বোরহান উদ্দিন ১২
শেখ লুৎফর রহমান ১২
শেখ শহীদুল ইসলাম ২৯
শেখ রাসেল ৪৬
শেখ রেহানা ৪৬
শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ৪৬
সপ্তম নৌবহর ৯৩,২৩১
সর্দার শরণ সিং ৫০, ২৩০
সার্জেন্ট জহুরুল হক ২৪৭
সাহেরা খাতুন ১১

সিডনি শনবার্গ ২৬৬
সিন্ধু ২৪৯, ২৫০
সিরিলডন ২৬৪
সুলতানা কামাল ৪৬
সূর্য বাহাদুর থাপা ৬৮
স্টেট ব্যাংক ২৮৪
হুমায়ুন মীর্জা ১৭৯
হুসনা শেখ ১৬০
হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৭৭
হেন্‌রি কিসিঞ্জার ২২৯
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ১৪, ১৫, ২৬
হার্বাল্‌ ডি স্পিভ্যক্‌ ৯৫
হ্যারল্ড উইল্‌সন্‌ ১৯০